রচনাবলী
খণ্ড – ৪

চতুর্থ খণ্ড

অনুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ অদ্রীশ বর্ধন

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-১২

□ □ □ □

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা ১২

মুদ্রক :

অজিত কুমার সামই

ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা ৬

দাম ষোল টাকা

॥ জুল ভের্ণ ॥

জন্ম নানতেস-য়ে; ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৮। পড়লেন আইন, হলেন সাহিত্যিক। আমেরিকা গেলেন ১৮৬৭ সালে। মারা গেলেন অ্যামিয়েন্সয়ে; ২৪শে মার্চ, ১৯০৫।

আধুনিক সায়ান্স-ফিকশনের জনক বিশ্ববিখ্যাত কাহিনীকারের সবচাইতে চাঞ্চল্যকর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ··· বিজ্ঞান-সুবাসিত রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনী··ফ্যানটাসটিক অ্যাডভেঞ্চার,···কল্পনারঙীন ভবিষ্যদর্শন··প্রতিটি উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় বহুলক্ষ কপি বিক্রীত। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে, এমন কি পৃথিবীর বাইরেও দুঃসাহসিক অভিযানের বিস্ময়কর শ্বাসরোধী কাহিনী। পরিবারের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়ার মত, বারবার পড়ার মত অনুপম রচনা সংগ্রহ।

বিষয় সূচী

১ ॥ চারজন বাজনদার

সবে রাত শুরু হয়েছে। প্রথম প্রহর বললেই চলে। পাহাড়ের পাকদণ্ডীতে গড়িয়ে পড়ল চার বাজনদারের ঘোড়ার গাড়ী।

কপাল ভাল, তাই কয়েক সেকেণ্ড আগে গড়ায় নি। তাহলে আর দেখতে হত না। খাদের তলায় ঘোড়া আর মানুষের মাংস পিণ্ডগুলোই কেবল পাওয়া যেত।

কিন্তু অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেল সবাই। একটা ঘোড়া অবশ্য খাবি খাচ্ছে। অপরটা দাঁড়াতেও পারছে না। গাড়োয়ান বেচারীও চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে। বসতেও পারছে না। গাড়ীখানা একদম গুঁড়িয়ে গেছে।

চার বাজনদার একটু আধটু আঁচড় খেয়ে আশ্চর্যভাবে বেচে গেছে। এমন কি ওদের প্রাণের চাইতেও দামী বাজনাগুলোও অটুট রয়েছে।

কিন্তু কাল বাদ পরশু ওদের ফাংশন। এখান থেকে বিশ মাইল দূরে সান ডিয়েগোর লোকেরা উন্মুখ হয়ে বসে আছে ওদের প্রতীক্ষায়। প্যারিস থেকে বাজনদাররা বাজন শুনিয়ে যাবে ক্যালিফোর্ণিয়ার শহরে। একী কম কথা? এতদিন আমেরিকার লোকদের সবাই মোটা রুচির মানুষ বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। তাই তো তারা উঠে পড়ে লেগেছে জাতে ওঠবার জন্যে। খোলামকুচির মত ডলার ছড়াচ্ছে। তাল তাল সোনা দিয়ে দামী দামী ছবি কিনে আনছে। বিশ্ববিখ্যাত বাজনদারদের বায়না দিচ্ছে সূক্ষ্মরুচির প্রমাণ দিতে।

মওকা বুঝে চার বাজনদার তাই সুদূর প্যারিস থেকে ছুটে এসেছে ক্যালিফোর্ণিয়ায়। চারজনই চেম্বার মিউজিকে নাম কিনেছে। অথচ এ ধরনের বাজনা কি জিনিস, নর্থ আমেরিকার মানুষ এখনো জানে নি। বাজনা মানে কতকগুলো শব্দের সমন্বয় ঠিকই, কিন্তু তার মানে শব্দের ঝড় নয়। চার বাজনদার সেই তত্ত্বই প্রমাণ করতে এসেছে আমেরিকায়। মোজার্ট, বিঠোফেন-কে গুলে খেয়েছে এরা। কানের পর্দা ফাটানো অর্কেস্ট্রা শুনে মানুষ যখন পাগল হতে বসেছে, এদের অভ্যুদয় ঘটেছে ঠিক তখনি।

চারজনের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়স হল পিঞ্চিনাট-য়ের। মাত্র সাতাশ বছর বয়স। ভায়োলা বাজায়। দুই চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, লাল-লাল চুল, ছুঁচোলো গোঁফ, ধারালো সাদা দাঁত। অতিশয় বাচাল। জিভকে জিরেন দিতে শেখে নি। ফলে যখন তখন দাবড়ানি খেতে হয় দলপতির কাছে।

দলপতির বয়স পঞ্চাশ। নাম, সিবাসটিয়ান জর্ন। ভায়োলোনসেলো

বাজায়। খর্বকায়। গোলাকার। এক মাথা কোঁকড়া চুল। ঝাঁটার মত গোঁফ আর ইয়া মোটা জুলপী। গায়ের রঙ ঠিক ইঁটের মত। চোখে চশমা। স্বরলিপি পড়বার সময়ে চশমাতেও কুলোয় না—আতস কাঁচ লাগে। মোটা মোটা আঙ্গুলে সারি সারি আংটি।

বাকী দুজনেরও বয়স কম। ইভারনেস ফার্স্ট ভায়োলিন বাজায়। বয়স বত্রিশ। মাঝামাঝি উচ্চতা। না মোটা, না রোগা। পরিষ্কার মুখ। বড় বড় কালো চোখ।

ফ্রাসকোলিন বাজায় সেকেণ্ড ভায়োলিন। বয়স তিরিশ। সামান্য মোটকা। চুল আর দাড়ি বাদামী রঙের। কুচকুচে কালো চোখ, লম্বাটে নাক। চোখে সোনার প্যাসনে চশমা। হাসি খুশী স্বভাব। অত্যন্ত মিতব্যয়ী। তাই এ-দলের সে কোষাধ্যক্ষ।

গাড়ী ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারজনেই ছিটকে পড়েছিল চারদিকে। এখন ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে আগে দেখে নিলে বাজনাগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা।

তারপর ফ্রাসকোলিন গাড়োয়ানকে বললে—"কিহে, এখন কি করা উচিত?"

"গাড়ী ভেঙে গেলে সবাই যা করে। বসে থাকুন।"

"এটা কি একটা জবাব হল?" সিবাসটিয়ান খেপে গিয়ে বললে। "গাড়ী শুদ্ধ মাঝরাস্তায় ফেলে দিয়ে বলে কিনা রাস্তায় বসে থাকুন।"

ফ্রাসকোলিন বললে—"আমরা এখন কোথায়?"

"ফ্রেসচেল থেকে পাঁচ মাইল দূরে।"

"রেলস্টেশন?"

"না। গ্রাম। সমুদ্রের তীরে। ধারে কাছে কোনো শহর নেই।"

"হোটেল আছে সেখানে?"

"আছে। সেখানেই ঘোড়া পালটাব ঠিক করেছিলাম।"

"গাড়ী পাবো তো?"

"দু'চাকার মালবইবার গাড়ী পাবেন—চারচাকার যাত্রী গাড়ী পাবেন না।"

"সোজা গেলেই গ্রামে পৌঁছোনো যাবে?"

"হ্যাঁ। নাকের সোজা যাবেন।"

"তুমি?"

"এখানেই রেখে যাবেন। গাঁয়ে পৌঁছে খবর দিলেই আমায় তুলে নিয়ে যাবে। সঙ্গে যদি মদ থাকে, গলায় ঢেলে দিয়ে যান।"

"এই নাও," ফ্লাস্ক থেকে বেশ খানিকটা তরল আগুন জংম গাড়োয়ানের গলায় ঢেলে দিল ফ্রাসকোলিন। "যত ঠাণ্ডাই লাগুক না কেন, বুকে সর্দি বসবে না।"

২ ॥ বেতাল ছন্দ

ক্যালিফোর্নিয়ার জঙ্গলে নিরস্ত্র হাঁটা নিরাপদ নয়। নিদেন পক্ষে একটা ছ'ঘরা রিভলবারও সঙ্গে রাখা উচিত।

কিন্তু চার বাজনদারের কাছে বাজনা ছাড়া আর কিছুই নেই। কিছুদূর যেতে না যেতেই গা ছমছম করে উঠল চারজনের একটা চলন্ত কালো ছায়া দেখে। ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে ছায়াটা হেলেদুলে পিছু নিল ওদের।

ভয়ের চোটে প্রাণ উড়ে গেল চারজনেরই। দেখতে দেখতে ছায়াটা দশ বারো গজ পেছনে এসে গেছে। উদ্দেশ্য মোটেই মহৎ বলে মনে হচ্ছে না।

এবার দেখা গেল দুলন্ত চলন্ত কালান্তক ছায়ার স্বরূপ। একটা ভালুক। প্রকাণ্ড চেহারা। নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে বাজনদারদের লক্ষ্য করে।

এখন উপায়? ছুটে পার পাওয়া যাবে না। গাছে উঠেও নিস্তার নেই। ভালুক সেখানেও হানা দেবে।

সংকট মুহূর্তে সহসা বন মুখরিত হল বেহালার বাজনায়। ইভাবনেস মাথা খাটিয়ে কেস থেকে কোন ফাঁকে বেহালাটা বার করে ফেলেছিল। এখন পাগলের মত দড়ি টেনে চলেছে তারের ওপর দিয়ে।

আহা! সে কী বাজনা! পাকা বাজনদারের হাতে পড়ায় সুরের সাতটা স্বর্গ যেন একই সঙ্গে অমৃত বর্ষণ করল ভালুকের কানেও। নিমেষ মধ্যে চালচলন পালটে গেল তার। আগে আসছিল থাবার জোর পরখ করতে। এখন আসতে লাগল গান শোনার টানে।

ওরা এগিয়ে চলল দ্রুত পদক্ষেপে। ইভাবনেসের দেখাদেখি বাকী তিনজনেও বাজনা বার করে ফেলেছে কেস থেকে। অরণ্য মুখরিত হয়ে উঠল প্রাণ জুড়োনো সুরের মায়ায়।

মাঝে মাঝে ঘোঁৎকার ছাড়ছে ভালুকটা। যেন বলতে চাইছে—"আহা! আহা! বেড়ে বাজাচ্ছো তো!"

বনের শেষ পর্যন্ত চলল এই বাজনা। প্রাণের ভয়ে এ-ভাবে কখনো ছড়ি টানতে হয়নি বাজনদারদের। বনের কিনারায় পৌঁছেই কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল

ভালুক মহোদয়। আর এগোনোর সদিচ্ছা নেই যেন। সামনের দুই থাবা বাজিয়ে হাততালি দিয়ে শুধু অভিনন্দন জানালে বাজনদারদের।

ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসে অনেকটা সাহস ফিরে এসেছিল ওদের। তাই পিঙ্কিনাটের মাথায় আর একটা কুচুটে মতলব খেলে গেল।

বললে--"বাজাও 'নাচিয়ে ভালুক'য়ের সুর। জোরসে!"

বলতে না বলতেই শুরু হয়ে গেল 'নাচিয়ে ভালুক'যের মাতাল করা সুর। অনেকদিনের রেওয়াজ করা সুর। ভালুক মহাশয়কে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বে নেচে উঠতে হল বাজনার তালে তালে।

সে কী নাচ! সেই ফাঁকে ঝটপট পা চালিয়ে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল চার বাজনদার।

রাত নটার সময়ে এসে গেল ফ্রেসচেল গ্রাম। কিন্তু এ কিরকম গ্রাম? রাত নটার মধ্যেই নিঝুম নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার।

দরজায় দরজায় অনেক ধাক্কা মারল চারজনে। অনেক হাঁক-ডাক করল গলা ফাটিয়ে। কিন্তু কোনো জানলা ফাঁক হল না। কোনো দরজাও খুলল না।

ইভারনেস চটে গিয়ে বলল—"গাড়োয়ান বেটা গাড়োয়ানি ইয়ার্কি করেছে। এটা কবরখানা—গ্রাম নয়।"

পিঙ্কিনাটের উর্বর মাথায় এল আরেকটা উদ্ভট বুদ্ধি। বললে—"কবর খানার ভূতকেও জাগিয়ে তোলা যায় বাজনা শুনিয়ে। সুতরাং লাগাও বাজনা!"

তৎক্ষণাৎ যে-যার বাজনা তুলে নিয়ে শুরু করল নতুন সুরের ঐকতান। বড় মিষ্টি, বড় প্রাণ মাতানো। সেই সুর শুনলে কবরের ভূতও চঞ্চল হত - কংকালও হাততালি দিত, মড়ার মুখেও হাসি ফুটত।

কিন্তু ফ্রেসচেল গ্রামের একটা ঘরেরও দরজা খুলল না। কোথাও আলো জ্বলল না। কেউ গলা খাঁকারিও দিল না।

"তবে রে!" রেগে গেল বগচটা জর্না। "সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি। ইভারনেস, তুমি D বাজাবে। ফ্রান্সকোলিন, তোমার স্কেল E। পিঙ্কিনাট, G ছেড়ে একদম নড়বে না। আমি B ফ্ল্যাট বাজিয়ে ফ্ল্যাট করব ফ্রেসচেলকে। রেডি? ওয়ান, টু, থ্রী।"

সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল জগঝম্প! সে কী বাজনা! কানের ওপর সে কী অত্যাচার! বেতালা বেসুরো বিকট অনৈকতানের ভয়ংকর অর্কেস্ট্রা!

কাঁহাতক এ অত্যাচার সহ্য করা যায়? পটাপট আলো জ্বলে উঠল ঘরে ঘরে, দমাদম খুলে গেল দরজা আর জানলা।

অমনি সুর পাল্টে গেল বাজনার। আবার সেই ভুবন ভোলানো মিঠে সুর। দরজায় দরজায় ধ্বনি উঠল—"সাবাস। সাবাস।"

ঠিক এই সময়ে একজন শ্রোতা এগিয়ে এল চার বাজনদারের সামনে। বললে অমায়িক কণ্ঠে—"আমি গানবাজনা ভালবাসি। আপনাদের বাজনায় তাই মুগ্ধ না হয়ে পারছি না।"

"মাঝের বাজনাটা শুনেছেন তো?" বেকাসুরে বললে পিঙ্কিনাট।

"আজ্ঞে না। প্রথমটা শুনে।"

"ধন্যবাদ" এবার মুখ খুলল ডন। 'মাঝের বাজনাটা শুনিয়ে আপনাদের ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত।'

আগন্তুক বললে—'দেখুন মশায়, আমি ঢের ঢের বেতালা বাজনা শুনেছি। কিন্তু এমন নিপুণভাবে বেতালা ছন্দে কাউকে বাজাতে শুনি নি। আপনারা যা চেয়েছিলেন, তা সফল হয়েছে। ফ্রেমচেনের ঘুম ভেঙেছে। যে উদ্দেশ্যে ঘুম ভাঙিয়েছেন [illegible] আমি এসেছি।'

[illegible] ব্যবস্থা [illegible]? [illegible] বললে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা [illegible] আমেরিকা [illegible]?

"প্রশংসা শুনে কিন্তু [illegible] বেড়ে [illegible] বলো [illegible] বলুন বাড়িটা কোথায়?

'এখান থেকে ৫ মাইল দূরে।'

"৫ মাইল দূরে। সেখানে তো সমুদ্র।

'আজ্ঞে না। একটা শহর।

"শহর! [illegible] তো বলেন [illegible] ছাড়া আর কিছুই নেই।"

'ভুল বলেছে

"ভুল বলেছে?'

আপনারা আমার সঙ্গে চলেই বুঝবেন আপনাদের [illegible] আপ্যায়ণ করার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।"

"কিন্তু রোববার ম্যাটিনীর শো'তে সানডিয়েগোতে বাজাতে হবে আমাদের। রোববার থেকেই শুরু [illegible] বাজনার।"

"আপনাদের সানডিয়েগো পৌঁছে দেবার ভার আমার। রাজী?"

"রাজী।"

"তাহলে উঠে পড়ুন গাড়ীতে। বিশ মিনিটেই পৌঁছে যাব শহরে।"

টপাটপ গাড়ীর মধ্যে উঠে বসল চার জনে। ফ্রেসচেল গ্রামও আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ফের। বায়ুবেগে পশ্চিম দিকে ছুটে চলল মোটর গাড়ী। পনেরো মিনিট পরে ব্রেক কষল জলের ধারে।

"একী! এ যে সমুদ্র!" বলল ফ্রাসকোলিন।

"নদী! পেরোলেই সেই শহর।" বলল আগন্তুক।

একটা ফেরী নৌকোর ওপরে উঠে গেল গাড়ী। ওপারে জেটির গায়ে লাগতেই আবার হু-হু করে ছুটে চলল গাড়ীটা। বাগানের মধ্যে দিয়ে পৌঁছোলো একটা হোটেলের সামনে।

খিদের চোটে চোখে অন্ধকার দেখছিল চার বাজনদার। তাই আকণ্ঠ খেয়ে শুয়ে পড়ল একই ঘরে পাশাপাশি পাতা চারটে খাটে।

হালা বাজনার মতই স্বর মিলিয়ে নাক ডাকতে লাগল চার জনের।

৩॥ বাচাল গাইড

পরের দিন সকাল সাতটায় সময়ে শুরু হল তূর্যনিনাদের মত হাঁক ডাক। গলা এটে পিঙ্কিনাটের—"উঠে পড়ো! উঠে পড়ো! কালকেই সানডিয়েগো পৌঁছোতে হবে। আজকে দুপুরের মধ্যে দেখতে হবে এই শহরের চেহারা।"

ইভারনেস বেচারী চিরকালই পিটপিটে। তাকেও উঠতে হল ধড়মড়িয়ে। বাথরুমে ঢুকে দেখে এলাহি ব্যাপার। অত্যাধুনিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত সেখানে। সব কিছুই কলে চলছে। সুইচ টিপলেই ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা আর গরম জলের ঝর্ণা ঝরছে। স্প্রে-ডাকারে সুগন্ধি গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বুরুশ এসে মাথা ঘসে দিচ্ছে, পিঠের ময়লা তুলে দিচ্ছে, এমন কি জুতোর ধুলো ঝেড়ে কালি পর্যন্ত লাগিয়ে দিচ্ছে।

দেখে শুনে চোখ কপালে উঠল চার বাজনদারের। টেলিফোন যন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে পিঙ্কিনাট তো বলেই ফেলল—"আমার মনে হচ্ছে, টেলিফোন তুললেই এ-হোটেলের সব জায়গায়, এমন কি এ শহরের সব জায়গায় কথা বলতে পারব।"

ইভারনেস বলে উঠল—"ইউরোপ আমেরিকার যে কোনো জায়গাতেও এখান থেকে ফোন করা যাবে মনে হচ্ছে।"

ঠিক এমনি সময়ে টেলিফোন এল গতরাতের সেই অদ্ভুত আমেরিকান আগন্তুকের কাছ থেকে—"সুপ্রভাত বাজনদার! ক্যালিস্টার মুনবার

আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে এক্সেলসিয়র হোটেলে। প্রাতরাশ তৈরী। চলে আসুন চটপট।"

বটে! অদ্ভুত লোকটার নাম তাহলে ক্যালিস্টার মুনবার। আশ্চর্য খানদানী এই হোটের নাম এক্সেলসিয়র হোটেল। কিন্তু এতবড় একটা হোটেল এই শহর ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে আছে জানা ছিল না তো! গাড়োয়ানই বা ন্যাকা সাজল কেন?

ঘর থেকে বেরিয়েই মস্ত লিফট। লিফট থেকে বেরিয়েই খাবার ঘর। ধূমায়িত খাবার সামনে নিয়ে বসে ক্যালিস্টার মুনবার নামধারী সেই বিচিত্র মানুষটা।

খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল লোকটার বকবকানি। প্রশ্ন করতে দিল না। নিজেই বকে গেল একনাগাড়ে। আশ্চর্য শহরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে রইল একাই। খাওয়া শেষ হতেই চার বাজনদারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শহর দেখাতে।

শহরটা তৈরী হয়েছে প্ল্যানমাফিক। উল্টোপাল্টা ব্যাপার নেই কোথাও। রাস্তাঘাটের দুপাশে ফুটপাতে, ফুটপাতের কিনারায় বারান্দা। রাস্তায় রাস্তায় কাটাকুটি হয়েছে নিখুঁত সমকোণে—এক ডিগ্রীও কম বেশী নয়। দুপাশের বাড়ীগুলোর মধ্যে একঘেয়েমির ছিটেফোঁটা নেই। হরবখৎ নক্সা পাল্টাচ্ছে। প্রত্যেকটা বাড়ীই ছবির মত সুন্দর। বাজার-হাটের দু'একটা রাস্তা ছাড়া বাকী সব রাস্তার বাড়ীগুলো প্রাসাদোপম। সামনে সবুজ ঘাস-জমি, বাগান, মূর্তি, ফুলবাহার। সবরকম গাছের শোভা দেখা যায় এসব বাগানে। পশ্চিম আমেরিকার মত নয়। সেখানে নগরের ধারেই দানবিক গাছ। সূক্ষ্মতার বালাই নেই।

চার বাজনদারের মুখে কথাটা নেই। অবাক হয়ে শুধু দেখছে আর পথ হাঁটছে। পথঘাট দিব্বি ঝকঝকে তকতকে। ধূলোর চিহ্ন নেই কোথাও। পায়ের তলার ফুটপাতটা মনে হচ্ছে ধাতুর তৈরী।

ট্রাম লাইন পাতা রাস্তা বরাবর। বিলিয়ার্ড বলের মত মসৃণ গতিতে গাড়ী চলছে সেখানে। দামী দামী গাড়ীগুলো হু-উ-উ-স করে যেন উড়ে যাচ্ছে চক্ষের নিমেষে। কোথাও কোথাও ফুটপাত নিজে থেকেই চলছে। পথচারীরা শুধু দাড়িয়ে আছে। হাঁটতেও হচ্ছে না।

মিনিট কুড়ি হাঁটবার পর ক্যালিস্টার মুনবার বললে—"এই হল আমাদের থার্ড এভিন্যু। ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা। মোট তিরিশটা এভিন্যু আছে এ-শহরে।"

পিঙ্কিনাট বললে—"শুনে সুখী হলাম। কিন্তু রাস্তা তো খাঁ-খাঁ করছে। দোকানগুলোও মাছি তাড়াচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে কি করে বুঝলাম না তো।"

"চলছে টেলোটোগ্রাফে।"

"সেটা আবার কী ?"

"হাতের লেখা দূরে পাঠানোর যন্ত্র। টেলিফোন পাঠায় মুখের কথা, টেলিগ্রাম পাঠায় টরে-টক্কা, সিনেমাটোগ্রাফে ধরা পড়ে আপনার মুখ নাড়া, আর হাত নাড়া, ফোনোগ্রাফে রেকর্ড হয়ে যায় মুখের কথা, টেলিপ্রিন্টার পাঠিয়ে দেয় আপনার ফোটোগ্রাফ। কিন্তু আপনার হাতের লেখা যেখানে খুশী সুইচ টিপে পাঠিয়ে দেওয়ার যন্ত্র হল টেলোটোগ্রাফ। কেনাকাটা বা ব্যবস্থার কনট্রাক্ট সই করার জন্যে কাউকে আর সশরীরে কোথাও যেতে হয় না। টেলোটোগ্রাফ সে কাজ সেরে দেয়।"

"বিয়ের কনট্রাক্ট পর্যন্ত ?" বেঁকা সুরে শুধোলো পিঙ্কিনাট।

"মায় বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত, মিঃ ভায়োলা।"

নাইনটিনথ এভিন্যুতে দেখা গেল কেবল বড় লোকদের বাড়ী। একটা বাড়ী সত্যি দেখবার মত। সামনে অ্যালুমিনিয়ামের রেলিং।

ক্যালিস্টাস বললে—"এই হল এ-সহরের সবচেয়ে বড় লোকের বাড়ী। এঁর নাম জেম ট্যাঙ্কারডন। ইলিনয়তে অনেকগুলো তেলের খনির মালিক।"

"কত লক্ষ ডলারের মালিক ?" শুধোয় জর্ণ।

"ফুঃ! লক্ষ কি মশায়! কোটি বলুন! লাখ টাকার নোট এখানকার লোকের পকেটে পকেটে ঘোরে। সেইজন্যেই তো এখানকার খুচরো দোকানদাররা দুদিনেই ফুলে লাল হয়ে যায়। পাইকারী ব্যবসা কাউকেই করতে দেওয়া হয় না। কারখানা-ফারখানাও নেই। যে-যার জমা টাকা নিয়ে এখানে থাকে।"

"মেহনতী মানুষের দরকার হলে কি করেন ?" জর্ণের প্রশ্ন।

"বাইরে থেকে আনাই। কাজ ফুরোলে ফেরৎ পাঠাই।"

"ভিখিরীদের নিশ্চয় ঘাড় ধরে বার করে দেন না ?"

"ভিখিরী এ শহরে নেই। চোর জোচ্চোরও নেই। পাগল নেই, নিরাশ্রয় নেই। জেলখানা নেই, গলাকাটাও নেই। ওসব আছে যুক্তরাষ্ট্রে—এখানে নয়।"

সিবাসটিয়ান বললে—"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা আর আমেরিকার মাটিতে নেই।"

"কাল ছিলেন। আজ আছেন একটা স্বাধীন শহরের মাটিতে—যুক্তরাষ্ট্রের চোখ রাঙানি এখানে চলে না।"

"নাম জানতে পারি শহরটার ?"

"এখন নয়। পরে জানাবো।"

"কখন ?"

"সব দেখা শেষ হলে।" অদ্ভুত উত্তর। শুনে ভুরু কুঁচকোলো চার বাজনদার।

এর পরেই ওরা এসে পড়ল গরীব পাড়ায়। বাড়ীগুলোও তত বড় নয়। এখানকার লোকের রোজগার নাকি মোটে এককোটি ডলার !

"ভিখিরী বলুন !" মুখ ভঙ্গী করে বলল পিঙ্কিনাট।

"মিঃ ভায়োলা, দশকোটি যার রোজগার। তার কাছে দশ লাখ রোজগারী তো ভিখিরীই," বলল ক্যালিস্টার মুনবার।

প্রোটেস্ট্যান্টদের সাদামাটা গির্জেটা দেখা গেল এই পাড়াতেই।

৪ ॥ সুরকারদের মনে বেসুর বাজনা

বেলা এগারোটা নাগাদ ক্ষিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করতে লাগল প্রত্যেকেরই। ট্রামগাড়ীতে উঠে হোটেলে ফিরে এল কয়েক মিনিটেই।

খেতে বসেও মুখ থামাল না ক্যালিস্টার মুনবার। বকতেও পারে বটে লোকটা। কথার মধ্যে কৌতুক বিছিয়ে শ্রোতার মন টানতেও পারে। মতলব কি লোকটার ? সান ডিয়েগোর ট্রেন ফেল করিয়ে ছাড়বে নাকি ?

খাওয়া শেষ। চাটনী দেওয়া হচ্ছে ডিসে। এমন সময়ে ঝনঝন করে নড়ে উঠল টেবিলের কাঁচের বাসন। যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল কোথাও।

"কি ব্যাপার ?" চমকে উঠল ইভারনেস।

"ঘাবড়াবেন না।" মিষ্টি হেসে বললে ক্যালিস্টার মুনবার। "মানমন্দিরে কামান দাগা হল।"

"মশাই, পষ্টাপষ্টি বলুন দিকি সানডিয়েগোর ট্রেন কটায় ছাড়ছে ?" তেড়ে উঠল জর্ণ।

"সন্ধ্যের সময়ে" চোখ নাচিয়ে বলল ক্যালিস্টার মুনবার। "অত অস্থির হচ্ছেন কেন ? এখনো আধখানা শহর দেখতে বাকী।"

বলেই, চার বাজনদারকে নিয়ে ফের পথে নামল অদ্ভুত লোকটা। পথ চলতে গিয়ে এবার প্রত্যেকেই টের পেল পায়ের তলায় ফুটপাত যেন কাঁপছে !

অথচ, ফুটপাতটা চলন্ত ফুটপাত নয়!

বাকী আধখানা শহরের চেহারা কিন্তু অন্যরকম। লোকজনের ভীড়ে রাস্তাঘাট দোকানপসার গমগম করছে। পথচারীদের পথচলাও অনেক প্রাণবন্ত। এ-যেন আর একটা শহর।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখে থমকে দাঁড়াল ইভারনেস।

"ন্যাট কোভারলি-র প্যালেস," বলল পথপ্রদর্শক। "জেম ট্যাঙ্কারডনের মতই বড়লোক। নিউ অর্লিয়েন্সে অনেকগুলো ব্যাঙ্কের মালিক ছিলেন। ওঁর টাকার হিসেব নাকি হাতে গুনে রাখা সম্ভব নয়।"

"দুই বড়লোকের মধ্যে রেষারেষি আছে মনে হচ্ছে?" একটা জমকালো ক্যাথোলিক গির্জের সামনে দাঁড়িয়ে শুধোলো পিঙ্কিনাট।

"তা আছে। দুজনেরই মনে সাধ একাই এ-শহরের খবরদারি করার।"

ঘণ্টা দুয়েক লাগল শহরের শেষে পৌঁছোতে। সামনেই বাহারি রেলিং। ফুল গাছ। তার ওপাশে সবুজ মাঠ—দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

এইখানে এসে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করল ফ্রাসকোলিন। মনে খটকা লাগলেও বন্ধুদের কাছে তা ভাঙল না। বেলা দুটোয় সূর্যের থাকা উচিত দক্ষিণ-পশ্চিমের আকাশে। কিন্তু সূর্য রয়েছে দক্ষিণপূবের আকাশে!

ধাঁধাটা নিয়ে সবে ভাবতে শুরু করেছে ফ্রাসকোলিন, অমনি হেঁকে উঠল ক্যালিস্টার মুনবার—"চলুন, চলুন, ট্রামে উঠে পড়ুন। এবার বন্দর দেখাবো।"

"বন্দর?" অবাক হল জর্ন।

"দেখলেই বুঝবেন," বলে ট্রামে উঠে পড়ল ক্যালিস্টার মুনবার। সাজানো বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলল ট্রাম গাড়ী। তারপর শুরু হল আবাদী জমি। শস্য বোনার চিহ্ন দেখা গেল না কোথাও। শুধু আনাজ আর আনাজ। নানা রকম তরিতরকারী। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড কারখানা। দশ হাজার বর্গগজ জায়গা জুড়ে এতবড় কারখানা বড় একটা দেখা যায় না। কাঁচের ছাদ ফুঁড়ে লোহার চিমনী উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। কালো ধোঁয়ার বদলে পাতলা বাষ্পের মেঘ বেরিয়ে আসছে চিমনীর মুখ দিয়ে। বাতাস দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই প্রথম কারখানা চোখে পড়ল এ-শহরে। ক্যালিস্টার মুনবার সঙ্গে সঙ্গে তড়বড় করে বুঝিয়ে দিল। এ কারখানার পত্তন হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে। শহরের টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রান্নাবান্না, কলকব্জা, আলো, অ্যালুমিনিয়াম চাঁদ আর ডুবো তার চালু রাখার জন্যে যা কিছু বিদ্যুৎ দরকার, চালান হয় এই কারখানা থেকে। কারখানা চলে তেলের শক্তিতে।

"ডুবো তার মানে ?" সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ফ্রাসকোলিন।

"আমেরিকার উপকূলের সঙ্গে ডুবোতার মারফৎ যোগাযোগ রয়েছে শহরের," বুঝিয়ে দিল মুনবার।

বন্দরে পৌঁছে দেখা গেল গোটা ছয়েক তেলের জাহাজ আর মাল-জাহাজ ভাসছে সেখানে। বিদ্যুৎ-চালিত মাছ ধরা নৌকোও রয়েছে অনেকগুলো। বন্দরটা দেখতে ঠিক ডিমের মত।

এইখানে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করল ফ্রাসকোলিন। চলন্ত জাহাজের গা দিয়ে জলের স্রোত যেভাবে ছুটে যায়, বন্দরের কিনারা দিয়েও জলের স্রোত ছুটছে সেইভাবে।

রহস্যটা ধরতে পারল না ফ্রাসকোলিন। মুনবারকে বললে—"কাল রাতে একটা নদী পেরিয়ে এসেছিলাম। কোথায় সে নদী ?"

"পেছনে।"

এবার রুখে উঠল জর্ন—"সানডিয়েগোর ট্রেনটা শেষ পর্যন্ত ধরতে পারব তো ?"

"কথা দিচ্ছি, কাল সকালে আপনি যেখানে আছেন সেখানে আর থাকবেন না।"

কি কথার কি উত্তর ! ধাঁধায় পড়ল চার বাজনদার। কিন্তু খামোকা প্রশ্ন করে লাভ নেই বুঝে চুপ করে রইল।

আরেকটা ট্রাম গাড়ীতে সবাইকে নিয়ে উঠে পড়ল মুনবার। সমুদ্রের ধার দিয়ে ধেয়ে চলল ইলেকট্রিক ট্রাম। চার মাইল আসার পর দেখা গেল পাশাপাশি সাজানো বারোটা কামান।

পকেট থেকে ঘড়ি বার করে বোতাম টিপল ক্যালিস্টার মুনবার। অমনি কথা কয়ে উঠল ঘড়ি—"চারটে বেজে তেরো মিনিট।"

আবার চলতে শুরু করেছে ট্রাম। সব্জী চাষের জমিতে ফোয়ারা দিয়ে জল ঝরে পড়ছে অনিবার। সমান ভাবে জল পড়ছে সব জায়গায়— যা বৃষ্টির জলেও হয় না।

সাড়ে চারটা বাজল। দেড়শ ফুট উঁচু একটা টাওয়ারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ট্রাম গাড়ী। টাওয়ারের মাথায় প্রকাণ্ড ঘড়ি। টাওয়ার ঘিরে মানমন্দিরের উঁচু উঁচু বাড়ী। টাওয়ারের ছাদে উঠলে ষোল মাইল দূর পর্যন্ত দেখা যাবে স্পষ্ট।

লিফটে উঠে বসল মুনবার। চার বাজনদার নির্বাক হয়ে গেছে। পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পরে চূড়োয় পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল লিফট। সামনেই একটা প্রকাণ্ড

পতাকা উড়ছে। আমেরিকার পতাকা বলেই মনে হয়। কিন্তু বাতষট্টিটা তারার বদলে রয়েছে একটি মাত্র প্রকাণ্ড সোনার তারা। ভাবখানা যেন সারা আমেরিকা এক হয়ে গিয়েছে। ঐ পতাকা তার নিদর্শন।

ছোট্ট ছাদটায় ছুটে বেরিয়ে এল চারজনে।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল চারজনেই। বিস্ময় আর ক্রোধে ফেটে পড়ল সেই চীৎকারের মধ্যে।

ডাঙার চিহ্ন কোথাও নেই। যেদিকে দুচোখ যায়, কেবল জল আর জল। চার বাজনদার দাঁড়িয়ে আছে একটা দ্বীপের মধ্যে—টাওয়ারের মাথায়!

অথচ, কাল রাত্রে ফ্রেসচেল গ্রাম থেকে মাইল দুয়েকের বেশী মোটরে আসেনি ওরা; নদী পেরিয়েই পা দিয়েছিল এই শহরে। তা সত্ত্বেও ষোল মাইলের মধ্যেও ডাঙার চিহ্ন নেই কেন? একটা ডিসের মত প্রকাণ্ড ভূখণ্ডটা ভাসছে সাগরের জলে।

রেগে তিনটে হয়ে ক্যালিস্টার মুনবারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ফ্রাসকোলিন—"ঠিক করে বলুন, এটা দ্বীপ কিনা!"

"দেখতেই পাচ্ছেন," অমায়িক হাসি হাসল মুনবার। চোখে কৌতুক।

"নাম কি দ্বীপের?"

"স্ট্যানডার্ড আযল্যাণ্ড।"

"শহরের নাম?"

"মিলিয়ার্ড সিটি।"

৫॥ মিলিয়ার্ড শহর

জাহাজ প্রপেলারে চলে, স্টানডার্ড আ:যল্যাণ্ডও প্রপেলারে চলছে। যেহেতু মিলিওনেয়ার (লাখোপতি) ছাড়া এ শহরে ঠাই পায়না কেউ, তাই শহরের নাম রাখা হয়েছে মিলিয়ার্ড সিটি। রথসচাইল্ড-যের মত টাকার কুমীর এ-শহরে গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যায়।

অসাধ্য সাধন করেছে ইঞ্জিনীয়ার আর লোহার মিস্ত্রীরা। দ্বীপটা শুধু নকল নয়, চলন্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকার বেশ কিছু ধনকুবেরের সখ হল সমুদ্রে ভাসমান হোটেল-রেস্তোরাঁয় খানা খাবে, থিয়েটারে নাটক দেখবে, ক্লাবে আড্ডা মারবে, টুরিস্টরা একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচবে। ভেলাগোছের বিরাট কিছু একটা বানিয়ে নিলেই এ-সাধ মিটত। কিন্তু আমেরিকানরা

চিরকালই সব কিছুই একটু বড় আকারে করতে চায়। পুঁচকে পরিকল্পনায় মন ওঠে না। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ভাসমান ভেলাটাকে চলমানও করতে হবে। সোজা কথায় একটা চলন্ত দ্বীপ বানাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হল। শেষ হল চার বছর পরে।

ইয়াংসিকিয়াং-য়ে ভাসমান গ্রাম দেখা যায়, আমাজন আর ড্যানিউব নদীতেও গ্রামকে ভেসে যেতে দেখা যায়। কিন্তু সে গ্রাম হল অস্থায়ী গ্রাম। বড় বড় কাঠের ওপর খান কয়েক কুঁড়ে এক জায়গা থেকে ভেসে আরেক জায়গায় পৌঁছোয়। তারপর ভেলা ভেঙে ফেলা হয়। বাড়ীগুলোকে ডাঙায় তুলে নেওয়া হয়।

কিন্তু এ-দ্বীপ সেরকম কিছু নয়। স্থায়ী ভাবে যাতে সমুদ্রে ভেসে থাকে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড, সেই ভাবেই তৈরী হল দ্বীপের কাঠামো। তৈরী হল খাঁটি ইস্পাত দিয়ে। দুলক্ষ সত্তর হাজার ওয়াটার টাইট কমপার্টমেণ্ট পাশাপাশি বসিয়ে তৈরী হল মূল দ্বীপটা। এক-একটা কমপার্টমেণ্টের সাইজ হল লম্বায় দশ গজ, চওড়ায় দশ গজ, উচ্চতায় আঠারো গজ। তার মানে, প্রত্যেকটা কম্পার্টমেণ্টের ওপরকার ক্ষেত্রফল একশ বর্গগজ। নাট-বল্টু-রিভেট দিয়ে কামরাগুলোকে জোড়বার ফলে পাওয়া গেল দু কোটি সত্তর লক্ষ বর্গগজ পরিমিত একটা ভাসমান দ্বীপ। ডিমের মত দ্বীপ। লম্বায় সাড়ে চার মাইল, চওড়ায় তিন মাইল, কিনারা বরাবর এক-চক্কর ঘুরলে এগারো মাইল।

জলে ভাসানোর পর দেখা গেল জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে তিরিশ ফুট। জল থেকে ওপরে উঠে রয়েছে বিশ ফুট।

দ্বীপ তৈরী হল ম্যাডেলীন উপসাগরে। দরকার মত মেরামতির জন্যে এখানেই তা সেরে নেওয়ার বন্দোবস্তও রইল।

মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল লোহার দ্বীপ। সেই মাটির ওপর চাষ করা হল তরিতরকারীর। সবুজ বাগান, মাঠ, ফুলগাছ, ঢ্যাঙা গাছ, ঝাঁকড়া গাছ, বেঁটে গাছ—সব কিছুই চড়চড় করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল উর্বর মাটিতে। ইলেকট্রো-কালচারের দৌলতে গাছপালা বেড়ে চলল অবিশ্বাস্যবেগে। সাত পাউণ্ড ওজনের গাজর, আঠারো ইঞ্চি লম্বা মূলো জন্মাতে লাগল বৈজ্ঞানিক চাষের ফলে। সব আনাজই বেড়ে উঠল দানবিক আকারে।

কিন্তু গম-যবের চাষ করা হল না সেখানকার মাটিতে। তার দরকার কী? বাইরে থেকে আনিয়ে নিলেই হল। দুধ, মুরগী আর ডিমের ব্যবস্থা অবশ্য দ্বীপের মধ্যেই রইল—এ-ব্যাপারে জাহাজী চালানের ওপর ভরসা রাখতে রাজী নয় চলন্ত দ্বীপের বাসিন্দারা।

সতেরো বর্গমাইল জায়গার পাঁচভাগের এক ভাগ জুড়ে গজিয়ে উঠল মিলিয়ার্ড সিটি। অন্যান্য আমেরিকান শহরে যান্ত্রিক সুখ থাকে অঢেল—থাকে না কেবল সূক্ষ্ম শিল্প দিয়ে মন ভরানোর ব্যবস্থা। এ-শহরে সে-ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি রইল না। ডিমের মত শহরের ঠিক মাঝখানে রইল ফার্স্ট এভিন্যু। একদিকে মানমন্দির। আরেক দিকে টাউন হল। এইখানেই রইল পুলিশ অফিস, কাস্টম অফিস, গোরস্থান, হাসপাতাল, স্কুল, জলের অফিস, চারুশিল্প আর বিজ্ঞান কেন্দ্র।

স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যা দশ হাজার। আমেরিকার নাগরিক প্রত্যেকেই। পাছে উত্তর আর দক্ষিণের মার্কিনিরা মারামারি বাঁধায় এক জায়গায় থাকলে, তাই উত্তরের ইয়াঙ্কিরা থাকে চলন্ত দ্বীপের একদিকে। দক্ষিণের ইয়াঙ্কিরা আরেক দিকে।

ইস্পাতের কাঠামো তৈরী হওয়ার পর তার ওপর বাড়ী ঘর দোর তৈরী শুরু হল খুব হাল্কা ধাতু দিয়ে। অ্যালুমিনিয়াম লোহার চাইতে সাতগুণ হাল্কা। সুতরাং তাই দিয়েই গড়ে উঠল সারি সারি বাহারি বাড়ী। কাঁচের ইঁট আর কংক্রীটের চাঁই পর্যন্ত চালান এল দ্বীপে ইমারত নির্মাণের জন্যে।

চলন্ত দ্বীপের সব কিছুর মালিক কিন্তু আয়ল্যাণ্ড কোম্পানী। বাড়ী ঘর দোর জায়গা জমি—সব এই কোম্পানীর। যত টাকাই থাকুক না কেন, এখানে থাকতে হলে ভাড়াটে হিসেবে থাকতে হবে। ভাড়ার টাকাই তো কোম্পানীর আসল লাভ। শুধু হোটেল থেকেই ভাড়া আসে লক্ষ লক্ষ ডলার। এ হোটেলে উঠতে হলে কুবেরের মত টাকা থাকা চাই। ঘর ভাড়া আর খাবারের দাম এত বেশী যে শুনলে সাধারণ লোকের মাথা ঘুরে যাবে।

ভাড়াটেদের মধ্যে সব শ্রেণীর মানুষ আছে। ব্যবসাদার, অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার—কেউ বাকী নেই। উকিলদের অবশ্য মক্কেল জোটে না এখানে। মামলা করার মত অপরাধ ঘটলে তো! ডাক্তারদেরও রুগী জোটে না! কেননা, সমুদ্রের খোলা হাওয়ায় জীবাণু নেই। রোগও হয় না। জরা না হলে কেউ মরতে চায় না।

চলন্ত দ্বীপে একটা সৈন্যবাহিনীও আছে। কর্নেল স্টুয়ার্ট পাঁচশ সৈন্য নিয়ে দ্বীপ আগলান দিবারাত্র। সমুদ্রে বোম্বেটে আছে। লুঠেরা আছে। জংলী-দ্বীপের হানাদার আছে। সৈন্যদের মাইনে অবশ্য ইওরোপের যে কোনো জেনারেলের সমান। পুলিশও আছে বিস্তর। দ্বীপের পাড় বেয়ে যাতে অনাহূত লোক ঢুকে না পড়ে, তাই নজর রাখে পাড়ের ওপর অষ্টপ্রহর। কেউ ধরা পড়লে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় জাহাজে করে।

জাহাজে করেই দ্বীপের জিনিসপত্র চালান আসে ডাঙা থেকে। খাবার দাবার, জামা কাপড়, সৌখীন জিনিসপত্র—সমস্ত কিছু চড়া দামে বিকিয়ে যায় সওদাগররা।

চলন্ত দ্বীপ উদ্দেশ্যহীন ভাবে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় না। আয়ল্যাণ্ড কোম্পানী আবহাওয়া-অফিসের পরামর্শ মত ঠিক করে কোন-কোন জায়গা দিয়ে চলন্ত দ্বীপ সাগর পাড়ি দেবে। ডাঙার জাহাজগুলো সেই প্রোগ্রাম দেখে সারা বছর ধরে আসে চলন্ত দ্বীপে মালপত্র নিয়ে।

লোনা জলে ভাসলেও মিষ্টি জলের অভাব নেই দ্বীপে। সমুদ্রের জল থেকেই নুন বাদ দিয়ে মিষ্টি জল তৈরী করে নেওয়া হয় দ্বীপে—পাইপে করে চালান হয় মিলিয়ার্ড সিটিতে, চাষের জমিতে।

খুব জোরে যাওয়ার দরকার হয় না বলেই সারাদিনে মাত্র পনেরো থেকে বিশ মাইল পথ পাড়ি দেয় স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড।

ইলেকট্রিক কারখানায় কয়েক শ বয়লার আর দুটো অতিকায় জেনারেটর থেকে উৎপন্ন হচ্ছে ২০০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ শক্তি। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের দু'দিকে দুটো বন্দর। অত্যন্ত শক্তিশালী দুটো ইঞ্জিন বসানো আছে এই দুটো বন্দরে, মানে, স্টারবোর্ড বন্দরে আর লারবোর্ড বন্দরে। প্রতিটি ইঞ্জিনের শক্তি পঞ্চাশ লক্ষ হর্স পাওয়ার অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ ঘোড়ার সমান। এ-কারখানা পেট্রলে চলে—তাই কালিঝুলি কোথাও নেই।

এই ইলেকট্রিসিটি দিয়ে চালু রয়েছে চলন্ত দ্বীপের সমস্ত যন্ত্র। এমন কি নকল চাঁদ পর্যন্ত জ্বলছে কারখানার বিদ্যুতে। এক-একটা নকল চাঁদের দ্যুতি ৫০০০ মোমবাতির সমান।

আশ্চর্য এই দ্বীপ—যার আরেক নাম 'প্রশান্তের মুক্তো'—দ্বিতীয় সফরে বেরিয়েছে প্রশান্তের জলে। ক্যালিফোর্ণিয়ার ডাঙা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিল গতকাল রাতে শুধু চার বাজনদারকে তুলে নেওয়ার জন্যে। ক্যালিস্টার মূলবার আগাগোড়া ধোঁকা দিয়েছে ওদের। আমেরিকার মাটি থেকে চলন্ত দ্বীপের মাটিতে আসার সময়ে সমুদ্রের খালি জলকে নদী বলে চালিয়েছে।

৬ ॥ নেমন্তন্ন

প্রচণ্ড রাগে একই সঙ্গে ফেটে পড়ল চার বাজনদার।

জর্ন বললে—"বদমাস!" ফ্রাসকোলিন বললে—"জানোয়ার!" ইভাবনেস বললে—"মন্দ কী! নতুন দেশ দেখা তো হবে!" ফ্রাসকোলিন তিড়বিড়িয়ে

বললে—"খবরটা কে দেবে? তুমি?" পিঙ্কিনাট বললে—"ও সব শুনছি না। কোর্টে গিয়ে এখুনি নালিশ ঠুকছি ইয়াঙ্কি ধাপ্পাবাজের নামে!" জর্ন বললে—"জল্লাদ ডেকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা না করে ছাড়ছি না।"

ক্যালিস্টার মুনবার দূরদর্শী পুরুষ। তাই আগেভাগেই সটকেছিল লিফট নিয়ে। ছাদে দাঁড়িয়ে লম্ফঝম্পই সার হল চার জনের। নীচে নামার পথও বন্ধ। সিঁড়ি তো নেই। দেড়শ ফুট উঁচু থেকে দেখা যাচ্ছে নীচের চত্বর। রাস্তাঘাটে লোকজন চলছে। চত্বরে লোক গিজগিজ করছে। পার্কে ইয়াঙ্কি জোয়ানরা টেনিশ খেলছে, ঘোড়ায় চড়ে পোলো খেলাও হচ্ছে। বাজার অঞ্চলে বেচাকেনাও চলছে। গাছের তলায়, বেঞ্চিতে, ইলেকট্রিক গাড়ীতে পুরুষ ও নারী বসে বসে গল্প করছে। সুখ আর শান্তি বিরাজিত সর্বত্র—কেবল এই চারজনের বক্ষ ফুটছে ভয়ংকর ক্রোধে।

জর্ন চিরকালই বগচটা মানুষ। পকেট থেকে ছুরী বার করে ছুটে গেল পতাকাটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলার জন্যে। অতিকষ্টে আটকে রাখা হল তাকে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা মূর্খতা হবে।

নীচের লোকদের হাত নেড়ে ডাকলে কেমন হয়? টাওয়ারের পেল্লায় ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা বাজল সুরেলা যন্ত্রসংগীতের পর। চার বাজনদার রেলিং থেকে ঝুঁকে পড়ে গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগল নীচের লোকদের।

হাঁক ডাক নীচে পৌঁছোলো। মুখ তুলে চাইল অনেকেই। হাত নেড়ে কেউ বললে—"গুড আফটারনুন।" কেউ বললে—"খবর ভালো?" কেউ বলল—"আছেন কেমন?"

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল পিঙ্কিনাট—"ওরা রগড় দেখছে। দেখছেন না মুখ টিপে টিপে হাসছে? নিশ্চয় খবর পেয়েছে আমরা এসেছি।"

এদিকে ক্ষিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। কাঁহাতক এই অত্যাচার সহ্য করা যায়? ইয়াঙ্কি মুনবার তো কম বদমাস নয়! টঙে তুলে দিয়ে লিফটা নিয়ে পালিয়েছে।

নীচের ভীড় আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসছে। ক্ষিদে প্রত্যেকেরই পেয়েছে। যে-যার বাড়ী যাচ্ছে ভাল মন্দ খেতে।

হঠাৎ একটা আওয়াজ শোনা গেল। লিফট উঠে এসেছে। ওরা ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আপনা থেকেই নেমে গেল নীচে।

ভারী সুন্দর কব্জার ওপর খুলে গেল হলঘরের দরজা।

হুড়মুড় করে চারজনে বেরিয়ে এল বাইরে। সামনেই যে রাস্তা পাওয়া গেল, সেই রাস্তা ধরেই ছুটে গেল অনেক দূর। রাস্তায় টুরিস্টের সংখ্যাই বেশী মনে হল। খুব একটা কৌতূহল দেখাল না চার বাজনদারের ক্ষিপ্ত মূর্তি দেখে।

চারজনেরই কিন্তু কেন জানি মনে হল, আড়াল থেকে ওদের ওপর শ্যেন-দৃষ্টি রেখেছে ক্যালিস্টার মুনবার।

ফার্স্ট এভিন্যু দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরেই সামনে পড়ল একটা রেস্তোরাঁ। আগে তো পেটের জ্বলুনি বন্ধ হোক—তারপরের ভাবনা পরে। এই ভেবে চারজনে ঢুকে পড়ল রেস্তোরাঁয়। খাওয়া শেষ হতে বেশী দেরী হল না। মেজাজটা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল পেটে খাবার পড়তেই। এমন সময়ে এসে পৌঁছোলো খাবারের বিল।

দেখেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল ফ্রাসকোলিনের। বার দুয়েক চেয়ার ছেড়ে ছিটকে উঠেই ফের থপ করে বসে পড়ল চেয়ারেই।

"অমন করছো কেন ?" অবাক হল ইভারনেস।

"আপাদ মস্তক শিউরে উঠছে বলে," বলল ফ্রাসকোলিন। "কত বিল হয়েছে জানো ? মাথাপিছু ১৬০ ডলার !"

"অ্যাঁ !" বাকী তিনজনের চোখে এবার সর্ষে ফুল ভেসে উঠল যেন। "এক-একটা খানার দাম ১৬০ ডলার !"

ঢোঁক গিলে পিঞ্চিনাট বললে—"পেছোলে চলবে না। ফ্রান্সের নাম ডোবাতে পারব না। বিল মিটিয়ে দাও। তারপর টোস্ট খাবার পয়সা থাকবে না জানি, কিন্তু—"

হঠাৎ পেছন থেকে শোনা গেল কৌতুক তরলিত কণ্ঠস্বর—"জেন্টেলমেন আপনাদের কিছুই দিতে হবে না।"

লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল চার বাজনদার। পেছনে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে ক্যালিস্টার মুনবার।

দাঁত কিড়মিড় করে বলল জর্ন—"এইবার পেয়েছি তোমায় !"

"আগে চলুন কফি রুমে" বলল মুনবার। "তারপর—"

"আপনার টুঁটি ছিঁড়ব !" বলল জর্ন।

"ঠিক উল্টোটা করবেন। মানে, আমার গলা জড়িয়ে ধরবেন।" বলে সবাইকে নিয়ে কফিরুমে এল মুনবার।

এবং শুরু করল তার আশ্চর্য কাহিনী।

"জেন্টেলমেন, আমার নাম আপনারা শুনেছেন। আমি এ-দ্বীপের কলা বিভাগের অধ্যক্ষ। নাচ, গান, বাজনা, ছবি আঁকা, মূর্তি তৈরী ইত্যাদি সব রকম সুকুমার শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে মাথা ঘামানোই আমার কাজ।

"আমি বলব এখন শুধু বাজনার কথা। যন্ত্রের মাধ্যমে বাজনা শুনে শুনে কান পচে গেছে দ্বীপবাসীদের—"

"ফোনোগ্রাফের বাজনা আবার বাজনা নাকি।" মুখ বেঁকিয়ে বললে ইভারনেস। "টিনের মাছ আর টাটকা মাছে যে প্রভেদ, ফোনোগ্রাফের বাজনা আর চোখে দেখে কানে শোনা বাজনার মধ্যেও সেই একই প্রভেদ!"

মুনবার বললে—"আমাদের ফোনোগ্রাফ কি জিনিস তা আপনারা জানেন না। এ যন্ত্রের নাম দিয়েছি থিয়েট্রোফোন। মানে আপনারা ইউরোপ আমেরিকার যে কোনো হলে বসেই বাজনা বাজান না কেন, ডুবোতারের মাধ্যমে সে বাজনা আমরা এখানকার ক্যাসিনো-তে বসে শুনতে পাব। ডুবোতারের একটা মুখ আছে ম্যাডেলীন উপসাগরে। আর অনেকগুলো মুখ বয়া ভাসিয়ে রাখে প্রশান্ত মহাসাগরের নানান জায়গায়। আমরা খুশীমত যে কোনো একটা ডুবোতারে আমাদের তার লাগিয়ে নিয়ে বাজনা শুনি আপনাদের। এমন কি আমাদের হাততালির আওয়াজও পৌঁছে দিই আপনাদের কনসার্ট হলে। কিন্তু যন্ত্রের মাধ্যমে এ-বাজনাও আর ভাল লাগছে না মিলিয়াড শহরের মানুষের। তারা চায় বাজনদারদের সামনে বসিয়ে বাজনা শুনতে। আপনারাই প্রথম এসেছেন এ-দ্বীপে তাঁদেব বাজনা শোনার নেশা মেটাতে।"

"ইচ্ছার বিরুদ্ধে?" ফোঁস করে উঠল জর্ন।

"মোটেই না। এই নিন বারোমাসের কনটাক্ট। তলায় চারজনে সই করে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"না পড়েই সই করব?"

"বললাম তো বারোমাসের চুক্তি। ঠিক এক বছর পরে মিলিয়ার্ড সিটি পৌঁছোবে ম্যাডেলীন উপসাগরে। আপনারা সেখান থেকে চলে যাবেন সান ডিয়েগোতে।"

"তখন তারা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে।"

"মোটেই না। মাথায় তুলে নাচবে। আপনাদের মত আমেরিকা বিখ্যাত শিল্পীর সান্নিধ্য লাভ কি সোজা কথা?"

আশ্চর্য লোক বটে! রাগ করতে গিয়েও মেজাজ জল হয়ে আসে।

ফ্রাসকোলিন কনট্রাক্টটা টেনে নিয়ে পড়ল আগাগোড়া।

শুধোলো—"টাকার পরিমাণটা খুলে বলুন তো।"

"বছরে দুলক্ষ ডলার।"

"চার জনের?"

"পাগল! মাথা পিছু।"

"টাকাটা দেবেন কি ভাবে?"

"তিন মাসের পেমেণ্ট অ্যাডভান্স পাবেন। এই নিন এখুনি।" বলে পকেট থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলারের চারটে বাণ্ডিল বার করল মুনবার।

জর্ন তাতেও ঠাণ্ডা হল না। বললে—"এক জোড়া বুট কিনতেই তো পাঁচশ ডলার লাগবে এখানে। ও টাকা তো ফুটকড়াই হয়ে যাবে।"

"অবাক করলেন মশায়!" সত্যি সত্যিই যেন আকাশ থেকে পড়ল ক্যালিস্টার মুনবার। "অনেক ভাগ্য, তাই আপনাদের পেয়েছি। পকেট থেকে একটি পয়সাও খরচ করতে দেব ভাবছেন কি করে?"

এর পরেও কি রাগ করে থাকা যায়? ফিক করে হেসে ফেলল সিবাসটিয়ান জর্ন।

৭ ॥ পশ্চিম দিকে

পরের দিন সকাল বেলা এক্সেলসিয়র হোটেল থেকে ক্যাসিনোতে উঠে এল চার বাজনদার। প্রত্যেকেই এক একটা ঘর পেল থাকার জন্যে—আড্ডা মারবার জন্যে রইল আর একটা বাড়তি ঘর চার জনের নামে।

ক্যাসিনোর সামনেই স্ট্যানডার্ড আয়লাণ্ডের সুবিখ্যাত মিউজিয়াম—মাঝে ফার্স্ট এভিন্যু। পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে এই মিউজিয়ামের জন্যে—যা দাম হওয়া উচিত, তার একশগুণ বেশী দাম দিতেও কার্পণ্য করেনি মুনবার।

বাকী ছিল ক্যাসিনোর কদর বাড়ানোর দায়ীত্ব। সে ব্যবস্থাও হয়ে গেল চার বাজনদারের আবির্ভাবের পর। সত্যি সত্যিই রাজার হালে রইল চারজনে। মালপত্র সানডিয়েগো পৌঁছে গিয়েছিল ওদের আগেই। তার বদলে অনেক দামী জিনিসপত্র পৌঁছে গেল প্রত্যেকের আলমারীতে। ক্যালিস্টার মুনবার করিতকর্মা পুরুষ। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই জামা কাপড় জুতো মোজার জন্যে আর ক্ষোভ রইল না চার জনের।

বড় রাস্তাগুলোয় বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা হল ইলেকট্রিক হরফে। ফার্স্ট এভিন্যুর নকল চাঁদের রোশনাইয়ের তলাতেই জ্বল জ্বল করতে লাগল চার বাজনদারের আসন্ন বাজনার বিজ্ঞাপন। টিকিট পড়তে পেল না, দুশ ডলারের টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ক্যাসিনোয়। আসন সংখ্যা যদিও মাত্র একশ। তাহলেও মাথাপিছু দুশ ডলার গুনে দিয়ে বাজনা শোনার মত সমঝদারের অভাব হল না। ফোনোগ্রাফ আর থিয়েট্রোফোন সত্যিই একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। টিকিট বিক্রীর হিড়িক থেকেই তা প্রমাণ হয়ে গেল।
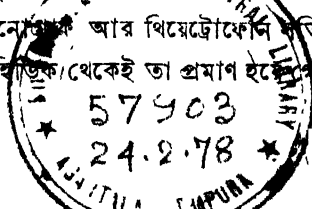
আয়ল্যাণ্ড কোম্পানী বেশ কিছু মুনাফা লুটে নিলে বাজনার আসর বসিয়ে। চার বাজনদারকে দিয়ে থুয়েও তহবিলে থেকে গেল মোটা মুনাফা।

চার জনের সে সব নিয়ে ভাবনা নেই। দারুণ খুশী প্রত্যেকেই। মন্দ কী। বছরে দুলক্ষ ডলার ফাঁকতালে আসছে—একটি পয়সাও খরচ হচ্ছে না। এমন কি খবরের কাগজ পর্যন্ত কিনতে হয় না। এ শহরেই দুটো কাগজ ছাপা হয়। 'স্টারবোর্ড ক্রনিকল' এবং 'নিউহেরাল্ড'—জেম ট্যাঙ্কারডন আর ন্যাট কোভার্লির পৃষ্ঠপোষকতায়। লাইব্রেরী থেকেও বই চাইলে চলে আসছে তক্ষুণি। ফোনোগ্রাফিক বইও আসছে বিস্তর। এ-বই চোখ মেলে পড়তে হয় না। কান খুলে শুনতে হয়। সুইচ টিপলেও কলের মানুষ বই পড়ে শুনিয়ে দেয়!

মিলিয়ার্ড শহরের লাইব্রেরীয়ানের মাইনেটি বড় কম নয়! মাসে পঁচিশ হাজার ডলার!

এগারোই জুন প্রথম বাজনা বাজাল চার বাজনদার। সেদিন স্বয়ং গভর্নরও উপস্থিত ছিলেন ক্যাসিনোয়। মুহুর্মুহু করতালির মাঝে বারান্দায় বেরিয়ে এল চার জনে। দেখল, ফার্স্ট এভিন্যুতে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে ওদের দেখে ধন্য হবার জন্যে।

দুটি মানুষকে বড্ড বেশী করে চোখে পড়ল ইভারনেসের। হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ় আর প্রৌঢ়া। প্রৌঢ়ের বয়স বছর পঞ্চাশ—প্রৌঢ়ার বয়স কয়েক বছর কম। দুজনেরই মাথায় পাক ধরেছে। দুজনেরই চোখে মুখে চেহারায় ধীর গম্ভীর আভিজাত্য।

"ওরা কারা?" আঙুল তুলে ক্যালিস্টার মুনবারকে শুধোলো ইভারনেস!

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল মুনবার—"গান পাগল!"

"ক্যাসিনোর টিকিট কাটেননি কেন?"

"বোধহয় পয়সায় কুলোয়নি বলে।"

"কত রোজগার ওঁদের?"

"বছরে এক লক্ষ ডলারও নয়।"

"দূর! দূর! ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল পিঞ্চিনাট—"রাস্তার ফকির বললেও চলে। নাম কি ওঁদের?"

"মেলকার্লির রাজা আর রাণী।"

৮॥ স্যাণ্ডউইচ আয়ল্যাণ্ড

স্যাণ্ডউইচ আয়ল্যাণ্ডের চেহারা দেখা গেল ন'ই জুলাই। হৈ-হৈ রব উঠল চলন্ত দ্বীপে। কর্ণেল স্টুয়ার্ট তৈরী রইল সৈন্যসামন্ত নিয়ে। হাতে

হাতে ঘুরতে লাগল দূরবীন। ওয়াহু থেকে শখানেক গজ দূরে এসে স্থির হয়ে ভেসে রইল চলন্ত দ্বীপ।

হনলুলুতে এর আগেও একবার এসেছে চলন্তদ্বীপ। এ-বার রইল দশ দিন। দ্বীপের বড়লোকেরা দলে দলে নেমে গেল ফুর্তি করতে। ডাঙা থেকেও দলে দলে নৌকো এল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে। কিন্তু কাস্টম পুলিশ কাউকেই উঠতে দিল না ওপরে।

এই সময়ে একটা অদ্ভুত নৌকোকে টহল দিতে দেখা গেল চলন্ত দ্বীপের চার ধারে। মালয় নৌকো। মাঝিমাল্লার সংখ্যা বারো। দুটো পালের টানে বেশ জোরেই ছোটে নৌকোটা। ক্যাপ্টেনের চেহারা বেশ চটপটে। দিন নেই রাত নেই কেচ-নৌকোটা যখন তখন টহল দিয়ে গেল চলন্ত দ্বীপের পাড় ঘেঁসে। যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গেল কোথায় কি আছে।

রহস্যজনক নৌকোর উদ্দেশ্য যে ভাল নয়, তা বুঝলেও কেউ মাথা ঘামাল না। দশ হাজার লোক রয়েছে চলন্ত দ্বীপে। ওরা মাত্র বারো জন। অত ভয় পাওয়ার কি আছে?

৯ ॥ নিরক্ষ বৃত্তের ওপরে

স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে বড়লোক ছাড়া কেউ ঠাঁই পায় না। বড়লোকরা এখানে আসে শান্তিতে ছুটি কাটাতে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তো কোথাও থাকে না। এখানেও নেই। অনেক দিনের একটা কোঁদল তুষের আগুনের মতই ধিকিধিকি জ্বলছিল চলন্ত দ্বীপের বড়লোকদের মনের ভেতর।

এ-কোঁদল চলন্ত দ্বীপের যথা-ব্যবহার নিয়ে। এতবড় একটা বৈজ্ঞানিক কীর্তি কি শুধু সাগর-বিহারের কাজেই লাগবে? মাল বওয়ার কাজে লাগালেও তো দু'পয়সা আসে! মোটা মুনাফা লোটা যায়। সোজা কথায় স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে নিয়ে কারবার ফাঁদলে ক্ষতি কী?

এই তত্ত্বের প্রবক্তা হল জেম ট্যাঙ্কারডন এবং তাঁর সমর্থকরা। ভদ্রলোক খাঁটি ইয়াঙ্কি। বিরাট চেহারা। দেখতে অনেকটা বুলডগের মত। তাঁর বউটিও স্বামীর মতই। দুজনেই বড়লোকি দেখাতে ভালবাসেন। কিন্তু এঁদের বড় ছেলেটি ঠিক উল্টো। ওয়াল্টার ট্যাঙ্কারডন ছেলে হিসেবে খাসা। খেলাধূলায় চোস্ত। দেখতে শুনতেও অপরূপ! ভদ্র, বিনয়ী এবং মিষ্টভাষী। বয়স মোটে তিরিশ।

স্যাট কোভারলি ভদ্রলোক মাটি খোঁড়া তেল বেচে পয়সা করেন নি। ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মাথা খাটাতে হয়েছে বিস্তর। ট্যাঙ্কারডনের মত বড়লোক না হলেও তিনি কম যান না। অথচ তাঁর জীবনের নীতি হল, দেদার টাকা হাতে এলে আর টাকা রোজগারের লোভ না করাই ভাল। শান্তিতে দিন কাটানোর পক্ষপাতী তিনি। দেখতে শুনতে সুপুরুষ। গান-বাজনা পেন্টিংযের কদর বোঝেন। বউটিও সেইরকম। সঙ্গীতের সমঝদার। নিজেও পিয়ানো বাজাতে পারেন ভাল। তাঁর বাড়ীতে চার বাজনদারের আবির্ভাব ঘটেছে বহুবার। তিন মেয়ের মধ্যে বড় মেয়েটির নাম ডায়না। খুব জোর বিশ বছর বয়স। রূপে গুণে অতুলনীয়। যেন একটা টাটকা ফুল!

চলন্ত দ্বীপের সুরূপ যুবকরা ডায়নার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ভাবত হাতে স্বর্গ পেলাম। দ্বীপের দশ হাজার বাসিন্দা কিন্তু মনে মনে জানত, ডায়নার সঙ্গে ওয়াল্টারের বিয়ে হলেই রাজযোটক মিল হত। কিন্তু সে গুড়ে বালি। কথাই নেই দুজনের মধ্যে। চোখাচোখি হলেই তো ঢি-ঢি পড়ে যাবে শহরে। দু'দুখানা খবরের কাগজ বানিয়ে বানিয়ে খবর ছাপিয়ে ফেলবে।

তাই দুজনেই দুজনকে দূর থেকে দেখে—কাছে আসতেও সাহস পায় না।

দিনকয়েক পরে একটা ঘটনা ঘটল। সেদিন রাত দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে চলন্ত দ্বীপ নিরক্ষবৃত্ত অতিক্রম করবে। এই রেখাই ভূগোলককে ঠিক দুভাগে ভাগ করে রেখেছে।

সুতরাং সকাল থেকেই উৎসব চলেছে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে, গানবাজনাও হয়েছে অনেক। মানমন্দিরের চত্বরে একটা বোতাম রয়েছে। বোতামের সঙ্গে ইলেকট্রিক তার জুড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কামান পর্যন্ত। ঠিক হয়েছে শহরের সব চাইতে প্রভাবশালী ব্যক্তি রাত ঠিক দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে বোতাম টিপে দেবেন। অমনি গুড়ুম করে কামান দাগা হয়ে যাবে দ্বীপের কিনারা থেকে।

এই বোতাম টেপা নিয়েই লাগল গণ্ডগোল। বচনে দড় অমন যে দুখোড় ক্যালিস্টার মুনবার, সে-ও ফয়সালা করতে পারেনি এই সমস্যার। বোতাম টেপার সময় ঘনিয়ে আসতেই জেম ট্যাঙ্কারডন আর ন্যাট কোভারলি দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। দুজনেই বোতামের দিকে হাত বাড়ালেন। দুজনেই দুজনকে চোখ রাঙালেন।

দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল বলে! কিন্তু ভগবান বাঁচালেন সে যাত্রা! -কামান গর্জন ভেসে এল দূর সমুদ্র থেকে।

ব্যাপার কী? বোতাম টেপার কথা মনে রইল না কারোরই। বন্দর

থেকে টেলিগ্রাম এসে গেল তক্ষুণি। দূরে একটা জাহাজ ডুবছে। সাহায্য চাইছে কামান দেগে। তৎক্ষণাৎ একটা লঞ্চ রওনা হল চলন্ত দ্বীপ থেকে। গোলমালের মধ্যে নিরক্ষরৃত্ত পেরিয়ে গেল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড। কামানের গোলা কামানের মধ্যেই রয়ে গেল, সম্মান বাঁচল দুই বড়লোকেরই।

ট্রাম বন্ধ। তাই কাতারে কাতারে লোক পায়ে হেঁটে রওনা হল বন্দরের দিকে!

চলন্ত দ্বীপের লঞ্চ ততক্ষণে দুর্গত জাহাজের মাঝিমাল্লাদের উদ্ধার করে এনেছে। জাহাজটা অবিশ্যি তারপরেই তলিয়ে গিয়েছে।

স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে একটা রহস্যজনক মালয় নৌকোকে দেখা গিয়েছিল চলন্ত দ্বীপের আশেপাশে টহল দিতে। দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরেও পেছন ছাড়েনি নৌকোটা। এইমাত্র তা ডুবে গেল সমুদ্রে—মাঝিমাল্লারা উঠে এল চলন্ত দ্বীপে।

১০ ॥ সোসাইটি আয়ল্যাণ্ডে তিন সপ্তাহ

দুই ধনকুবেরের কোঁদলের মধ্যে মোটে নাক গলালো না বাজনদাররা। ক্যাসিনোয় বাজনা বাজানোর পর ঘুরে ঘুরে দেখত স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের দর্শনীয় জায়গাগুলো। এইভাবেই ভাব জমিয়ে নিলে মানমন্দিরের কমোডোর ইথেলসিমকোর সঙ্গে, সৈন্যবাহিনীর কর্নেল স্টুবার্টের সঙ্গে। দহরম-মহরম রইল ট্যাঙ্কারডন আর কোভারলি ফ্যামিলির সঙ্গে। গভর্ণরের বাড়ী থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের ভালবাসা কেড়ে নিলে বাজনদাররা।

অন্তর্দ্বন্দ্ব কিন্তু কমল না। বরং বেড়েই চলল। এমন কথাও শোনা গেল যে লারবোর্ডের বড়লোকরা গভর্ণরের কাছে আরজি জানিয়েছে একটা কারখানা পত্তনের জন্যে। একলক্ষ শুওর এনে জবাই করে নুন দিয়ে জিইয়ে রাখা হবে সেখানে। তারপর চড়া দামে বিক্রি করা হবে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে।

মন কষাকষি নিয়ে তন্ময় হয়ে না থেকে জাহাজডুবির ক্যাপ্টেন স্যারোল আর তার মালয় স্যাঙাতদের ওপর নজর রাখলে কিন্তু প্রত্যেকের মনেই একটা খটকা লাগত। ওদের একমাত্র কাজ ছিল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের রাস্তাঘাট, বন্দর, কামান, বিদ্যুৎ কারখানা, জলের কারখানা, মান মন্দির, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা। অষ্টপ্রহর মনে মনে যেন ওরা কি একটা ফন্দী আঁটছে। যা কিছু দেখছে, মনের খাতায় তার নক্সা এঁকে নিচ্ছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঢিমেতালা গতিতে ভেসে চলেছে চলন্ত দ্বীপ। দশলক্ষ ঘোড়ায় টানা গাড়ী যেন! ডোববার ভয় নেই, ঈশান কোণের কালো মেঘ দেখেও আঁৎকে ওঠার কারণ নেই!

চিঠিপত্র লেখালেখি চলছে ফ্রান্সের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। সবাই জেনে গেছে, বাজনদাররা এখন চলন্ত দ্বীপের অতিথি। আমেরিকায় প্রথমে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছিল বাজনদাররা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায়। খবর জানাজানির পর সে উৎকণ্ঠারও অবসান ঘটেছে।

পোমোতু দ্বীপপুঞ্জের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময়ে কমোডোর ঠিক করলেন দ্বীপপুঞ্জের মাঝখান দিয়ে যাবেন। বিপজ্জনক ঝুঁকি সন্দেহ নেই। কেননা, এ দ্বীপপুঞ্জের মোট দ্বীপের সংখ্যা প্রায় সাতশ। চোরাপাথরে লেগে লোহার কাঠামো জখম হলেই সর্বনাশ।

কিন্তু এ-অঞ্চলের সমুদ্র কমোডোরের নখদর্পণে। তাই নিরাপদে চলন্ত দ্বীপকে চালিয়ে নিয়ে চললেন ক্ষুদে-ক্ষুদে দ্বীপের আশপাশ দিয়ে—ছিপছিপে সরু ক্যানো নৌকোর মত!

সাতাশে সেপ্টেম্বর অ্যানা বলে একটা দ্বীপের ধারে দাঁড়িয়ে গেল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড। অনেকেই নামল দ্বীপে ছুটোছুটি করতে। নামল চার বাজনদারও। শুয়ে পড়ল ঘাস জমিতে। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠল তড়াক করে ঘাসের মধ্যে সর সর শব্দ শুনে।

মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল চলমান জীবটাকে দেখে। একটা অতিকায় কাঁকড়া। ওদের চোখের সামনেই শুকনো ডাবের ছোবড়া ছাড়িয়ে দাড়া দিয়ে ঠুকে ফুটো করল নারকেলের গায়ে। তারপর অবলীলাক্রমে শাঁস খেতে লাগল ভেতরের।

পিঙ্কিনাট তাই দেখে শিউরে উঠে বললে—"ওটা যদি নারকেল না হয়ে মানুষের মাথা হত? কেড়ে নেব নারকেলটা?"

ইভারনেস বললে—"মিছে ভাবছ। ওরা নারকেল খেতেই জন্মেছে—তোমার মাথা খেতে নয়।"

শুনে কাঁকড়াটা যেন বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করল পিঙ্কিনাটের পানে এবং কৃতজ্ঞ চাহনি বুলিয়ে নিলে ইভারনেসের ওপর।

১১ ॥ তাহিতি

তাহিতি-দ্বীপপুঞ্জে গতবারও দাঁড়িয়েছিল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। বহু বড়লোক নেমে গেল পাপেতি দ্বীপে। ট্যাঙ্কারডন

আর কোভারলি ফ্যামিলিও বাদ গেলেন না। এ-দ্বীপে দুই পরিবারেরই বাড়ী আছে। দিনকয়েক সেখানেই থাকবেন।

মিষ্টি-মধুর ঘটনাটা ঘটল এই দ্বীপেই।

পয়েন্ট ভেনাস দেখতে যাচ্ছিল চার বাজনদার। পাহাড়ে ওঠার জন্যে তৈরী হয়েই যাচ্ছিল। কোভার্লি ভবনের কাছাকাছি আসতেই দেখা হয়ে গেল ওয়াল্টার ট্যাঙ্কারডনের সঙ্গে। ঘোড়ায় চড়ে ঘুরঘুর করছে বাড়ীর কাছেই।

মুখোমুখি হতেই কুশল জিজ্ঞাসার পর ওয়াল্টার নেমন্তন্ন করল বাজনদারদের। সন্ধ্যে নাগাদ ট্যাঙ্কারডন ভবনে আসা সম্ভব হবে কী?

ফ্রাসকোলিন বললে—"আজ তো পারব না, মিঃ ট্যাঙ্কারডন। মিসেস কোভার্লির বাড়ীতে গানবাজনা আছে।"

শুনেই মুখ আমসি হয়ে গেল ওয়াল্টারের। বাজনদারের সঙ্গে যেতে না পাবার জন্যেই যে মুখটা শুকিয়ে গেল, সবাই তা বুঝল। তাই সেই সন্ধ্যাতেই পিঞ্চিনাট ইচ্ছে করেই কথাটা পাড়ল কোভার্লিদের বৈঠকখানায়।

আসর তখন সবগরম। মিসেস কোভার্লি পিয়ানো বাজিয়েছেন। ডায়না গলা ছেড়ে গান গেয়েছে—ইভাবনেসও গলা মিলিয়েছে। তারপরেই নিরীহ গলায় পিঞ্চিনাট বললে—"আজ সকালে দেখলাম ওয়াল্টারকে এ-বাড়ীর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে।"

শুনেই চাপা হাসি খেলে গেল ডায়নার ঠোঁটের কোণে এবং সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে উঠল আরও মিষ্টি গলায়। দেখে, ভুরু কুঁচকোলেন তার মা এবং মুখ গম্ভীর হল বাবার।

পনেরোই নভেম্বর আরও মজার ঘটনা ঘটল চলন্ত দ্বীপের ওপরেই।

সেদিন তাহিতির রাজা-রাণীকে সম্মান জানানোর জন্যে টাউন হল আর পার্কে নাচগান খানাপিনার আয়োজন করল ক্যালিস্টাস মুনবার। খাওয়া দাওয়ার পর নাচ, তারপর বাজী পোড়ানো—এই হল প্রোগ্রাম।

খাওয়ার টেবিলে দেখা গেল, ডায়নার ঠিক উল্টোদিকে বসেছে ওয়াল্টার! দুজনেরই মুখ গম্ভীর। কিন্তু চোখে হাসি! ব্যাপার কী? টেবিল সাজানোর ভার ছিল তো মুনবারের ওপর! এ কাণ্ড কি তারই?

খাওয়ার পর শুরু হল নাচ। তাহিতি নাচের সঙ্গে মার্কিনী নাচ। এখানেও দেখা গেল সেই আশ্চর্য ব্যাপার! জোড়া নাচের আসরে হাতে হাত দিয়ে নাচছে ওয়াল্টার আর ডায়না! ক্যালিস্টার মুনবার কি ম্যাজিক জানে? চিরশত্রু দুই ফ্যামিলিকে এত কাছে এনে ফেলার মন্ত্রগুপ্তি সে ছাড়া আর জানবে কে?

দুদিন পর স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড ফের রওনা হল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। কেউ কিন্তু চেয়েও দেখল না রাগে থমথমে হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেন স্যারোলের মুখ। আরক্ত চোখে মালয় স্যাঙাতদের কি যেন দেখাচ্ছে পশ্চিম দিকে।

নিউ হেব্রাইড দ্বীপটা রয়েছে সেইদিকেই—১২০০ লীগ পশ্চিমে।

১২॥ কুক দ্বীপপুঞ্জ

কালিস্টার মুনবার অতি ঘোড়েল লোক! ডায়না আর ওয়াল্টারকে কাছাকাছি এনে দিয়েও নিজে সবে রইল দূরে। সুতরাং কেউ তাকে সন্দেহও করতে পারল না। এদিকে নিজেদের অজান্তেই চিরশত্রু দুটি পরিবার তিল তিল করে এগিয়ে আসতে লাগল পরস্পরের কাছে বড় ছেলে আর বড় মেয়ের দৌলতে।

এই ঘটনার পর থেকেই কিন্তু ডায়না আর মিসেস কোভার্লির সঙ্গে দেখা হলেই মাথানীচু করে অভিবাদন জানাতো ওয়াল্টার। মা-মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন না। পাল্টা অভিবাদন জানাতেন।

দুই ফ্যামিলির বৈঠকখানাতেও হাওয়া পাল্টে গেল যেন। ট্যাঙ্কারডনের মুণ্ডপাত শুরু হলেই মুখ শুকিয়ে যেত ডায়নার। আর কোভার্লির পিণ্ডি চটকানো শুরু হলেই উঠে চলে যেত ওয়াল্টার।

কর্তারা চোখে অন্ধ হলেও গিন্নীরা কখনো অন্ধ থাকেন না ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স হলে। তাই দুতরফেই চাপ পড়ল আইবুড়ো ছেলে আর আইবুড়ি মেয়ের ওপর। মিলিয়ার্ড শহরে বড়লোক মেয়ের তো অভাব নেই। দেখতে শুনতেও তারা ডানাকাটা পরী বললেও চলে। জেম ট্যাঙ্কারডনের পালটি ঘর বলতে যা বোঝায়, সেরকম ফ্যামিলির কি অভাব আছে লাখোপতিদের এই শহরে? ওয়াল্টার তাদের মধ্যে থেকেই কাউকে বেছে নিতে পারে। তাতেও যদি মন না ওঠে তো ইউরোপ আমেরিকা সফরে বেরোলেই তো হয়। পড়ন্ত রাজ পরিবার থেকে কোনো রাজকুমারীকে বিয়ে করে আনলেও আপত্তি নেই জেম ট্যাঙ্কারডনের।

কিন্তু বাপের জেদ যতই বাড়ুক না কেন, ছেলের জেদও কম নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথাই সে শুনিয়ে দিলে বাবাকে—ওয়াল্টার ট্যাঙ্কারডন বিয়ে করবে না!

তখন তার মা একদিন আড়ালে ডেকে নিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন ওয়াল্টারকে—"হ্যাঁরে, সত্যি করে বল দিকি কাউকে পছন্দ করে বসে আছিস কিনা?"

সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলল ওয়াল্টার। সত্যিই বিশেষ একটি মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে তার।

ট্যাঙ্কারডন-গৃহিণী যদি জিজ্ঞেস করতেন—"মেয়েটার নাম বল তো?" ওয়াল্টারও তখুনি বলত—"ডায়না।"

কিন্তু ভদ্রমহিলা সব বুঝেই আর কথা বাড়ালেন না।

ঠিক এই রকম পীড়াপীড়ি চলছিল কোভালি ফ্যামিলিতে। বাবার সহস্র অনুরোধ উপরোধ মৃদু হেসে সরিয়ে রাখছিল ডায়না। মিলিয়ার্ড শহরে বড়লোকের ছেলের অভাব নেই। তাকে বিয়ে করার জন্যেই অনেকেই পাগল। ন্যাট কোভালি তাদেরই মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিতে বললেন। এমন কি ইউরোপের কোনো পড়ন্ত রাজবাড়ীর বউ হতেও বললেন। ডায়না শুধু বলল—"মিলিয়ার্ড শহরে সে বেশ সুখেই আছে। কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই।"

ডায়নার মা ওয়াল্টারের মা-য়ের মত দুম করে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না বিশেষ কাউকে বিয়ে করার জন্যে গোঁ ধরেছে কিনা ডায়না। জিজ্ঞেস করলেও জবাব পেতেন কিনা সন্দেহ। ডায়না সেই জাতের মেয়ে যাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না।

এইভাবেই গড়িয়ে যেতে লাগল দিন। নতুন নতুন দ্বীপ দেখে হু-হু করে সময় কেটে যেতে লাগল চার বাজনদারের। পয়সা কড়ির ভাবনাও নেই। যথা সময়ে আগাম টাকা দিয়ে যাচ্ছে ক্যালিস্টার মুনবার। সে-টাকা দেশের ব্যাঙ্কেও জমা দেওয়া হয়ে গেছে। তার মানে, দেশে ফেরার পর দেখা যাবে কেউই আর গরীব নয়—বড়লোক বনে গেছে।

এই সময়ে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড কোম্পানী আলোচনায় বসল চলন্ত দ্বীপের ভাবী প্রোগ্রাম নিয়ে। অন্য রাস্তায় যাবে না আগেকার প্রোগ্রাম মতই পুরোনো পথে যাবে?

আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিদারুণ উৎকণ্ঠায় রইল ক্যাপ্টেন স্যারোল। কেন না, পুরোনো পথে গেলে মাস কয়েকের মধ্যেই নিউ হেব্রাইড দ্বীপে পৌঁছোনোর কথা। ডোবা জাহাজ থেকে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে ওঠার পর তাকে কথা দেওয়া হয়েছিল নিউ হেব্রাইড দ্বীপে সবাইকে নামিয়ে দেওয়া হবে। এখন যদি অন্য পথে যায় চলন্ত দ্বীপ, নিউ হেব্রাইড দ্বীপ পথে পড়ছে না।

তাই এত উৎকণ্ঠা ক্যাপ্টেন স্যারোলের। খুবই সন্দেহজনক সন্দেহ নেই! বিনা খরচায় স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড চেপে ঘুরে বেড়িয়েও শান্তি নেই লোকটার। নিউ হেব্রাইড দ্বীপে নামবার জন্যে এত ছটফটানি কেন?

তার এই উদ্বেগ কেউ দেখেও দেখল না। আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, পুরোনো পথেই যাবে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড এবং নিউ হেব্রাইড ছুঁয়ে যাবে যথা সময়ে।

শুনে আশ্বস্ত হল ক্যাপ্টেন স্যাবোল।

১৩॥ চক্রান্ত

কে এই ক্যাপ্টেন স্যাবোল?

ক্যাপ্টেন স্যাবোল অতি দুর্ধর্ষ মালয় বোম্বেটেদের সর্দার। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অঞ্চলের জল রক্তরাঙা করে ছেড়েছে একাধিকবার। বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে হানা দিয়েছে। জাহাজ লুঠ করেছে, মানুষ খুন করেছে পোকা মাকড়ের মত।

ক্যাপ্টেন স্যাবোল বিপাকে পড়ে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে আসেনি—প্ল্যানমাফিক এসেছে। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে তার দুমাস্তলের কেচ-জাহাজ নিছক কৌতূহল নিয়ে চলন্ত দ্বীপের চারধারে টহল দেয়নি—উদ্দেশ্য নিয়ে টহল দিয়েছিল। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের পুলিশী ব্যবস্থা কতখানি নিশ্ছিদ্র, তা সন্ধানী চোখে দেখছিল। তারপর পেছন পেছন এসেছিল দূর সমুদ্রে। ট্যাঙ্কারডন আর কোভার্লি যখন কামান দাগার বোতাম টেপা দিয়ে মারমুখো, ঠিক তখনি চালাকি করে নিজেদের জাহাজ নিজেরাই ডুবিয়ে দিচ্ছিল। কামান দেগে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লঞ্চ এসে ওদের তুলে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেচ জাহাজ কায়দা করে ভাসিয়ে রেখেছিল—লঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ও ডুবে যাওয়া। কারো মনে তিলমাত্র সন্দেহও দেখা যায় নি। চোখের সামনে জাহাজ ডুবে গেলে নিরাশ্রয় মানুষগুলোর ওপর সন্দেহ আসবে কি করে?

সুতরাং ঘোর চক্রান্তের প্রথম পর্ব সাঙ্গ হল। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে ঢুকে বসল ক্যাপ্টেন স্যাবোল—যা আর কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

চক্রান্তের দ্বিতীয় পর্ব হল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের ওপরেই বসে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর হদিশ জেনে নেওয়া। গুপ্তচরের কাজ করা। এক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন স্যাবোল নিজেই ষড়যন্ত্রকারী, গুপ্তচরদের পাণ্ডা এবং ধ্বংসকাণ্ডের নায়ক।

চক্রান্তের শেষ পর্বে আসছে ধ্বংস লীলা। নিউ হেব্রাইড দ্বীপপুঞ্জে এলেই আশপাশের দ্বীপ থেকে কাতারে কাতারে জংলী ঝাঁপিয়ে পড়বে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে। অবাধে চলবে খুন, জখম, লুঠতরাজ। রক্তের স্রোত বয়ে যাবে

চলন্ত দ্বীপে। ভেঙে চুরে ডুবিয়ে দেওয়া হবে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড। লুঠ হয়ে যাবে দ্বীপের ধনরত্ন। ভাসমান কুবের ভাণ্ডার ডাকাতির এতবড় পরিকল্পনা এর আগে কারো মাথায় আসেনি। নৃশংস পরিকল্পনা সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্যাপ্টেন স্যারোলের মত নর পিশাচ ছাড়া এতবড় কাজে হাত দেবে কে?

চার মাস ধরে চলন্ত দ্বীপে বসে এই মতলবই আঁটছে ক্যাপ্টেন স্যারোল!

১৪ ॥ • মেলকার্লির রাজা চাকরী নিলেন

ছাব্বিশে ডিসেম্বর একটা দারুণ খবর ছাপা হল চলন্ত দ্বীপের খবরের কাগজে। মেলকার্লির রাজা নাকি টাউন হলে গিয়ে গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করেছেন।

মেলকার্লির রাজা টাউন হলে? সেকী কাণ্ড! যে মানুষটা বাড়ী ছেড়ে বেরোন না, তাহিতি রাজা-রাণীর সম্বর্ধনা উৎসবের নেমন্তন্নও যিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি যেচে গভর্ণরের কাছে গেলেন কেন?

নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়ল শহরে। রঙচঙে গল্প নিয়ে মশগুল হয়ে রইল ছেলে বুড়ো মেয়েরা। তারপর শোনা গেল আসল খবরটা।

মেলকার্লির রাজা চাকরী চেয়েছিলেন গভর্ণরের কাছে। আবেদন মঞ্জুর করেছেন গভর্ণর। মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদ হতে চেয়েছিলেন—তাই হয়েছেন।

শুনে হৈ-হৈ পড়ে গেল শহরময়। শুনে খুশী হল সবাই। মেলকার্লির রাজা নির্বিরোধী মানুষ। অত্যন্ত সদাশয়, নির্লোভ, উদার এবং মহৎ। তারকা জগৎ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বড় কম নয়। তিনি ছাড়া এ-পদের যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউ আছেন কি?

মেলকার্লির রাজার অতীত অত্যন্ত গৌরবময়। ইউরোপের একটা ছোটখাট রাজ্যের রাজা ছিলেন তিনি। ছেলেপুলে হয়নি।

ভদ্রলোক অত্যন্ত দূরদর্শী। রাজা না হয়ে দার্শনিক হলেই তাঁকে বেশী মানাত। তাই অনেক আগেই বুঝেছিলেন, যুগ পালটাচ্ছে। রাজাদের যুগ যাচ্ছে, প্রজাদের যুগ আসছে। তাই তিনি তৈরী হয়েছিলেন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাবার জন্যে।

সে-দিন যখন এল, তাই একফোঁটাও রক্ত ঝরল না দেশে। প্রজাদের হাতে সর্বস্ব তুলে দিয়ে প্রজাদের সঙ্গে মিশে গেলেন রাজা এবং রাণী।

দেশে থাকলেও পারতেন। কিন্তু রাণীর শরীর খারাপ। অথচ দেশ

দেশান্তরে ঘোরার বল নেই শরীরে। তাই তিন বছর আগে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড তৈরী হচ্ছে শুনেই একটা বাড়ী ভাড়া নিলেন।

ভাড়া অবশ্য কম নয়। বছরে পঞ্চাশ হাজার ডলার। দু'এক লাখ ডলার বার্ষিক আয় নিয়ে এ দ্বীপে থাকতে গেলে কষ্ট হবে বই কি। কিন্তু রাজা সে কষ্ট গায়ে মাখলেন না। রাণীর শরীর ভাল রয়েছে, এইটাই যথেষ্ট। জীবনে যাঁদের চাহিদা নেই, অর্থের অভাবে তাঁরা কাতর হন না।

মন ভরিয়ে রাখার জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতেন রাজা। প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল নক্ষত্রলোক সম্পর্কে। তাই চাকরী নিলেন মান মন্দিরে। শুনে আনন্দ পেল শহরবাসীরা। তাঁর মত মানুষ চোখে দুরবীন এঁটে যদি নতুন কোনো নক্ষত্র আবিষ্কার করে ফেলেন, সে গৌরবের ভাগ পাবে দ্বীপের সকলেই।

এই নিয়েই কথা বলছিল চার বাজনদার। রাজসিংহাসন থেকে নেমে এসে মাস্টারি শুরু করলেন রাজা, একি কম কথা? শুধু তাই নয়, তিনি সংগীত রসিকও বটে। ক্যাসিনোর দরজায় দাঁড়িয়ে বাজনা শুনেছিলেন—পয়সার অভাবে টিকিট কাটতে পারেন নি।

মাথায় পোকা নড়লে চার বাজনদার অন্য মানুষ হয়ে যায়। সেদিনও হঠাৎ ঝোঁক চাপল, রাজা-রাণীর বাড়ী গিয়ে বাজনা শুনিয়ে আসতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বাজনা কাঁধে বেরিয়ে পড়ল বাজনদাররা। রাজার বাড়ী গিয়ে দেখল, বড়লোকির চিহ্ন নেই কোথাও। অতি সাধারণ একটা বাড়ী। ট্যাঙ্কারডন আর কোভার্লির প্রাসাদের তুলনায় কিছুই নয়।

বসবার ঘরে বাজনাগুলো রেখে রাজা-রাণীর সঙ্গে দেখা করল বাজনদার চারজন। রাণী বসেছিলেন জানলার ধারে। গায়ে একটা ঘোর রঙের মামুলী চাদর। প্রশান্তমুখ, স্নিগ্ধ চোখ। রাজার চেহারা মোটেই রাজার মত নয়—বরং ঋষির মত। দুধের মত সাদা দাড়ি লুটোচ্ছে বুকের ওপর। কিন্তু মানুষটা যে সাধারণ নয়, তা বোঝা যায় শুধু চোখ দেখলে। অনির্বাণ দ্বীপশিখার মত প্রজ্ঞার প্রভা জ্বল জ্বল করছে সেখানে।

অমায়িক হেসে বাজনদারদের অভ্যর্থনা জানালেন রাজা। কথায় কথায় বললেন—"চেম্বার মিউজিক খুব সূক্ষ্ম বাজনা। কান ঝালাপালা করার বাজনা নয়। এ বাজনা হাটে বসে উপভোগ করা যায় না।"

ফিকে হেসে রাণী বললেন—"কথাটা সত্যি। যে পরিবেশে আপনাদের বাজনা আরো ভাল লাগে, সে পরিবেশ আপনারা পাচ্ছেন না।"

কথাটা লুফে নিয়ে ফ্রাসকোলিন বললে—"সেই জন্যেই তো এসেছি আমরা। ঘরোয়া পরিবেশেই চেম্বার মিউজিক জমে বেশী।"

ইভারনেস বললে—"আপনি হুকুম করলেই কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাজিয়ে যাই।"

"বলছেন কী?" রাজা তো অবাক।

"ঐ মতলবেই তো এসেছি আমরা।" বলেই তৎক্ষণাৎ বাজনাগুলো আনিয়ে নিল বাজনদাররা। শুরু হল সংগীতের স্বর্গ রচনা।

রাত এগারোটার সময়ে ভাঙল আসর।

রাজা বললেন—"আজ আর না। মান মন্দিরে যেতে হবে এখুনি। জানেন তো আমি এখন থেকে তারাদের ইন্সপেক্টর?"

১৫॥ বৃটিশ ষণ্ডামি

বড়দিনের আনন্দ ভালভাবেই জমল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে।

তিরিশে ডিসেম্বরের রাত থেকে শুরু হল নতুন উপদ্রব। আকাশের কোন থেকে ভেসে এল গুর গুর শব্দ। যেন কামান গর্জন হচ্ছে ঘন ঘন।

রাত দুটো নাগাদ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। অনেক দূরে কোথায় যেন বোমা ফাটছে, কামান গজরাচ্ছে।

সারাদিন অব্যাহত রইল কামান নির্ঘোষ। মানমন্দিরে উঠে দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করে এলেন কমোডোর সিমকো। কিন্তু গোলমেলে কিছু দেখতে পেলেন না।

রাতে ফের চমকে উঠল মিলিয়াড শহরবাসীরা। শুধু বিস্ফোরণ নয় বাতাসে লালচে কালো কুয়াশা ভেসে আসছে। খুব মিহি ধুলো পড়তে লাগল বৃষ্টির মত। কয়েক মিনিটের মধ্যে লালগুঁড়ো আর কালো ছাইতে ছেয়ে গেল শহরের রাস্তাঘাট বাড়ীর ছাদ।

মেলকার্লির রাজা রহস্য ফাঁস করে দিলেন। নিশ্চয় কোথাও অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। হাতে গরম এই ছাই উড়ে আসছে আগ্নেয়গিরির পেট থেকে। কথাটা যুক্তিপূর্ণ। টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জে এমন কাণ্ড প্রায় ঘটে। তুঙ্গুয়া আর ক্রাকাতোয়ার সর্বনাশা কাহিনী কে না জানে।

পরের দিন অব্যাহত রইল ভস্মবৃষ্টি। বিকেল নাগাদ চারদিক এত অন্ধকার হয়ে এল যে দশগজ দূরের মানুষকেও দেখা গেল না। রাত তিনটের সময়ে সীমাহীন অন্ধকারে অন্ধের মত ভেসে যেতে গিয়ে কোথায় যেন ধাক্কা লাগল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের।

সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ নিলেন গভর্ণর। শুনলেন, একটা বড় জাহাজ হঠাৎ

সামনে এসে পড়েছিল। শেষ মুহূর্তে দেখা যায় জাহাজটাকে। হুঁশিয়ার করাও হয়েছিল। কিন্তু ধাক্কা আটকানো যায় নি। তারপর থেকেই জাহাজটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ধাক্কাটা স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের পক্ষে কিছুই না—কিন্তু জাহাজটার পক্ষে মারাত্মক হতে পারে।

কিন্তু গেল কোথায় জাহাজটা?

সকাল হল। নববর্ষের প্রভাত। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। অনেক খোঁজা হল জাহাজটাকে। কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না। কোন দেশের জাহাজ, তাও জানা গেল না।

ব্যাপারটা গুরুতর। কিন্তু সুরাহা করা গেল না।

বিকেল নাগাদ দূর দিগন্তে দেখা গেল ধোঁয়ার রেখা। পুরোদমে একটা জাহাজ ছুটে আসছে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড লক্ষ্য করে।

দেখতে দেখতে কাছে এসে গেল জাহাজটা। দূর থেকেই চেনা গেল—বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ!

রাতটা বেশ উৎকণ্ঠায় কাটল। পরদিন সকাল বেলা একটা বোট এল যুদ্ধজাহাজ থেকে। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে পা দিয়েই জাহাজের ক্যাপ্টেন বললেন—"আমার নাম ক্যাপ্টেন টার্নার। গভর্ণরের সঙ্গে এখুনি দেখা করতে চাই।"

তক্ষুনি টাউন হলে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। গভর্ণর আসতেই একটি মাত্র বাক্য আউড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। বাক্যটায় মোট শব্দ সংখ্যা তিনশ। কমা অনেক আছে—দাড়ি একদম নেই। একটানা বলে থামলেন ক্যাপ্টেন এবং সব কথাই বলা হয়ে গেল ঐ একটি মাত্র বাক্যের মধ্যে।

সংক্ষেপে ভদ্রলোকের বক্তব্যটা এই:

কাল রাতে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড একটা বৃটিশ মাল জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। ডোববার আগে মাঝি-মাল্লারা বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজে উঠে এসেছে। মাল জাহাজে আলো ছিল, তবুও ধাক্কা মারা হয়েছে। সুতরাং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ষাট লক্ষ ডলার। না দিলে জোর করে আদায় করা হবে।

গভর্ণর তৎক্ষণাৎ হাঁকিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন টার্নারকে। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডও আলো জ্বালিয়ে চলছিল। কিন্তু আগ্নেয় ভস্মে চার দিক অন্ধকার থাকায় কেউ কাউকে দেখতে পায় নি। সুতরাং ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, আয়ল্যাণ্ড কোম্পানীর হুকুম না পেলে তিনি কিছু করতে পারবেন না।

ক্যাপ্টেন টার্নার কাঠের মত দাঁড়িয়ে বললেন—"চলন্ত দ্বীপের নির্দিষ্ট

ঠিকানা নেই। সমুদ্রে নানা রকম বিপদ ঘটাতে পারে এই দ্বীপ। বৃটিশরা চিরকাল এ-দ্বীপের বিরোধিতা করেছে। অন্ধকারে জাহাজে জাহাজে ঠোকাঠুকি ক্ষমা করা চলে না—এক্ষেত্রে ক্ষমা নেই। কেননা স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড জাহাজ নয়। সুতরাং অনর্থ বাধবে।"

"বাঁধুক" বললেন গভর্ণর। "টাকা দেব না।"

"এই কি আপনার শেষ কথা?"

"হ্যাঁ।"

ক্যাপ্টেন টার্নার কাঠের পুতুলের মত বিদায় নিলেন।

পৌনে দশটার সময়ে যুদ্ধ জাহাজ থেকে প্রথম কামান দাগা হল! দ্বিতীয় গোলাটা প্রচণ্ড শব্দে এসে ফাটল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের কাছেই। জল ছিটকে এল দ্বীপের ওপর।

আমেরিকান জাতটা দারুন প্র্যাকটিক্যাল। গোলাগুলি বিনিময় হলে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজের ক্ষতি হবে সামান্যই—কিন্তু ভীষণ ক্ষতি হবে চলন্ত দ্বীপের। তাছাড়া, এ-দ্বীপের আয়তন অনেকখানি। বেধড়ক গোলা ছুঁড়লেও প্রাণহানি ঘটবে বিস্তর।

সুতরাং এই প্রথম মতের মিল ঘটল জেম ট্যাঙ্কারডন আর ন্যাট কোভার্লির মধ্যে। পতাকা সংকেতে ডেকে পাঠানো হল ক্যাপ্টেন টার্নারকে। পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল ষণ্ডা জাহাজের কালো ধোঁয়া!

১৬॥ টোঙ্গা-ট্যাবো দ্বীপে নিষিদ্ধ বাজনা

নানান দ্বীপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নউই জানুয়ারী টোঙ্গা ট্যাবো দ্বীপে পৌঁছোলো স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড।

পরের দিন ক্যাপ্টেন স্যারোল ধর্না দিল গভর্ণরের কাছে। কাঁদুনি গেয়ে বললে, তার শ'খানেক মালয় বন্ধু আটক পড়েছে এই দ্বীপে। কোন রকমে গতর খাটিয়ে দিন আনছে দিন খাচ্ছে। ওদেরকে যদি স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে তুলে নেওয়া যায়, বড় উপকার হয়। পাঁচ ছ হপ্তা পরেই তো নিউ হেব্রাইডের এরোম্যানগো এসে যাচ্ছে। সবাই নামবে সেইখানেই। এতই যখন করলেন গভর্ণর, এ-টুকুও নিশ্চয় করবেন। তাঁর অনুমতি পেলেই দুর্গত মালয়রা উঠে আসবে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে।

অত তলিয়ে ভাবলেন না গভর্ণর। এত মাস একসঙ্গে চলেছে ক্যাপ্টেন

স্মারোল। আর মাসখানেক দেড়েকের জন্যে শ'খানেক মালয়কে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। সুতরাং আর্জি মঞ্জুর করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

কল্পনাও করতে পারলেন না কি ভুলটাই না করলেন। বাজে কথায় মন ভুলিয়ে দল ভারী করে নিল ক্যাপ্টেন স্মারোল। চক্রান্তের তৃতীয় পর্বের আর দেরী নেই নারকীয় হত্যালীলা আরম্ভ হয়ে যাবে এবোম্যানগো পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে।

টোঙ্গা-ট্যাবো দ্বীপে একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটল চেলো বাজনাদারের চেলো নিয়ে।

আধা-জংলীদের নাচের আসরে হাজির ছিল মিলিয়ার্ড শহরের অনেকেই। সে-নাচ সত্যিই দেখবার মত। প্রথমে বসে-বসে বিচিত্র মুখভঙ্গী করে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে প্রচণ্ড অঙ্গভঙ্গী দেখিয়ে। উদ্দাম সেই নাচের ছন্দে চার বাজনদারও নেচে উঠল মনে মনে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাসিনো থেকে আনানো হল বাজনা চারটে। আরম্ভ হল পাগল করা যন্ত্র সংগীত।

কুচুটে বুদ্ধিটা পিঙ্কিনাটের। আধা-জংলীদের বাজনার নেশায় মাতাল করিয়ে উদ্দাম নাচ নাচিয়ে মজা দেখাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। বিনা বাজনাতেই যারা এমনি নাচে, বাজনা বাজলে না জানি তারা কি করবে।

হলও তাই। চেলোর গমগমে বাজনার সঙ্গে বেহালা-ভায়োলার সঙ্গত মিশতেই সত্যি-সত্যিই যেন পায়ে পাখা লাগল জংলীদের। সেকী নাচ! আনন্দের চোটে আরম্ভ হয়ে গেল নাকে বাঁশি, হাতে তালি, আর ঢাকের বাদ্যি।

ভয়ংকর সেই তাণ্ডব-নৃত্য কখন কিভাবে যে শেষ হত ভগবান জানেন। কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল।

একজন তালঢ্যাঙা বলিষ্ঠ জংলী তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। চেলো-র গমগমে আওয়াজ শুনে পিলে পর্যন্ত চমকে গিয়েছিল তার। ছুটে এসে চেলো কেড়ে নিয়ে গলা ফাটিয়ে বললে –"ট্যাবু! ট্যাবু!" বলেই লোকজনের মাথা টপকে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল জঙ্গলের দিকে।

ট্যাবু! পলিনেশিয়ানদের ভাষায় যার মানে, পবিত্র বস্তু। সর্বসমক্ষে ব্যবহার নিষিদ্ধ!

কিন্তু জর্ন ট্যাবু-ক্যাবুর ধার ধারে না। তার প্রাণ প্রিয় চেলো চোখের সামনে দিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে, তারপরেও সে বসে থাকে কি করে? লাফ দিয়ে সে-ও ছুটল চেলো-চোরের পেছনে। কিন্তু পারবে কেন আধা-জংলীর সঙ্গে? দেখতে দেখতে জঙ্গলে উধাও হয়ে গেলে চেলো-চোর।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে এল জর্ন। সটান গভর্ণরের কাছে গিয়ে বললে—এখুনি যুদ্ধ করা হোক টোঙ্গাদের সঙ্গে। চেলোর চাইতেও তুচ্ছ জিনিসের জন্যে যুদ্ধ হয়ে গেছে ইতিহাসে। এখনি-বা হবে না কেন?

যাই হোক, জংলীদেরও শাসনকর্তা আছে। দ্বীপের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনল চেলো। কিন্তু 'ট্যাবু' ভাঙবার জন্যে কিছু আচার অনুষ্ঠান করতে হল। বেশী কিছু না। একপাল শুওরের গলা কেটে রান্না করা হল গরম পাথরভর্তি গর্তের মধ্যে। আলু আর সব্জী দেওয়া হল মাংসের মধ্যে। পেট ভরে খেয়ে 'ট্যাবু' তুলে নিল জংলীরা।

জর্ন তাতে সন্তুষ্ট হল না। চেলোর তারগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিল। নতুন করে তার বেঁধে বাজিয়ে দেখে নিল, আচার অনুষ্ঠানের মন্ত্রবলে বাজনা খারাপ হয়ে গিয়েছে কিনা।

১৭॥ চিড়িয়াখানা

স্ট্যানডার্ড আইল্যাণ্ড এবার চলল ফিজি দ্বীপপুঞ্জের দিকে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। মাত্র দুশ লীগ যেতে কদ্দিনই বা আর লাগবে।

ক্যাপ্টেন স্যাবোল তার একশ জন স্যাঙাৎকে উদয়াস্ত খাটাচ্ছে চলন্ত দ্বীপের আবাদী জমিতে। টোঙ্গা ট্যাবো দ্বীপেও সারা হাড়ভাঙা খেটেছে—এখানেও খাটছে। টোঙ্গাদের মত এদের গড়নপেটন তেমন মজবুত না হলেও খাটতে পারে খুবই। বয়স বিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। মালয়রা কালো হয়—এদের গায়ের রঙ আরও একপোঁচ বেশী কালো। সারাদিন খেটেখুটে চলন্ত দ্বীপের দুদিকের দুটো বন্দরে গিয়ে রাত কাটায়। ওদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে ঐখানেই। মুখ বুঁজে খাটে, খায়, ঘুমোয়। সুতরাং কেউই অখুশী নয় ওদের ওপর। গির্জের পুরুৎরা অবশ্য এই ফাঁকে একশ জনকেই খৃষ্টান করবার তালে ছিলেন, গভর্ণর রাজী হন নি।

গড্ডালিকা প্রবাহে দিন কাটছে স্ট্যানডার্ড আইল্যাণ্ডের লোকজনের। ভুলেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি, খাইয়ে দাইয়ে যাদের দেশে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, গোপনে ছুরী শানাচ্ছে তারা দ্বীপবাসীদের গলা কাটবার জন্যে। প্রশান্ত মহাসাগরের ভয়ংকর হার্মাদদের বংশধর তারা। মানুষের রক্তে না আঁচালে ঘুমোতে পারে না।

তাই গানবাজনা ফুর্তি নিয়ে বিভোর হয়ে রইল দ্বীপের বড়লোকরা।

পনেরোই জানুয়ারী বিকেলের দিকে একটা বড় জাহাজ দেখা গেল দক্ষিণ-

পুবদিকে। জাহাজে পতাকা নেই। কোন দেশের জাহাজ চেনা গেল না। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে নামবারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সন্ধ্যে নামতেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল জাহাজটা।

রাত এগারোটা থেকে ঝড়ের ঘনঘটা স্পষ্ট হল আকাশে-বাতাসে। তারপর আলোটুকু পর্যন্ত আটকে গেল কালো মেঘের ঢাকনিতে।

রাত তিনটে নাগাদ অনেকগুলো চাপা গজরানি শোনা গেল দ্বীপের চারদিকে।

পরেরদিন সারা শহর শিউরে উঠল অদ্ভুত একটা খবর শুনে। রাতের আঁধারে কারা যেন পঞ্চাশটা ভেড়া, বারোটা গরু, কুড়িটা ঘোড়া আর বিস্তর হাঁস-মুরগীকে বধ করেছে এবং আধ-খাওয়া অবস্থায় ফেলে গেছে।

লোমখাড়া হয়ে উঠল শহরবাসীদের লোমহর্ষক খবরটা শুনে। একী কাণ্ড! মিলিয়ার্ড সিটিতে হিংস্র জন্তু তো নেই! রাতের আঁধারে এত শ্বাপদের আবির্ভাব ঘটল কেমন করে? জংলীদের দ্বীপে দাঁড়িয়ে থাকবার সময়ে দ্বীপ থেকে সাঁতরে এসেছে কি?

সকাল সাতটার সময়ে দুজন মহিলা পবনদেবকেও হার মানিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল টাউন হলে। দুটো কুমীর তাড়া করেছিল তাদের! নারী-মাংস নাগাল ছাড়া হতে কুমীররা অবশ্য ফিরে গেছে সার্পেণ্টাইন নদীতে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আরো খবর এল। পালে পালে বাঘ, সিংহ, চিতা ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে-ঘাটে। কামান-সারির কাছে দুটো বিপুলকায় বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভেড়ার পালের ওপর। লোকজন সব ছুটে পালাচ্ছে। দোকানপসার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দরজা জানলায় ছিটকিনি পড়ছে। রাস্তায় টহল দিচ্ছে কেবল মিলিটারী—কর্ণেল স্টুয়ার্টের তত্ত্বাবধানে।

টেলিগ্রাম মারফৎ খবর দেওয়া নেওয়া হচ্ছে কামানঘাঁটি, বন্দর আর টাউনহলের মধ্যে। বাঘ, সিংহ, চিতায় নাকি ছেয়ে গেছে গোটা দ্বীপটা। সব মিলিয়ে শ'খানেক তো হবেই।

একী রহস্য! এত জানোয়ার এল কোত্থেকে? গোটা একটা চিড়িয়াখানার খাঁচাঘর যেন খুলে দেওয়া হয়েছে দ্বীপের ওপর! ভারী আশ্চয তো!

সকাল আটটায় কাউন্সিল মিটিং বসল টাউন হলে। গভর্ণর বললেন, পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। জন্তুগুলোকে ঝটপট সাবাড় করতে হবে। জেম ট্যাঙ্কারডন, ন্যাট কোভার্লি এবং অন্যান্য বড়লোকরা তক্ষুণি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইলেন। মিটিং ভাঙবার আগে একজন ফরাসী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে ফাঁস করলেন আসল রহস্যটা।

গতকাল বিকেলের দিকে একটা নামহীন পতাকাহীন জাহাজকে দেখা গিয়েছিল। রাতের আঁধারে ঝড়ের সুযোগ নিয়ে নিশ্চয় স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে ভিড়েছিল জাহাজটা। জন্তুগুলোকে দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে চম্পট দিয়েছে ভোর হওয়ার আগেই।

কিন্তু এত খরচপত্র করে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে শ্বাপদ সংকুল করার সখ চেপেছে যার মাথায়, কি নাম তার?

তার নাম জনবুল! জাতে ইংরেজ। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের চিরশত্রু। গোড়া থেকেই বিরোধিতা করে এসেছে লোকটা। কিন্তু স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড তবুও জলে ভেসেছে। তাই গায়ের জ্বালায় জাহাজভর্তি জন্তু এনে ছেড়ে দিয়েছে যাতে লোকজন দ্বীপ ছেড়ে পালায়।

শুনেই ধিক-ধিক রব উঠল চারিদিকে। অনুমানটা মোটেই অমূলক নয়। ইংরেজরা এ-রকম নষ্টামিতে খুবই পটু। সেই ফরাসী ভদ্রলোক-ই ইতিহাস থেকে নজির তুলে দেখিয়ে দিলেন। ফ্রান্সের হাতে অ্যান্‌টিল্‌স্‌ তুলে দেওয়ার আগে ইংরেজরা অ্যানটিলস-য়ে রাশিরাশি সাপ ছেড়ে দিয়েছিল। সেই সাপ ঝাড়েবংশে এত বেড়ে গেছে যে ফরাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সেখানে। অথচ সবাই জানে অ্যানটিলস-য়ে কস্মিনকালেও সাপ থাকত না।

পরের দিন দ্বীপের খবরের কাগজ দুটোয় পাপিষ্ঠ জনবুলের কুকীর্তি ছাপা হল ফলাও করে। ইংরেজদের চৌদ্দপুরুষ তুলে গালিগালাজ শুরু হয়ে গেল ঘরে ঘরে। প্রত্যেকেই কায়মনোবাক্যে চাইলে, ইংরেজ জাতটা চটপট মুছে যাক পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে।

১৮ ॥ শিকার

সকাল থেকে শুরু হল মৃগয়া পর্ব।

প্রথমেই গুলি চলল সার্পেণ্টাইন নদীর কুমীর দুটোর ওপর! ক্যাপ্টেন স্যারোল চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে নেমে পড়ল কুমীর নিধনে! শেষ পর্যন্ত কিন্তু দুটোর জায়গায় বারোটা কুমীরকে কিলবিল করতে দেখা গেল নদীর জলে।

জেম ট্যাঙ্কারডন পাকা শিকারী। ইণ্ডিয়া আর আফ্রিকায় অনেক বাঘ-সিংহ মেরেছেন। একটা সিংহ ল্যাজের ঝাপটায় পিঙ্কিনাটকে কুপোকাৎ করবার তালে ছিল। ট্যাঙ্কারডন সাহেবের গুলিতে তা আর হল না। সিংহকেই কুপোকাৎ হতে হল।

সারাদিনে আরো দুটো বাঘ ছাড়া শিকার তেমন জমল না।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই ফের আরম্ভ হল গুলিগোলার শব্দ। এবার রাস্তায় নামল কামান সারি। কামানের আওয়াজ শুনিয়ে ফিচেল বাঘ সিংহকে আড়াল থেকে বার করে না আনলে তো ঘায়েল করা যাচ্ছে না। গাছে উঠেও রাত কাটিয়েছে অনেক চিতা। কামান গর্জন শুনে সত্যি সত্যিই বিকট ডাক ছেড়ে নেমে এল গোটা কুড়ি চিতা। বন্দুক চলল দমাদম শব্দে।

স্যাট কোভার্লির প্রিয় কুকুরটাকে কামড়ে দু'টুকরো করল একটা কুমীর। কিন্তু মিলিটারী গুলির ধারা বর্ষণে বারোটা কুমীরকেই পটল তুলতে হল শেষ পর্যন্ত।

দিনের শেষে দেখা গেল ছটা সিংহ, আটটা বাঘ, পাঁচটা জাগুয়ার আর নটা প্যান্থার ঘায়েল হয়েছে।

রাত ভোর হতে না হতেই আবার আরম্ভ হল মৃগয়া।

এবার দল বেঁধে সবাই বন্দুক হাতে খুঁজতে লাগল জন্তুদের। এক এক দলে কুড়িজন শিকারী। সন্ধ্যের সময়ে দেখা গেল মোট তিপ্পান্নটা শ্বাপদ খতম হয়েছে।

পরের দিন ভোর চারটার সময়ে সৈন্যদের নিয়ে জেম ট্যাঙ্কারডন, ওয়ান্টার স্যাট কোভার্লি এবং আরও কয়েকজন চলেছেন টাউন হলের দিকে। এমন সময়ে আতংকে চেঁচাতে চেঁচাতে পার্ক থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ছেলে আর মেয়েরা।

কী ব্যাপার? কী ব্যাপার? বাগানের ফটক বন্ধ হয়নি—ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক দিয়েই একটা বিরাট বাঘ ঢুকে পড়েছে ভেতর।

শিকারীদের পুরো দলটাই ছুটছিল পার্কের দিকে। সবার আগে ঢুকে পড়লেন স্যাট কোভার্লি আর ওয়ান্টার। বাঘটা পড়ল সামনেই।

থাবার আঘাতে ছিটকে পড়ল ওয়ান্টার। বন্দুকে গুলি ভরবারও সময় না পেয়ে কোমর থেকে ছুরী টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্যাট কোভার্লি। ঠিক তখনি ওয়ান্টারকে ফলার করবার জন্যে মুখ নামিয়েছিল বাঘটা। স্যাট কোভার্লির ছুরী গিয়ে বিঁধল গায়ে।

বুকে নয়। তাই গড়িয়ে গিয়েও তেড়ে এল ব্যাঘ্রমহাশয়। দাঁতের কামড়ে দুটুকরো করতে যাচ্ছে স্যাট কোভার্লির কণ্ঠনালী, এমন সময়ে বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল খুব কাছেই।

গুলি ছুঁড়ছেন জেম ট্যাঙ্কারডন।

দড়াম করে শব্দটা শোনা গেল এবার বাঘের দেহের মধ্যে থেকে। বিস্ফোরক বুলেট তো—ভেতরে গিয়ে ফেটে গেছে!

মরতে মরতেও বেঁচে গেলেন ন্যাট কোভার্লি। উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন জেম ট্যাঙ্কারডনকে—"ধন্যবাদ – প্রাণ বাঁচানোর জন্যে!"

"আপনাকেও ধন্যবাদ—আমার ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে!" জবাব দিলেন জেম ট্যাঙ্কারডন।

হাতে হাত মেলালেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ধনকুবের।

পরের দিন সকালে ট্যাঙ্কারডন গৃহিনী গিয়ে খোঁজখবর নিলেন ন্যাট কোভার্লির। তারপরের দিন কোভার্লি-গৃহিনী গিয়ে খোঁজ-খবর নিলেন ওয়াল্টারের। বলাবাহুল্য, সঙ্গে রইল ডায়না।

মরা বাঘটার পেটে খড়কুটো ঠেসে রেখে দেওয়া হল মিলিয়ার্ড সিটির মিউজিয়ামে। তলায় লেখা রইল শুধু একটি লাইন:

স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে ইংরেজদের উপহার!

১৯॥ ফিজি দ্বীপপুঞ্জ

মস্ত খবরটা শোনা গেল দিন কয়েকের মধ্যেই। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড তখন কোরো সাগর দিয়ে দশলক্ষ অশ্বের শক্তি নিয়ে ঢিমেতালে ছুটে চলেছে।

জেম ট্যাঙ্কারডন ন্যাট কোভার্লির বাড়ী গিয়ে দস্তুরমত আনুষ্ঠানিকভাবে ডায়নাকে পুত্রবধূ করতে চেয়েছেন। ন্যাট কোভার্লিও দস্তুরমত আনুষ্ঠানিক ভাবে ওয়াল্টারকে জামাই করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। দেওয়া-থোওয়ার কথাবার্তাও পাকাপাকি হয়ে গেছে ঐখানেই। বরকনের প্রত্যেকেই পাবে কুড়ি কোটি ডলার।

একগাল হেসে পিঙ্কিনাট বললে—"বাস রে? বাকী জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারবে দুজনেই।"

এই ঘটনার ফলে একটা বিশ্রী সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে গেল। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে কেউ আর কারো শত্রু রইল না। ভাব হয়ে গেল ট্যাঙ্কারডন গোষ্ঠীর সঙ্গে কোভার্লি গোষ্ঠীর। পরস্পরের ঘরে যাতায়াত খানাপিনাও চলল পুরোদমে। দ্বীপের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় হল। ভীষণ খুশী হলেন গভর্ণর।

এবার আরম্ভ হল বিয়ের জোগাড় যন্তর। পৃথিবীর নানান জায়গায় কেবল্ গ্রাম মারফৎ অর্ডার চলে গেল বর কনের দান সামগ্রীর। ঠিক হল, একটা স্পেশ্যাল স্টীমার হীরেজহরৎ এবং দামী দামী জিনিসপত্র সুয়েজ খাল দিয়ে নিয়ে আসবে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে।

ছাব্বিশে জানুয়ারী ভিটি-লেভু দ্বীপে চার বাজনদার নেমেছিল পিঙ্কিনাটের

অনেকদিনের একটা সাধ মেটানোর জন্যে। সত্যিকারের মানুষ খেকো জংলী না দেখলে নাকি জীবনই বৃথা। কিন্তু কুঁড়েঘরগুলোয় পঙ্গপালের মত আরশুলা, মশা আর উইপোকা দেখেই পাঁই পাঁই করে দৌড়ে পালিয়ে এল চলন্ত দ্বীপে।

২০॥ যুদ্ধের মহড়া

মিলিয়ার্ড সিটির বেশ কিছু বড়লোক ঠিক করলেন দল বেঁধে অভিযানে বেরোবেন ফিজি দ্বীপ পুঞ্জে। একটা কিছু নতুনত্ব না হলে চলে কী?

তাই হাতে হাত মিলিয়ে ওয়াল্টার আর ডায়নাও গেল ট্যাঙ্কারডন—কোভার্লি ফ্যামিলির সঙ্গে।

তাই দেখে ক্যালিস্টার মুনবার খুঁতখুঁত করতে লাগলেন—স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে পাহাড় নেই বলেই এঁরা নতুনত্ব খুঁজতে গেলেন। ঠিক আছে। ভবিষ্যতে একটা পাহাড় বসাবো চলন্ত দ্বীপে।

"আগুন পাহাড় বলুন!" উসকে দিল পিঙ্কিনাট। "স্টীল আর অ্যালুমুনিয়াম দিয়ে বাইরেটা করবেন। ভেতরে আতশবাজী ঠেসে রাখবেন।"

ক্যাপ্টেন স্যাবোল অভিযানে গেল না। চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে আরো ভালোভাবে দেখে নিতে গেল চলন্ত দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো। এমন কি চার বাজনদারের সঙ্গেও দিব্বি ভাব জমিয়ে নিল লোকটা।

তিরিশে জানুয়ারী বাজনদাররা ঠিক করলে রেওয়া নদী বেয়ে অভিযানে যাবে ফিজি দ্বীপ পুঞ্জের ভেতরে। চাওয়া মাত্র একটা ইলেকট্রিক লঞ্চ পাঠিয়ে দিলেন গভর্ণর। দুজন নাবিক আর একজন ফিজি পাইলট রইল লঞ্চে! ঠিক হল, সারাদিন বনজঙ্গলের হাওয়া খেয়ে রাত দশটার সময়ে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে ফিরে আসবে বাজনদাররা।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর নদীর ধারে একটা লম্বা গাছ দেখিয়ে বললে ফিজি-পাইলট—"গাছটা দেখেছেন?"

"দেখবার মত কিছু তো দেখছিনা।" বললে ফ্রাসকোলিন।

"গুঁড়ির গায়ে অনেকগুলো কোপ দেখতে পাচ্ছেন না? গাছের গায়ে মানুষ বেঁধে কুপিয়ে কাটার চিহ্ন। যতগুলো কোপ, ততগুলো মানুষকে রান্না করা হয়েছে গাছের তলায়।"

শুনে, অবিশ্বাসের হাসি হাসল পিঙ্কিনাট। দূর! দূর! মানুষে মানুষ খায় নাকি? ও সব শোনা কথা—বাস্তবে নেই!

কিন্তু ভুল করল পিঙ্কিনাট। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের নরখাদক জংলীরা ভেড়া শূওর-গরুর মাংসর চাইতে মানুষের মাংস খেতে বেশী ভালবাসে। রা-আন্দ্রেসুদু নামে একজন জংলী সর্দার নাকি সারা জীবনে আটশ বাইশটা মানুষ খেয়েছিল।

বেলা এগারোটার সময়ে নাইলিলি গ্রামে একটা গির্জে দেখা গেল। গির্জের পুরুৎ পই-পই করে বারণ করলেন বাজনদারদের, জংলীদের বিশ্বাস করলে কিন্তু প্রাণ খোয়াতে হবে। একটু হুঁশিয়ার থাকা ভাল।

দুপুর একটার সময়ে ট্যামপু গ্রাম দেখতে গেল সবাই। গ্রাম মানে খান কয়েক মাটি আর পাতার কুঁড়ে। জংলীদের সর্দার ওদের দেখেই বেরিয়ে এল কুঁড়ে থেকে। অতি ভীষণ চেহারা তার। কোঁকড়ানো চুল চুন দিয়ে সাদা করা। বাঁ-পায়ে এক পাটি কার্পেটের চটি। কোমরে বেল্টের মত করে বাঁধা একটা শতছিন্ন ডোরাকাটা সার্ট। গায়ে একটা তালিমারা ছেঁড়া নীল কোট—বোতামগুলো সোনালী।

পিঙ্কিনাট দেখেই হো-হো করে হেসে উঠল। আর ঠিক তখনি হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জংলী সর্দার। তৎক্ষণাৎ গাঁ শুদ্ধ লোক ইচ্ছে করে হুমড়ি খেল মাটির ওপর—নইলে সর্দারকে অসম্মান করা হয়।

পেট চেপে ধরে হাসতে লাগল পিঙ্কিনাট।

ফিজি পাইলট ওদের ভাষায় বুঝিয়ে দিলে, বিদেশী অতিথিরা এসেছে গাঁ দেখতে। আপত্তি করল না সর্দার। খুব একটা ঔৎসুক্যও দেখালো না। ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে। যেন সাদা মানুষদের নিয়ে কোনো রকম মাথা-ব্যথাই নেই সর্দারের।

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ওরা। কুঁড়ে ঘরগুলো বন্ধ। একটা ঘরের সামনে গাঁয়ের ওঝা বসে। বিকট মূর্তি তার। অতিথিদের দেখে যে মোটেই খুশী নয়, তা বোঝা গেল কড়া চাহনি দেখে।

সেখান থেকে বাজনদাররা গেল কতকগুলো ভাঙা মন্দির দেখতে—পিঙ্কিনাট বাদে। সে এই ফাঁকে কারও কথায় কান না দিয়ে একাই ঢুকল কলাবনের মধ্যে।

আর ফিরল না। কিছুক্ষণ পরেই টনক নড়ল বাকী বাজনদারদের। উদ্বিগ্নভাবে ফিরে এল ট্যামপু গ্রামে। সেখানেও ফেরেনি পিঙ্কিনাট। উল্টে পুরো গ্রামটা খাঁ-খাঁ করছে। ভোজবাজীর মত যেন উধাও হয়েছে গাঁয়ের জংলীরা।

মুখ চুন করে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে ফিরল তিন বাজনদার। সোজা গিয়ে

খবর দিল গভর্ণরকে। গভর্ণর তক্ষুনি গিয়ে দেখা করলেন ফিজি দ্বীপপুঞ্জের গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে। সব শুনে ভদ্রলোক বললেন—আমি নিরুপায়। ট্যামপু গ্রামের জংলীরা আমার শাসনের তোয়াক্কা করে না।

"সৈন্য পাঠান এখুনি," বললেন স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের গভর্ণর।

"অত সৈন্য আমার নেই।"

"আমার আছে। আপনি সঙ্গে লোক দিন।"

"কাল সকালের আগে পারব না।"

"আজই এখুনি লোক চাই।"

"সম্ভব নয়।"

"তাহলে কিন্তু স্ট্যানডার্ড অ্যায়ল্যাণ্ড থেকে কামান দেগে আপনার বাড়ী-ঘরদোর তছনছ করে দেব।"

এবার টনক নড়ল গভর্ণর জেনারেলের। তাঁর আছে মাত্র চারটে কামান। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে ডু'সাবি অত্যন্ত আধুনিক কামান। সাধ করে কে মরতে চায়?

সুতরাং লোক জুটে গেল তখুনি। সৈন্যসামন্ত নিয়ে ট্যামপু গ্রামে পৌছোলো কর্নেল স্টুয়ার্ট। গ্রাম তখনো খাঁ-খাঁ করছে। কর্নেল সৈন্য নিয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। কিছুদূর যেতেই দেখা গেল আগুনের আভা। ছুটে যেতেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে ভেসে উঠল ভয়ংকর সেই দৃশ্যটা।

কুঠার তুলে এগিয়ে যাচ্ছে নীল কোট গায়ে ভীষণদর্শন জংলীসর্দার। আগুনে কড়া চাপিয়ে গোল হয়ে বসে আছে জংলীরা। গাছে বাঁধা প্রায়-নগ্ন পিঙ্কিনাট জুল জুল করে দেখছে রান্নার ব্যবস্থা।

গুলি ছোঁড়ারও দরকার হল না! ডাকাতে হুংকার ছেড়ে সৈন্যসামন্ত তেড়ে যেতেই চোখের পলকে ফাঁকা হয়ে গেল চত্বর।

বাঁধন খোলা হতেই নেমে এসে যেন কিছুই হয়নি এমনি গলায় বললে পিঙ্কিনাট—"ঠিক ইংরেজদের মত ছাতা বগলে কোট গায়ে জংলী ব্যাটা খেতে যাচ্ছিল আমাকে—ঐখানেই আমার আপত্তি।"

২১॥ মালিকানা বদল

স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের পুনর্যাত্রার দিন ঠিক হয়েছিল দোসরা ফেব্রুয়ারী। তার আগেই ফিরে এল চলন্ত দ্বীপের বড়লোকরা ডাঙা-দ্বীপ থেকে। এসে যখন শুনল পিঙ্কিনাটের কাহিনী, হৈ-চৈ পড়ে গেল মিলিয়ার্ড সিটিতে।

গভর্ণরের কঠোর মনোভাবকে একবাক্যে সমর্থন জানালো প্রত্যেকেই। সেই-সঙ্গে সকৌতুকে কিছু কিছু লোককে বলতে শোনা গেল—ভায়োলা-বাদকের মাংস যে এত উপাদেয়, আগে জানা ছিল না তো ?

স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড এবার এগিয়ে চলল নিউ হেব্রাইড দ্বীপের দিকে—ক্যাপ্টেন স্যারোলের অনেক দিনের স্বপ্ন সম্ভব করতে।

ডায়না-ওয়াল্টারের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। তার আগে আসবে জাহাজ ভর্তি হীরে-জহরৎ আসবাবপত্র উপহার। সারা পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিসগুলোই এসে পৌছোবে সেই জাহাজে। কিন্তু কোথায় জাহাজ ? অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে রইল দশহাজার শহরবাসী।

যেদিন সেই জাহাজের আসার কথা, সেইদিন, দশুই ফেব্রুয়ারী, স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড কোম্পানীর পতাকা আধখানা নামিয়ে অন্য একটা জাহাজ এসে পৌছোলো দ্বীপে। পতাকা অর্ধেক নামানো কেন ? কি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে কোম্পানীর জাহাজ ?

জাহাজ থেকে গট গট করে নামল একজন অফিসার। হন হন করে গিয়ে উঠল ট্রামে। টাউন হলে পৌছেই ডেকে পাঠাল কাউন্সিল মেম্বারদের।

আটটা কুড়ি মিনিটে শোনা গেল সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।

"স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড কোম্পানী লালবাতি জেলেছে! কোম্পানী দেউলে হয়ে গেছে। পাওনাদারদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেবার জন্যে লিকুইডেটর বসেছে। আমি, উইলিয়াম পোমেরে, লিকুইডেটর হিসেবে এসেছি স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের দামী দামী জিনিসপত্র বেচে দেনার টাকা তোলবার জন্যে।"

শুনে কাউন্সিল মেম্বাররা তো থ! এত সাধের দ্বীপ শেষকালে লিকুই-ডেটরের হাতে নীলেমে উঠবে ? দূর! দূর! তাও কি হয়! এ-দ্বীপে কি বড়লোকের অভাব আছে ? কোম্পানী লাটে উঠেছে তো বয়ে গেছে! হাতবদল হোক না কোম্পানীর মালিকানা!

এই হল আমেরিকানদের স্বভাব! বাজে কথার মানুষ নয়! রাত নটা সাতচল্লিশ মিনিটেই সমস্যার সুরাহা হয়ে গেল। 'জেম ট্যাঙ্কারডন, ন্যাট কোভার্লি অ্যাণ্ড কোম্পানী'—এই নামে নতুন একটা কোম্পানী মালিক হল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের। পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে বিদেয় হল উইলিয়াম পোমেরে।

আনন্দে ফেটে পড়ল দ্বীপের বাসিন্দারা! এতদিনে সত্যি সত্যিই স্বাধীন হওয়া গেল।

একটি মাত্র সংযোগসূত্র ছিল ম্যাডেলীন উপসাগরের সঙ্গে—সেই ডুবো তারটা। এবার তাও কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হল জলে। ব্যস, আর কারো হুকুমের তোয়াক্কা করবে না স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড।

ধন্যি ধন্যি রব উঠল ট্যাঙ্কারডন আর কোভার্লি ফ্যামিলির নামে। তাঁরা উদ্যোক্তা হয়েছিলেন বলেই তো 'প্রশান্তের মুক্তো'কে আস্ত রাখা গেল।

সব তো হল। কিন্তু হীরে জহরৎ ভর্তি সেই জাহাজটা কোথায়? বিয়ের দিন যে এগিয়ে এল!

উনিশে ফেব্রুয়ারী সকাল নটায় দেখা গেল বহু প্রতীক্ষিত সেই জাহাজকে! সারা শহর ভেঙে পড়ল উপহারের জিনিস দেখতে। দেখে চোখ কপালে উঠল বিরাট-বিরাট বড়লোকদেরও।

ইতিমধ্যে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার দেওয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন স্যারোলের ওপর। এখানকার সমুদ্র অত্যন্ত বিপদসংকুল। চোরা পাহাড়ে বোঝাই। ক্যাপ্টেন স্যারোল কিন্তু চোখ বুঁজে বলে দিতে পারে, কোথায় কোন প্রবাল-পাহাড় ওৎ পেতে আছে। তাই অতি সন্তর্পনে অতি মন্থর গতিতে চলন্ত দ্বীপকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ক্যাপ্টেন।

আস্তে আস্তে যাওয়ার আরও একটা কারণ ছিল বৈকি! সাতাশে ফেব্রুয়ারী ডায়না-ওয়াল্টারের বিয়ের দিন। ঐদিনই নিউ হেব্রাইড পৌঁছোতে হবে। কেন না, সারাদিন উৎসব চলবে দ্বীপে। সৈন্যসামন্ত পুলিশদের ছুটি থাকবে। বিশেষ করে বিয়ের লগ্ন এসে গেলে, মানে ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত্তির বেলা, কারোরই কোনোদিকে আর হুঁশ থাকবে না। কৃপাণ নিয়ে কচুকাটা করার মাহেন্দ্রক্ষণ হল তখনই।

হলও তাই। দুপুর একটার সময়ে নিউ হেব্রাইড দ্বীপের বেশ খানিকটা দূরে স্থির হয়ে দাঁড়াল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যা । ক্যাপ্টেন স্যারোল দলবল নিয়ে নেমে গেল প্রায় গলবস্ত্র হয়ে বারবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে।

শুরু হল বিয়ের উৎসব। বেলা তিনটের সময়ে অভ্যাগতরা জড়ো হলেন পার্কে। আরম্ভ হল নানা রকম মজার খেলাধুলো।

সন্ধ্যে হতেই নাচ আরম্ভ হল ক্যাসিনোতে। সেই সঙ্গে শ্রুতিমধুর বাজনা।

রাত এগারোটার সময়ে ফার্স্ট এভিন্যু দিয়ে এগিয়ে গেল বিয়ের শোভাযাত্রা টাউন হলের দিকে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ডায়না আর ওয়াল্টারও পায়ে হেঁটে চলল রাস্তা দিয়ে।

এমন সময়ে হট্টগোল শোনা গেল বন্দরের দিক থেকে। সেইসঙ্গে বোমার আওয়াজ আর গুলির শব্দ।

দাঁড়িয়ে গেল শোভাযাত্রা। কী ব্যাপার?

তারপরেই ছুটতে ছুটতে এল বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে জখম সৈন্য আর অফিসার।

উদ্বেগ চরমে উঠল এবার। কমোডোর সিমকোকে তলব করলেন গভর্ণর। কেন এই রক্তারক্তি?

কেন আবার! হাজার তিনচার নিউ হেব্রাইড দ্বীপবাসী চড়াও হয়েছে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের ওপর! পালের গোদা সেই বেইমানটা—ক্যাপ্টেন স্যারোল!

২২॥ আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষা

ক্যাপ্টেন স্যারোল? জাহাজ ডুবির পর এই কটি মাস যাকে জামাই-আদরে রাখা হয়েছিল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে, চ্যালাচামুণ্ডার খাওয়া-থাকার জন্যে যাকে একটি পয়সাও দিতে হয় নি, সেই ক্যাপ্টেন স্যারোল ডাকাতি করতে এসেছে যক্ষপতিদের রত্নপুরী—এই স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডে?

স্তম্ভিত হয়ে গেল মিলিয়ার্ড সিটির বড়লোকরা।

নিউ হেব্রাইড দ্বীপপুঞ্জের আধা জংলীদের মধ্যেও ইতর বিশেষ ছিল। উত্তরের লোকগুলো অনেক সভ্যভব্য। সে তুলনায় দক্ষিণের আদমীরা একেবারে নীচু স্তরের। মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নেই। অনেক দুঃখে একজন চন্দন-কাঠের ব্যবসায়ী বলেছিলেন—"এ-দ্বীপ যদি কথা কইতে পারত, এমন কাহিনী বলত যা শুনলে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে।"

এরোম্যানগো-র মোট জনসংখ্যা দশহাজার। অধেক খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। বাকী অর্ধেককে নিয়েই যত ভয়। টুরিস্টদেরও হুঁশিয়ার করে দেওয়া হত এদের সম্বন্ধে।

বেছে বেছে এইসব নিষ্ঠুর কসাই-ক্লাসের লোকগুলোকে নিয়েই দল তৈরী করেছিল ক্যাপ্টেন স্যারোল। লোভ দেখিয়েছিল বিপুল ধনরত্নের। ভাসমান দ্বীপের ঘরে ঘরে জমা আছে দামি সোনাদানা মণিমুক্তো। মানুষগুলোকে মেরে লুঠ করে নিতে পারলেই হল। তাই দ্বীপপুঞ্জের সব চাইতে বর্বর জংলী যারা, তারা দলে দলে যোগ দিয়েছিল ক্যাপ্টেনের বোম্বেটে-বাহিনীতে।

দ্বীপপুঞ্জের উত্তর অঞ্চলেও অসভ্য মানুষ ছিল কিছু কিছু। যেমন, আপি দ্বীপের ১৮,০০০ অসভ্য, এরা নাকি কয়েদীদের পুড়িয়ে খেতে বড্ড ভালবাসে। ম্যালি কোলো দ্বীপের নরখাদক কানাকা-দের নাম শুনলেও শিউরে ওঠে

সাদা মানুষ। সব চাইতে কুখ্যাত হল অরোরা দ্বীপ—যেখানে আজও কোনো সভ্য মানুষ থাকতে ভরসা পায় নি। ক্যাপ্টেন স্যারোল বেছে বেছে দলে ভিড়িয়েছিল এদেরকেই।

এরোম্যানগোর কাছাকাছি আসতেই স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড থেকে সংকেতে দলবলকে তৈরী হতে নির্দেশ দিয়েছিল ক্যাপ্টেন।

পরিস্থিতি খুবই খারাপ। মিলিয়ার্ড সিটির দশহাজার মানুষকে কচুকাটা করতে দ্বিধা করবে না জংলীরা। ওদের হাতে গাছের বিষ মাখানো তীরধনুক আছে, হাড়ের ফলা লাগানো জাভেলিন বর্শা আছে—যে বর্শায় জখম হলে ঘা আর সারে না; এমন কি স্নাইডার রাইফেল পর্যন্ত আছে।

ভাগ্যক্রমে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের প্রত্যেকেই তখন জড়ো হয়েছে মিলিয়ার্ড সিটিতে বিয়ে দেখতে। তাই শহরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল তক্ষুনি যাতে বাইরে থেকে কেউ আর ভেতরে ঢুকতে না পারে।

জংলীরা অবিশ্যি তখনো লারবোর্ড বন্দরেই হামলা চালাচ্ছে। কমোডোর শিমকো, কর্নেল স্ট্যুয়ার্ট সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সাজিয়ে ফেললেন। এগিয়ে এলেন মেলকালির রাজা-ও। বয়স হলেও সাহসের অভাব ছিল না তাঁর মনে।

শহরের মধ্যে সবাই থাকলেও বন্দর দুটো আর বিদ্যুৎকারখানাকে বোধ হয় বাঁচানো যাবে না। তার চাইতেও খারাপ অবস্থায় পড়তে হবে যখন দুসারি কামানের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হবে শহরের দিকে। ক্যাপ্টেন স্যারোলের বোম্বেটেরা নিশ্চয় এ-বিদ্যেতেও পোক্ত।

মেলকালির রাজা ঠাণ্ডা মাথায় হুকুম দিলেন, এক্ষুনি কচিকাচাদের নিয়ে মেয়েরা টাউন হলে গিয়ে বসুক। বিদ্যুৎকারখানার ইঞ্জিনীয়াররা পালিয়ে আসায় গোটা স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডই তখন অন্ধকার। মায় টাউন হল পর্যন্ত।

কমোডোরের হুকুমে অস্ত্রাগার থেকে বন্দুক-পিস্তল বিলিয়ে দেওয়া হল বন্দুকবাজদের হাতে। এগিয়ে এলেন জেম ট্যাঙ্কারডন, ন্যাট কোভার্লি, এমনকি ওয়াল্টারও।

গুলি চলছে বন্দরের দিকে। ক্যাপ্টেন স্যারোল ঝানু বোম্বেটে। ইঞ্জিন ঘর দুটো আগে বিকল করে দিচ্ছে। যাতে অসহায়ভাবে এরোম্যানগো-র দিকেই ভেসে যায় স্টানডার্ড আয়ল্যাণ্ড। একবার পাথরে লেগে চুরমার হয়ে গেলে পোয়া বারো হবে বোম্বেটে জংলীদের।

এক ঘণ্টাও গেল না। শহরের ফটকে পৌছে গেল জংলীরা। পাঁচিল বেয়ে উঠতে গেল—গুলি খেয়ে পড়ে গেল। দরজা ভাঙতে গিয়েও অক্কা পেল গুলিবর্ষণে।

ক্যাপ্টেন স্যারোল আর যাই হোক, বোকা নয়। অন্ধকারে হঠকারিতা না করে পেছিয়ে গেল স্যাঙাতদের নিয়ে। ওৎ পেতে রইল দিনের প্রতীক্ষায়।

ভোর চারটের সময়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে পার্কে গিয়ে তৈরী হলেন কমোডোর সিমকো। ভালো করে আলো ফুটতে না ফুটতেই শুরু হল হামলা। দরজা ভেঙে পড়ে আর কি! অবিরাম গুলি চলল এ-তরফ থেকে। সামান্য জখম হলেন জেম ট্যাঙ্কারডন। মেলকার্লির রাজা অনেক চেষ্টা করলেন ক্যাপ্টেন স্যারোলকে শোওয়াতে—পারলেন না।

দশটার সময়ে সময়ে ফটক ভেঙে পড়ল। হুংকার ছেড়ে জংলীরা বন্যার স্রোতের মত ঢুকল ভেতরে। কমোডোর সিমকো আশ্রয় নিলেন টাউন হলে। কেল্লার মত সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য এই টাউন হল থেকেই এবার শুরু হবে শেষ যুদ্ধ।

কমোডোর ভেবে ছিলেন, জংলীরা ফার্স্ট এভিন্যুতে ঢুকে ছড়িয়ে পড়বে লুঠতরাজের জন্যে। উনিও সুযোগ বুঝে নিকেশ করবেন হানাদারদের।

কিন্তু ক্যাপ্টেন স্যারোল কাঁচা ছেলে নয়। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, এ-তত্ত্ব সে জানে। তাই জংলীদের ছত্রভঙ্গ হতে দিল না—চালিয়ে নিয়ে গেল টাউন হলের দিকে। আগে খতম হোক দশহাজার মানুষ—লুঠতরাজ তারপর।

সৈন্যবাহিনী অবশ্য একটু একটু করে পেছোচ্ছিল টাউন হলের দিকে। বৃষ্টির মত বিষাক্ত তীর, বর্শা, বন্দুকের গুলির মধ্যেও তারা দৌড়ে পালায়নি। তাই বেলা দুটোর সময়ে দেখা গেল মারা পড়েছে পঞ্চাশ জন, জখম হয়েছে একশ থেকে দেড়শ জন। টাউন হলে আশ্রয় নেওয়ার পর বাচ্ছা আর মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হল ভেতরের ঘরে। বন্দুকের গুলি, তীর বা বর্শা সেখানে পৌঁছোবেনা। তারপর দরজা জানলায় দাঁড়িয়ে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ আর বন্দুকধারী শহরবাসীরা শুরু করল মরণ পণ লড়াই।

"এই শেষ চেষ্টা," বললেন গভর্ণর। "বাঁচি বাঁচব, মরি মরব।"

দুঘণ্টা পরেও টাউন হলে ঢুকতে পারল না ক্যাপ্টেন স্যারোল। আশ্চর্য-ভাবে সে নিজেও অক্ষত রইল গুলি বৃষ্টির মধ্যে। টাউন হল থেকে তাকে টিপ করে গুলি ছোঁড়া হল বারবার। পালের গোদাকে ঘায়েল করলেই জংলীদের ছত্রভঙ্গ করতে সুবিধে হত। কিন্তু লোকটার যেন কই মাছের প্রাণ!

ক্যাপ্টেন মরল না। কিন্তু মারা গেলেন গভর্ণর। স্নাইডার বুলেট বুকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন—আর উঠলেন না।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ তেজে দরজাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জংলীরা। দমাদম শব্দে কুড়ুল পড়তে লাগল পাল্লার ওপর। এ-ভাবে চললে অমন

মজবুত কপাটও তো আর টিকবে না? কি করবেন কমোডোর? মেয়ে আর বাচ্ছাদের নিয়ে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবেন? যাবেন কোথায়? কামান সারি পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ মিলবে কী? সেখানেও তো জংলীরা থাকতে পারে?

চরম মুহূর্তে চরম সিদ্ধান্ত নিলেন মেলকার্লির আধবুড়ো রাজা। দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ঝাঁকে ঝাঁকে তীর-গুলি-বর্শা বর্ষণের মাঝে। বন্দুক তুলে টিপ করলেন এবং এক গুলিতেই খতম করলেন ক্যাপ্টেন স্যাবোলকে।

ঠিক সেই সময়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল একটা দরজা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দারুন চেঁচামেচি শোনা গেল ফার্স্ট এভিন্যু থেকে। আরো বেশী গুলি-গোলা ছুটছে সেখানে।

ব্যাপার কী? বন্দর আর কামান সারির পাহারাদাররা কি জংলীদের চোট করে, টাউন হলের দিকে এগিয়ে আসছে? নাকি, আরও জংলী এরোম্যানগো থেকে এসে পৌঁছোলো?

এমন সময়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ক্যালিস্টার মুনবার—"পালাচ্ছে! পালাচ্ছে! ভিখিরিগুলো পালাচ্ছে!"

দেখেই মেলকার্লির রাজা দলবল নিয়ে তাড়া করলেন পেছন পেছন। জংলীরা জ্যাভেলিন, তীর ধনুক, বন্দুক ফেলে চোঁ-চোঁ দৌড়োচ্ছে ফার্স্ট এভিন্যু দিয়ে। দারুন মারামারি চলছে মানমন্দিরের দিকে। আতংকে দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছে হানাদাররা। কিন্তু কাদের ভয়ে পালাচ্ছে?

নিউ হেব্রাইড দ্বীপের হাজার খানেক সভ্য বাসিন্দার ভয়ে। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের ফরাসী উপনিবেশকারীদের নেতৃত্বে তারা ছুটে এসেছে বিপন্ন আমেরিকানদের বাঁচাতে।

ইঞ্জিন বিকল হয়ে যেতেই স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড আপনা থেকেই ভেসে যাচ্ছিল স্রোতের টানে। কিন্তু এরোম্যানগোর দিকে না গিয়ে যাচ্ছিল ফরাসী উপনিবেশের দিকে। ফরাসীরা আসতে পারছিল না নৌকোর অভাবে। কিন্তু স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড নিজেই যখন গিয়ে পৌঁছোলো, এক হাজার সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে ফরাসীরা উঠে এল চলন্ত দ্বীপে।

দু'ঘণ্টার মধ্যে হানাদার শূন্য হল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড।

এবার দেখা দিল নতুন সমস্যা। গভর্ণর মারা গেছেন। নতুন গভর্ণর নির্বাচন করতে হবে ইলেকশনের মাধ্যমে।

তার আগে টুকটাক মেরামতি নিয়ে ব্যস্ত হলেন কমোডোর।

২৩॥ ঘুরন্ত দ্বীপ

তেসরা মার্চ স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ ছেড়ে রওনা হল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড।

তারপর থেকেই আরম্ভ হল ইলেকশনের উত্তেজনা। বলাবাহুল্য, গভর্ণর হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি দুজনেই আছেন দ্বীপে। জেম ট্যাঙ্কারডন আর ন্যাট কোভার্লি। দুজনেরই সমর্থক আছে। দু'দলেরই ইচ্ছে তাঁদের দলপতিই গভর্ণর হোক। দুদলেরই শ্রদ্ধা আছে নিজের নিজের লীডারের ওপর। লারবোর্ড অঞ্চলের বড়লোকরা চাইল জেম ট্যাঙ্কারডন গভর্ণর হোক। স্টারবোর্ড অঞ্চলের ধনীরা তাই শুনে নাক কুঁচকে বললে—"তা কেন হবে? ন্যাট কোভার্লি কম যান কিসে?"

ভোটরঙ্গ নিয়ে চিরকাল যা হয়, এবারও তা শুরু হল পুরোদমে। উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ল তলায় তলায়। আস্তে আস্তে তা প্রকাশ্যেও শুরু হল। মানুষে মানুষে হৃদ্যতা নষ্ট হয়ে গেল। শত্রুতা মাথা চাড়া দিল নতুন উদ্যমে।

বিয়েটা হয়ে গেলে ল্যাটা চুকে যেত। অনেক দিনের শত্রুতার মূল পর্যন্ত উপড়ে আসত! স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের মঙ্গল হত।

কিন্তু তা হবার নয়। তাই বিয়ে হতে গিয়েও হল না। যদিও ডায়না আর ওয়াল্টার কোনো দলেই যোগ দিল না। উল্টে ওয়াল্টার অনেক বোঝালে বাপকে। কিন্তু তাঁর ঘাড়েও তখন ইলেকশনের ভূত চেপেছে। ভাল কথায় কর্ণপাত করলেন না।

মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল দুই ফ্যামিলিতে। শহর শুদ্ধ বড়লোকদের একই দশা ঘটল। পরস্পরের পিণ্ডি চটকানো আরম্ভ হয়ে গেল ঘরে ঘরে।

শেষ পর্যন্ত শোনা গেল সেই হৃদয় বিদারক খবরটা। বিয়ে ভেঙে গেছে। ডায়নার সঙ্গে ওয়াল্টারের বিয়ে আর হবে না। সিদ্ধান্তটা তাদের বাবাদের। ওদের সিদ্ধান্ত অবশ্য অটল রইল। বিয়ে করবেই। সম্পত্তি ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পৃথিবীর অন্য কোথাও গিয়ে ঘর সংসার পাতবে।

ইলেকশনের বিপদ এড়ানোর জন্যে বেশ কিছু ধীরবুদ্ধি নাগরিক ঠিক করলেন মেলকার্লির রাজাকে গভর্ণর করা হোক। ভদ্রলোক গভর্ণর হলে গভর্ণরই থাকবেন, রাজা হতে চাইবেন না। কেননা, তিনি ত্যাগী, নির্লোভ এবং মহৎ।

মেলকার্লির রাজা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন প্রস্তাবটা। শাসনকার্যে তাঁর অরুচি ধরে গেছে। নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে দিব্বি সময় কাটছে তাঁর। আর কিছু চান না।

শেষ পর্যন্ত ইলেকশন হল পনেরোই মার্চ। তিন-তিনবার ভোট গণনা হল। তিনবারই দেখা গেল! দুই প্রার্থীই সমান সমান ভোট পাচ্ছেন। তার মানে ভণ্ডুল হয়ে গেল ভোটরঙ্গ!

এ-হেন অচলাবস্থার মধ্যে পিঙ্কিনাট একটা সুরাহা বাৎলেছিল। ক্যালিস্টার মুনবারকে বলেছিল—অত ঝঞ্ঝাটে দরকারটা কী? ছেনি, হাতুড়ি, রেঞ্চ দিয়ে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে দুটুকরো করে ফেললেই হয়? যে-যার টুকরোয় গিয়ে গভর্ণরগিরি করুক!

আঁৎকে উঠল মুনবার—"বলেন কী? দুটুকরো করব স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে?"

কিন্তু পিঙ্কিনাটের কথা এমনিভাবে সত্যি হবে কে জানত?

উনিশে মার্চ একই সময়ে টেলিফোন মারফৎ একজোড়া হুকুম পেলেন কমোডোর সিমকো। উনি ধীরেসুস্থে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ম্যাডেলীন উপসাগরের দিকে। কিন্তু কর্তাদের ইচ্ছে নাকি তা নয়। ট্যাঙ্কারডন হুকুম দিলেন, এখুনি অস্ট্রেলিয়া যাওয়া হোক। চলন্ত দ্বীপকে ব্যবসায় খাটানো যায় কিনা, সে ব্যবস্থা ওখানেই হবে। কোভার্লি ফর্মান জারী করলেন—খবরদার! অস্ট্রেলিয়া নয়—গিলবার্ট আয়ল্যাণ্ড যেতে হবে এখুনি।

তার মানে, একজন চাইলেন দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যেতে। আরেকজন চাইলেন ঠিক তার উল্টোদিকে যেতে।

মেলকার্লির রাজার সঙ্গে পরামর্শ করে কমোডোর জবাব পাঠিয়ে দিলেন টাউন হলে! কর্তাদের হুকুম মানা সম্ভব নয়। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড যেমন যাচ্ছে, তেমনি যাবে।

ঘণ্টাখানেক সব চুপচাপ। কর্তারা যেন ভুল বুঝতে পেরেই চুপচাপ আছেন।

আচমকা অদ্ভুতভাবে দুলতে লাগল গোটা দ্বীপটা। কী ব্যাপার? কী ব্যাপার? সোরগোল পড়ে গেল চারিদিকে।

"কী আবার ব্যাপার!" হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন কমোডোর। "কর্তারা আমাকে ডিঙে হুকুম জারী করেছেন লারবোর্ড বন্দর আর স্টার বোর্ড বন্দরের ইঞ্জিনীয়ারদের। তারাও নিজের নিজের অঞ্চলের মালিককে মেনে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে পুরোদমে চালাচ্ছে। একজন চালাচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমে, আরেকজন উত্তর পূবে। বিপরীত দিকে হ্যাঁচকা টান পড়ায় লাট্টুর মত ঘুরতে শুরু করেছে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড।"

সর্বনেশে কাণ্ডটা শুরু হল এই ভাবে। শহরবাসীরা কিন্তু বুঝল না কি

সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। একটানা সাতদিন বনবন করে ঘোরবার পর জয়েন্টগুলো আলগা হয়ে এল, লোহার পাতগুলোর জোড় খুলে গেল, নাটবল্টু খুলে পড়ে গেল। বাড়ীঘরদোর কাঁপতে লাগল ভিত আলগা হয়ে যাওয়ায়। দলেদলে সবাই বেরিয়ে এল ফাঁকা মাঠে। ভবিষ্যতের চিন্তা না করে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে চলল—"ট্যাঙ্কারডন জিন্দাবাদ!" "কোভালি জিন্দাবাদ!" চর্কীপাকের রেশ প্রত্যেকেরই মগজে লেগেছিল বোধ হয়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অট্টরোল করে চলল রাস্তাঘাটে পার্কে মাঠে। শেষকালে হাতাহাতি পর্যন্ত আরম্ভ হয়ে গেল দলবদ্ধ বড়লোকদের মধ্যে!

বেশ বোঝা গেল, 'প্রশান্তের মুক্তো' এই মুহূর্তে শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেলেও পাগলামি থামবে না কারোরই।

উন্মাদ মানুষগুলোর মাথা আরো বেশী করে ঘুলিয়ে দেওয়ার জন্যে আকাশ কালো করে ঝড়ের বাদ্যি বেজে উঠল। লক্ষ লক্ষ করতালি বাজিয়ে বুনো ঘোড়ার কেশরের মত দিগন্ত অন্ধকার করে ধেয়ে এল খ্যাপা ঝড়।

ডায়নাকে নিয়ে ওয়াল্টার পালাচ্ছিল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। সেদিন সাতাশে মার্চ। রাত ভোর হওয়ার আগেই প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে থর থরিয়ে কেঁপে উঠল গোটা দ্বীপটা।

লারবোর্ড বন্দরের বয়লার আর সহ্য করতে পারে নি। স্টীম প্রেসার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কলকব্জা বাড়ীঘরদোর সমেত উড়িয়ে নিয়ে গেছে ফেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ঐ দিকের বিদ্যুৎশক্তির উৎস ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আধখানা আয়ল্যাণ্ডে অন্ধকারও নেমে এল তক্ষুনি।

২৪॥ রেষারেষির ফল

দুটো ডায়নামোর একটা গেল। দুটো ইঞ্জিনেরও একটা গেল। তার মানে, একটা পা আর একটা চোখ নিয়ে এখন থেকে লেংচে চলতে হবে কানা খোঁড়া স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে!

কমোডোর মহা ফাঁপরে পড়লেন। এ-অবস্থায় এক হাতও যাওয়া সম্ভব নয়। তার ওপর দ্বীপের কাঠামোও জখম হয়েছে সাংঘাতিক ভাবে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, বিস্তর স্টীল কম্পার্টমেণ্ট জলে তলিয়ে গেছে। প্লেট ফেটে গেছে, জোড় খুলে ঝুলছে। লারবোর্ড বন্দর বলতে আর কিছুই নেই। সব চাইতে সর্বনেশে ব্যাপার লাটুর মত পাক খেতে খেতে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড চলতি পথ থেকে সরে এসেছে অনেকখানি। এখনো ভেসে চলেছে

স্রোতের টানে বিপুলকায় ধ্বংসাবশেষের মত। পাল নেই, দাঁড় নেই, মেশিন নেই যে ইচ্ছে মত পথ চলবে। এইভাবে ভাসতে ভাসতে মেরু অঞ্চলে পৌঁছোলে তো আর দেখতে হবে না। শীতে জমে মরতে হবে সবাইকেই। তার আগেই অবশ্য মরতে হবে না খেয়ে। খাবারের ভাঁড়ার তো ফুরিয়ে এসেছে!

শিয়রে শমন দেখে অবশেষে ফের কোঁদল ভুলে আলোচনায় বসেছেন জেম ট্যাঙ্কারডন আর ন্যাট কোভার্লি। সবাই মিলে ঠিক করলেন, ঢের হয়েছে, আর না। দ্বীপের ভার এখন থেকে থাকুক কমোডোরের ওপর।

বিনা দ্বিধায় দায়ীত্ব মাথায় নিলেন কমোডোর। প্রথমেই শুরু হল মেরামতির কাজ। জোড় খুলে যাওয়া প্লেট জোড়া লাগাতেই হবে। বনেদ ভেঙে পড়লে সহর ধুলিসাৎ হতে কতক্ষণ?

তা না হয় হল। কিন্তু খাবারের ভাঁড়ারও তো শেষ হতে চলল। বড় জোর দিন পনেরো চলবে দশহাজার লোকের। তারপর?

ফলে, শুরু হল রেশন করে খাওয়া! হায়রে বড়লোক! ডলারের পাহাড় পায়ের কাছে রেখেও পেট ভরে খেতে পেল না দুবেলা!

রেষারেষির ফলেই আজ এই অবস্থা তাদের। ঝড় বাদলায় অটুট থেকেছে চলন্ত দ্বীপ, —দুরন্ত প্রকৃতিকেও টেক্কা মেরেছে। কিন্তু ধ্বংস হতে বসেছে কেবল আত্মকলহের পরিণামে!

একত্রিশে মার্চ সেক্সট্যাণ্ট নিয়ে হিসেব করে দেখা গেল, নিউজিল্যাণ্ড রয়েছে একশ মাইল দক্ষিণে, অস্ট্রেলিয়া পনেরো শ মাইল পশ্চিমে। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই কোনো দিকেই। স্রোত টেনে নিয়ে যাচ্ছে অসহায় স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে মেরু অঞ্চলের দিকে।

তেসরা এপ্রিল রাত থেকে হাওয়ার অবস্থা খারাপ হল। উত্তাল হল ঢেউ। খবর এল, দ্বীপের কাঠামোর অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। টিঁকলে হয়। আরো জোড় খুলে গেছে। আরো কামরা ভেসে গেছে। পার্কের মাটি অদ্ভুত ভাবে তেউড়ে গেছে—যেন সমুদ্র তলা পর্যন্ত উঠে এসেছে। বিস্তর বাড়ী পড়ো-পড়ো হয়ে ঝুলছে। বন্দরের কাছে জলের রেখা আরো এক ফুট উঠে এসেছে। আর সামান্য উঠলেই ঢেউ উঠে আসবে দ্বীপের ওপর। আর কোন সন্দেহ নেই। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড ডুবতে বসেছে। বেশী দেরী আর নেই।

হাওয়ার জোর আরো বাড়ছে। দিন গেল। রাত এল। ঝনঝন শব্দ ভেসে আসছে মাটির তলা থেকে। গুমগুম আওয়াজ করে জোড় খুলছে, কামরা তলাচ্ছে, প্লেট খসে পড়ছে।

রাত গভীর হতেই শহর ছেড়ে ফাঁকা মাঠে এসে দাঁড়াল সবাই। ঠিক নটার সময়ে স্টারবোর্ড বন্দরের বিদ্যুতের কারখানা জলে তলিয়ে গেল। ভীষণ ভাবে দুলে উঠল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড। সেই সঙ্গে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল গোটা দ্বীপ।

মাটি আরও কাঁপছে। হুড়মুড় করে আরো বাড়ী পড়ছে। ঠিক যেন তাসের কেল্লা শুয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে।

কমোডোরের হুকুমে মানমন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এল সবাই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মানমন্দিরও ভেঙে পড়ল জলে।

ঝড় তখন তুঙ্গে উঠেছে। সাইক্লোন ঝড়। এর আগে ঝড় উঠলে ঝড়ের কেন্দ্রে গিয়ে নিরাপদ হয়েছে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড। এবার নিজে থেকে যাওয়ার পথ বন্ধ।

চার বাজনদার অমন বিপদেও বাজনাগুলোর কথা ভোলেনি। দৌড়ে গেল ক্যাসিনোয়। বাজনা নিয়ে ফিরে এল মাঠে।

ওয়াল্টারের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ডায়না। সব শেষ হতে চলল। আর কী?

রাত বারোটার সময়ে ঝড়ের হুংকারে কানে তালা লেগে গেল। মড়মড় করে ভাঙতে লাগল স্টীল কাঠামো। বেশ বোঝা গেল, পায়ের তলায় সব আলগা হয়ে গিয়েছে—কিছুই আর আস্ত নেই। বিরাট বিরাট ফাটলের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেল দু'দুটো গির্জে আর টাউন হল। সেইসঙ্গে রাশিরাশি অমূল্য সঞ্চয়।

সমুদ্র দ্বীপের ওপর উঠে আসছে এক এক ঝাপটায়। রাত ভোর হবে কী? নিরাপদ অঞ্চল আর কোথাও নেই। বজ্র গর্জনে তরঙ্গ ধেয়ে আসছে·· আসছে ·· আসছে! প্রকৃতির সংহার মূর্তি যে কি প্রলয়ংকর হতে পারে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

ভোর তিনটের সময়ে দু'মাইল লম্বা ফাট ধরল পার্কে—সার্পেন্টাইন নদীর তীর বরাবর। ভয়ার্ত বড়লোকরা পালিয়ে গেল দুদিকে। কারও ছেলে পড়ল এদিকে, মেয়ে ওদিকে, বউ গেল তলিয়ে।

ডায়নাকে কাঁধে নিয়ে স্টারবোর্ড বন্দরের দিকে ছুটে চলল ওয়াল্টার।

ভোর পাঁচটায় চড়চড় মড়মড় শব্দে প্রায় আধ বর্গ মাইল জায়গা নিয়ে সমুদ্রে ভেসে গেল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের একটা টুকরো—আস্ত স্টারবোর্ড বন্দর রইল সেই দিকে। ইঞ্জিন, গুদোম—সব ভেসে গেল ভাঙা টুকরোর সঙ্গে সঙ্গে।

ঝরঝরে স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডকে নিয়ে যেন লোফালুফি খেলতে লাগল উন্মত্ত সাইক্লোন। প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে ভেঙে আলাদা হয়ে গেল কামরাগুলো। টুকরো টুকরো কাঠামোর ওপর জড়ামড়ি করে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল হাজার হাজার নরনারী বাচ্চাকাচ্চা।

স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড বলতে রইল শুধু ঐ কয়েকখানা ভাঙা টুকরো!

২৫॥ শেষ কথা

সকালের আলো ফুটলো। জল থেকে কয়েক শ' ফুট ওপরে উঠলে তখন পায়ের তলায় দেখা যেত অভূতপূর্ব এক দৃশ্য। ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে টুকরো-টাকরা স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড। তিনটে টুকরো একটু বড়—বাকীগুলো একেবারেই ছোট।

ভোর হতেই সাইক্লোন বিদায় নিয়েছে। প্রচণ্ড মার মেরে গেছে চলন্ত দ্বীপকে। সবচেয়ে বেশী মার খেয়েছে মিলিয়ার্ড সিটি। একটা বড় টুকরোর ওপর কিছু খাবার আর জলের ট্যাঙ্ক রয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় টুকরোয় কান্নাকাটি করছে ৩০০০ ধনী। তার পাশের টুকরোটায় বসে আছে ২০০০ বড়লোক। ভেসে যাওয়া স্টারবোর্ডে ছিল ৪০০০ ধনকুবের। ছোটখাট ১২টা টুকরোয় রয়েছে বাদবাকী লোক।

কিন্তু কোন দ্বীপেই দেখা গেল না ডায়না বা ওয়াল্টারকে।

ঢেউয়ের দোলায় কতকগুলো সোলার টুকরো ছেড়ে দিলে দেখা যায় ভাসতে ভাসতে আপনা-আপনিই কাছাকাছি চলে আসে। একই নিয়মে খণ্ড-বিখণ্ড স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডও কাছাকাছি ভাসছে। দূরে সরে যায়নি।

নটা বাজতেই কমোডোর নৌকো নামালেন লারবোর্ড বন্দর থেকে। সরেজমিন তদন্ত করে এলেন ভাসমান টুকরোগুলোয়। খতিয়ে দেখলেন, খাবার আর জল যা আছে, তাতে দিন পনেরো চলে যাবে। তার মধ্যেই যদি ভাসতে ভাসতে নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত যাওয়া যায়, তবেই বাঁচোয়া। নইলে মৃত্যু অনিবার্য।

রাতটা কাটল নির্বিঘ্নে—কতকগুলো সংঘর্ষর শব্দ ছাড়া। ভাসমান টুকরোগুলো যেন দমাদম ধাক্কা মারছে একটা আর একটাকে।

সকাল হতেই দেখা গেল, অবাক কাণ্ড! ঢেউয়ের তালে ঠোকাঠুকিই শুধু লাগেনি, গায়ে গায়ে সেঁটে গেছে ভাঙা টুকরোগুলো।

কমোডোরের খুব সুবিধে হল তাতে। নৌকোয় চেপে আর খাবার বিলি করতে হবে না।

বেলা ছুটোর সময়ে হঠাৎ ভীষণ সোরগোল শোনা গেল খণ্ডবিখণ্ড টুকরো-গুলোর ওপর। কী ব্যাপার? হঠাৎ এত আনন্দ কেন?

উত্তর-পূব দিকে কি যেন একটা দেখা গেছে! জাহাজ কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এই দিকেই আসছে জিনিসটা।

ঘণ্টা খানেক স্পষ্ট হল আগুয়ান বস্তুটা। চিনতে দেরী হল না কারোরই। স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডেরই স্টারবোর্ড বন্দর ফিরে আসছে তরতরিয়ে! হুররে—হুররে ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হল বিচ্ছিন্ন বন্দরকে। কাছে আসতেই পরিষ্কার হল রহস্য।

স্টারবোর্ডের ইঞ্জিনীয়ার ঝান্থ লোক। ইঞ্জিনের সামান্য চোট নিজেই মেরামত করে নিয়ে ফিরে আসছিল সবাইকে উদ্ধার করার জন্যে। কিন্তু আধ বর্গমাইল জায়গায় এত লোক উঠবে কি করে?

বুদ্ধি বাৎলালেন মেলকার্লির রাজা। চেন দিয়ে বড়-বড় টুকরো তিনটাকে গায়ে গায়ে বেঁধে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হল স্টারবোর্ডের পেছনে। পঞ্চাশ লক্ষ অশ্বশক্তি দিয়ে ভাসমান দ্বীপ খণ্ডগুলোকে টেনে নিয়ে চলল স্টারবোর্ড ইঞ্জিন—ঠিক যেন জলের ওপর ট্রেন চলছে।

পাঁচ দিন পর নউই এপ্রিল ডাঙা দেখা গেল। নিউজিল্যাণ্ডের শক্ত মাটি—স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের মাটির মত নড়বড়ে নয়।

এর পরের ঘটনা খুব ছোট্ট।

অকল্যাণ্ড দ্বীপে নেমেই আগে ডায়নাকে বিয়ে করে ফেলল ওয়াল্টার। বুদ্ধিমানের মত দুযোগের রাতে মূর্চ্ছিত ডায়নাকে কাঁধে নিয়ে স্টারবোর্ডে ঠাঁই নিয়েছিল সে। সেই থেকেই হাত ছাড়ে নি ডায়নার। গির্জেয় গিয়ে বিয়েটা চুকিয়ে ফেলার পর তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বেচারী।

জেম ট্যাঙ্কারডন আর ন্যাট কোভার্লি প্রমুখ বড়লোকদের সামান্য টাকাই খোয়া গেল স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ডের পেছনে। আমেরিকার ব্যাংকে মজুদ বাকী টাকা ওড়াবার জন্যে ফিরে গেলেন যে-যাঁর ঘরে।

কমোডোর সিমকো, কর্ণেল স্টুয়ার্ট কিন্তু পণ করলেন আর একখানা স্ট্যানডার্ড আয়ল্যাণ্ড বানাতেই হবে।

চার বাজনদার তেসরা মে পৌছোলো সানডিয়েগো। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাজাল তাদের অনবদ্য চেম্বার মিউজিক।

পৃথিবীর নবম আশ্চর্যের অত্যাশ্চর্য কাহিনী শেষ হয়ে গেল এই ভাবেই।

প্রশান্তের অশান্ত তরঙ্গে

[অ্যাড্রিফট ইন দি প্যাসিফিক

....

উত্তাল সমুদ্রে ডুবু-ডুবু হয়েও ঝড়ের মুখে ছুটে চলেছে একটি স্কুনার...কিন্তু একী? জাহাজের মাঝিমাল্লা আরোহী সবাই তো বাচ্ছা ছেলে! বয়স্ক লোক তো একজনও নেই!... অজানা দ্বীপে আছড়ে পড়ল স্কুনার...তারপর?

....

ঝড় উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝড় ওঠা মানেই মহাপ্রলয়কে যেন চোখের সামনে দেখা যায়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—পঞ্চভূত যেন একযোগে করতালি বাজিয়ে অট্ট-অট্ট হাসি হাসছে, তাণ্ডব নাচ নাচছে, বিজলীর মশাল নিয়ে লোফালুফি খেলছে। মসীময় গভীর রাতে এ-দৃশ্য বুক কাঁপিয়ে তোলে অতিবড় ডানপিটেরও।

উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে ডুবু-ডুবু হয়েও খসে পড়া তারার মত ছিটকে চলেছে একটা দ্বি-মাস্তুল স্কুনার জাহাজ। এত ছোট জাহাজ নিয়ে এতবড় সমুদ্রে কেউ বেরোয়না। এ-জাহাজটা কেন বেরিয়েছে, সে-রহস্য পরে প্রকাশ পাবে। জাহাজে বয়স্ক লোক একজনও নেই কেন, সে-রহস্যও নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে।

ডুবু-ডুবু জাহাজের পেছনের দিকে বসে কয়েকটি বাচ্ছা ছেলে। হাল ধরে বসে একজন মাওরী ছেলে। নাম মোকো। নিউজিল্যাণ্ডের বাসিন্দা। বয়স মাত্র তেরো।

সামনেই শুকনো মুখে বসে আরো তিনজন ছেলে। সব চাইতে বড় ছেলেটার বয়স মাত্র চোদ্দ। নাম, ব্রাণ্ট। বাকী দুজনের বয়স তেরোর বেশী নয়। নাম, গর্ডন আর ডোনাগান।

এক-একটা ঢেউ আসছে, ডেকের ওপর সটান আছড়ে পড়ছে ছেলেগুলো। মাথার ওপর ঢেউ চলে গেলেই ফের উঠে বসছে। মোকো কিন্তু নড়ছে না হালের চাকা ছেড়ে। এরকম দজ্জাল সমুদ্রও তাকে ঘায়েল করতে পারে নি। শুধু তার জন্যেই জাহাজটা এখনো ডুবে যায় নি।

প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আচমকা আছড়ে পড়ল ডেকের ওপর। চেঁচিয়ে উঠল ব্রাণ্ট। কিন্তু মোকো ঠিক সামলে নিল হাল ধরে। ঢেউ সরে যেতেই

খুলে গেল ডেকের একটা কামরার দরজা। ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল একটা কুকুর। মুখ বাড়ালো আরও দুজন ছেলেমানুষ। ভয়ে মুখ আমসি হয়ে গেছে তাদের। ব্রাণ্ট ধমকে ফের ঘরে ঢুকিয়ে দিল দুজনকেই।

সে দরজা বন্ধ হতে না হতেই খুলে গেল আরও একটি দরজা। বাক্সটার বলে একটা ছেলে বেরিয়ে এসে বললে—"ব্রাণ্ট, আমার সাহায্য দরকার হবে?"

ঝড়ের হুংকারের ওপর গলা তুলে ব্রাণ্ট বললে—"দরকার নেই। ছোটদের সামলাও। ক্রস, ওয়েব, সার্ভিস, ওয়েলকক্স থাকতেও বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে কেন?"

ঠেলেঠুলে সবাইকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে ওরা চারজনে রইল ডেকের ওপর। ঝড় ক্রমশঃ বাড়ছে। হঠাৎ মড়মড় করে ভেঙে পড়ল একটা মাস্তুল। পড়পড় করে ছিঁড়ে গেল ছোট মাস্তুলটার পাল। আরও অসহায় পড়ল ক্ষুদে জাহাজটা।

ঠিক এই সময়ে তেড়ে এল আর একটা ঢেউ। জাহাজ ধুইয়ে নিয়ে চলে গেল ঢেউটা—সঙ্গে নিয়ে গেল ভাঙা মাস্তুলটা। দেখা গেল মোকো হালে নেই!

সে কী! তলিয়ে গেল নাকি? ব্রাণ্ট আর একটু লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল জলে। এমন সময়ে চীৎকার শোনা গেল জাহাজের ওপর থেকেই।

ঝড়ের সেই গর্জনের মধ্যে আওয়াজ শুনে এগিয়ে গিয়ে ব্রাণ্ট দেখলে, মোকো বেচারী আটকে রয়েছে জাহাজের সামনের দিকের গলুইয়ের ফাঁকে। একটা বড়সড় পিপের তলায় পড়ে ছটফট করছে—উঠতে পারছে না।

টেনে তোলা হল মোকো-কে। ফের হাল ধরল সে। সারারাত লড়াই চলল এইভাবে। ভোরের দিকে ডাঙার রেখা দেখা গেল দূরে।

বালুর চড়া পর্যন্ত যেতে হল না। সিকি মাইল আগেই চোরা পাথরের খাঁজে বালির মধ্যে আটকে গেল স্কুনারটা!

এখন উপায়? ঝড় থেমে এলে কুয়াশা সরে গেলে জল্পনাকল্পনা আরম্ভ হল ছেলেদের মধ্যে। সংখ্যায় ওরা পনেরোজন। ব্রাণ্ট-ই সবচেয়ে বড়। বাকী সবাই ছোট। ব্রাণ্ট আর তার ভাই জ্যাক ফরাসী, গর্ডন আমেরিকান, বাকী সবাই ইংরেজ!

একদল ছেলে ব্রাণ্টের খবরদারি শুনতে চাইল না। জাহাজের একটি মাত্র নৌকো নিয়ে নেমে পড়তে চাইল দ্বীপে। এদের নেতা ডোনাগান। ইংরেজ বলেই ফরাসী ব্রাণ্টের মাতব্বরি সইতে সে নারাজ।

কিন্তু রুখে দাঁড়াল ব্রাণ্ট। নিজেই কোমরে দড়ি বেঁধে সাঁতরে যাওয়ার

চেষ্টা করল তীরভূমির দিকে। উদ্দেশ্য ছিল, ডাঙায় পৌঁছোনোর পড় দাঁড় ধরে জাহাজটাকেই টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু তা আর হল না। চোরা পাথরের ঘূর্ণিতে পড়ে নাকানি-চোবানি খেয়ে উঠে আসতে হল বেচারীকে। হাল ছেড়ে দিয়ে জুল জুল করে সবাই চেয়ে রইল দ্বীপের দিকে। একটা লম্বাটে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সবুজ বনের রেখা আর হলুদ বালির তট বর্ডারের মত ঘিরে রেখেছে পাহাড়টাকে। কিন্তু নামা যায় কি করে ? ভাগ্য ভাল, চোরা পাথরের খাঁজে বালির মধ্যে শুধু আটকেই গেছে জাহাজটা—তলা ভাঙে নি।

ঠিক এই সময়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। আচমকা একটা প্রকাণ্ড ঢেউ তেড়ে এসেই জাহাজটাকে তুলে ফেলল শূন্যে এবং মাথায় চাপিয়ে ফেলে দিয়ে গেল ডাঙায়।

কাৎ হয়ে পড়ে রইল দ্বি-মাস্তল স্কুনার। কারো গায়ে আঁচড়টি-ও লাগল না।

কিন্তু দুরন্ত দরিয়ায় এতগুলি ছেলে এল কি করে ?

জাহাজের দড়ি ছিঁড়ে। স্কুলের লম্বা ছুটিতে সবাই মিলে জাহাজে চেপে বেড়াতে বেরোবে ঠিক হয়েছিল। ছেলেদের বাবারাও থাকত জাহাজে। ক্যাপ্টেন, মেট, মাঝিমাল্লা জাহাজ চালাতো।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে ছিল ওদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। তাই ঝড় উঠল সে রাতে। ছেলেরা আগেভাগেই জাহাজে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বড়দের আসবার কথা পরদিন ভোরে। ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে জাহাজ ভেসে গেল বার দরিয়ায়।

প্রথম ঘুম ভাঙল মোকো-র। ছোকরা চাকর হলেও সে কাজের ছেলে। ডেকে তুলল ব্রাণ্টকে। ব্রাণ্ট দেখলে সর্বনাশ হয়েছে! এইটুকু জাহাজ নিয়ে শুধু নিউজিল্যাণ্ডের আশেপাশেই টহল দেওয়ার কথা—বার সমুদ্রে বেরোনোর কথা তো নয়।

ভয় পেলেও ঘাবড়াল না ব্রাণ্ট। একটা কাগজে সব কথা লিখে বোতলে পুরল এবং ভাসিয়ে দিল জলে। অথই জলে ঐটুকু বোতল কারও হাতে আদৌ পড়বে কিনা অনিশ্চিত—তবুও কর্তব্যে খুঁত রাখল না ব্রাণ্ট। তারপর শুরু হল ঝড়ের সঙ্গে টক্কর দেওয়া।

সমস্ত রাত উথালি-পাথালি তরঙ্গের নাগরদোলায় চেপে অবশেষে জাহাজ এসে কাৎ হয়ে পড়ল একটা অজানা দ্বীপে। দেখা যাক এরপর কিভাবে এই বিজন দ্বীপে মানিয়ে নিতে পারে নাবালক ছেলেগুলো।

এ বড় অদ্ভুত জায়গা তো? বালির চড়ার পরেই নদীর মোহানা। দূরে, পাহাড বন সবই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ থাকার কোনো চিহ্ন চোখে পড়ছে না। একটু-আধটু ধোঁয়া বা পাতায় ছাওয়া কুঁড়ে অথবা ভাসমান ডিঙি নৌকো দেখতে পেলেও বোঝা যেত, জংলী-টংলী এখানে আছে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

ছেলেরা হুঁশিয়ার হল তাই দেখে। অজানা জায়গায় অনেক রকম বিপদ থাকতে পারে। সুতরাং হুট করে জাহাজ থেকে নেমে পড়াটা ঠিক হবে না। থাকবার মত ভাল জায়গা যদ্দিন না পাওয়া যাচ্ছে, কাৎ-হওয়া জাহাজেই রাত কাটাতে হবে।

জাহাজে খাবার-দাবাবের অভাব নেই। টিনভর্তি মাছ-মাংস বিস্কুট লজেন্স তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে বন্দুক রাইফেল পিস্তল গোলা-বারুদ। যন্ত্রপাতিরও অভাব নেই। সুতরাং ভাবনা কিসের?

মোকো একাই রান্না করে খাইয়ে দিল ছেলেদেব। রাতটা ভালই কাটল।

পরদিন সকালে ব্রাণ্ট বললে—"ভাখো হে, খাবার দাবার জুটিয়ে নিয়ে খেতে হবে এখন থেকে। ভাঁড়ারের খাবারে হাত দেওয়া হবে না। কপালে কি লেখা আছে, তা যখন জানা নেই। তখন বুঝে সুঝে চলা ভাল।"

মতলব মনে ধরল সবার। বেলাভূমি থেকে ঝিনুক কুড়িয়ে আনা হল বিস্তর। ঝিনুকের শাঁস রান্না কবলে তোফা ঝোল হবে। ঝিনুক কুড়োতে গিয়েই বুনো পায়রার ডিমও চোখে পড়ল। ঠিক হল পরে কুড়িয়ে আনা যাবে।

খেয়ে দেয়ে বিকেল বেলা আবার সবাই বেবোলো মাছ ধরতে। জাহাজেই ছিপ বঁড়শী সবই ছিল। অল্প চেষ্টাতেই নদীর জল থেকে পাওয়া গেল বেশ কয়েকটা বড় মাছ।

সে-রাতে বড়রা পালা করে জেগে পাহারা দিলে ছোটদের।

পনেরো জনের মধ্যে ব্রাণ্ট, ডোনাগান আর গর্ডনের বয়সই যা একটু বেশী। দায়ীত্বও বেশী। বিজন দ্বীপে এতগুলি খোকাদের নিয়ে যত দুর্ভাবনা যেন ওদেরই। রোজই খাবার খুঁজতে বেরোয় ওরা বনে-জঙ্গলে। কখনো মাছ আনে, কখনো বুনো পায়রার মাংস বা ডিম। কিন্তু একটা রহস্যের সমাধান এখনো হয়নি। এ-জায়গাটা সত্যিই দ্বীপ, না, মহাদেশ, এখনো জানা যায় নি। দ্বীপ হলে মুস্কিল। চারিদিকে জল ঘেরা থাকবে। মুক্তি পাওয়া যাবে না। মহাদেশ হলে সে বিপদ নেই। ঠিক হল, একদিন উঁচু পাহাড়টায় উঠে দেখে আসতে হবে এটা দ্বীপ না মহাদেশ।

ইতিমধ্যে একটা মজার ব্যাপার ঘটল। নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে একটা পেল্লায় কচ্ছপের পিঠে চেপে বসল ইভারসন আর কোষ্টার। অন্যান্য ছেলেরা মুখের দুপাশে দড়ি লাগিয়ে লাগামের মত টেনে রাখল কচ্ছপকে। কিন্তু আশ্চর্য শক্তি বটে সমুদ্রের ঘোড়ার! সবাইকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল জলের দিকে।

শেষকালে ব্রান্টের হুকুমে মোকো আর সার্ভিস কাঠের ডাণ্ডা নিয়ে এল জাহাজ থেকে। তাই দিয়ে চাড় মেরে উল্টে দিতেই চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল কচ্ছপ বাবাজী।

মোকোর ফুর্তি তখন দেখে কে! কচ্ছপের মাংস যে খেতে ভারী মিষ্টি! কুড়ুল হাতেই ছিল। তক্ষুণি সেই কুড়ুলের কোপে স্বর্গে রওনা হল কচ্ছপ মহাশয়—দেহখানিকে টুকরো টুকরো করে কেটে জাহাজে নিয়ে এল ছেলেরা। নুন মাখিয়ে রেখে দেওয়া হল অনেকদিন ধরে খাওয়ার জন্যে।

এপ্রিল মাসেব গোড়ার দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতেই অভিযানে বেরোলো ডোনাগান, ব্রাণ্ট, সার্ভিস আর উইলকক্স। সঙ্গে রইল কচ্ছপের মাংস আর বন্দুক। কুকুর ফ্যান-ও রইল সঙ্গে সঙ্গে।

সমুদ্রের ধার থেকে জঙ্গলে ঢুকে কিছুদূর যেতেই নদী পেরোতে হল। নদীর জল বেশ পরিষ্কার। তলার নুড়ি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। হাঁটুজলও নেই। কিন্তু কী আশ্চয! কে যেন নদী পারাপারের সুবিধের জন্যে পাশা-পাশি একরাশ পাথর সাজিয়ে রেখেছে এখানে।

দেখেই খটকা লাগল ছেলেদের। মানুষের কীর্তি মনে হচ্ছে?

সেদিন দুপুরে কচ্ছপের মাংস খেয়ে পেট ভরাতে হল। রাতে একটা প্রকাণ্ড গাছের ফাঁকে ঝুপড়ির মত জায়গার নীচে রাত কাটাল চার জনে। ভোরবেলা ঘুম থেকে আগে উঠল সার্ভিস। উঠেই সেকী চীৎকার—"একী! একী! এ যে সত্যিই কুঁড়ে ঘর।"

ধড়মড় করে উঠে পড়ল বাকী তিন জনে। দেখলে, সত্যি সত্যিই ওরা রাত কাটিয়েছে একটা কুঁড়ে ঘরের তলায়। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা বানাতে পারে এ-ধরনের কুঁড়ে। নাম, অ্যাজুপা। কুঁড়ের দেওয়াল বলতে কিছু নেই। চালাটা লাগানো থাকে গাছের গায়ে!

আশ্চর্য! মানুষ তাহলে আছে এ-জায়গায়?

হাঁটতে হাঁটতে ঝোপঝাড় পেরিয়ে ওরা এবার এসে পৌছোলো দিগন্ত-বিসারী জলরাশির সামনে। তার মানে, জায়গাটা সত্যিই দ্বীপ। সমুদ্র দিয়ে ঘেরা!

দমে গেল ছেলেরা। খেয়ে দেয়ে নিল পাড়ে বসে। ফ্যান কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল মাংস খাবার পর। দৌড়ে গিয়ে চক-চক করে জল খেতে লাগল সমুদ্রের!

চোখ কপালে উঠল চার ডানপিটেদের! সমুদ্রের জল তো লোনা জল। কুকুর খায় কি করে? উইলকক্স দৌড়ে গিয়ে খানিকটা জল মুখে দিয়ে বললে—"আরে! এ যে মিষ্টি জল!"

অর্থাৎ, বিপুল এই জলরাশি সমুদ্র নয়—হ্রদ। এত বড় যে সমুদ্র বলে মনে হয়েছিল।

রাত কাটানো হল জঙ্গলের মধ্যেই। পরদিন পাথরের খাঁজে একটা ভাঙা নৌকো পাওয়া গেল। রোদে জলে সে নৌকোর আর নৌকোত্ব নেই। নদী এখান থেকে কাছেই। কিন্তু নৌকোর মালিক কোথায়?

হঠাৎ চোখ পড়ল একটা প্রকাণ্ড বীচ গাছের গায়ে। ছুরী দিয়ে খোদাই করা দুটি অক্ষর আর একটা ইংরেজী সাল: F B. 1827

ফ্যানের মেজাজ বিগড়ে গেল এইখান থেকেই। শুরু হল হাঁকডাক আর ছুটোছুটি। পেছন পেছন গিয়ে পাওয়া গেল একটা পর্বত গহ্বর। মুখটা সরু হলেও ভেতরটা বেশ বড় হল ঘরের মত। মেঝেতে বালি আর পাথর ছড়ানো। 'এক কোনে কাঠের সিন্দুক ভর্তি জীর্ণ জামা-কাপড়, টেবিল, বাসন-কোসন, খাট। শুধু যা মানুষটা নেই। খাটে চাদর পাতা—মালিক নেই।

মালিককে পাওয়া গেল গুহার বাইরে—একটা পেল্লায় বীচ গাছের তলায়। ঘেউ ঘেউ করে ছোট মনিবদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ফ্যান।

দেখেই শিউরে উঠল চার ডানপিটে। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে একটা মানুষের কংকাল। ঝকঝক করছে সাদা হাড়গুলো। যেন দাঁত খিঁচিয়ে হাসছে!

বটে! এই গুহা, জিনিসপত্র, নৌকো—সবই এই লোকটার। মরে ভূত হয়ে গেছে কোন কালে। গাছের গায়ে সালটা খুদে গেছে বলেই বোঝা যাচ্ছে প্রায় বছর তিরিশ আগে বেঁচে ছিল বেচারী।

কিন্তু কে সে? কি নাম তার? বাড়ী কোথায়?

জিনিসপত্র হাঁটকে জানা গেল প্রশ্নের উত্তরগুলো। একটা রুপোর ঘড়ি পাওয়া গেল। কাঁটাগুলো সোনার তৈরী। ভেতরের ডালায় এক ফরাসী ঘড়ি নির্মাতার নাম খোদাই করা। একটা জীর্ণ ডাইরীর প্রথম পাতায় লেখা একটা নাম—ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ। অর্থাৎ লোকটা জাতে ফরাসী। জাহাজ-ডুবি হয়ে উঠেছিল এই দ্বীপে।

একটা বড় ম্যাপ পাওয়া গেল। ফ্রাঁসোয়ার নিজের হাতে আঁকা অতি যাচ্ছেতাই ম্যাপ। গাছের ছালের ওপর লতা-পাতার রস দিয়ে কোন মতে আঁকা। ম্যাপ দেখেই বোঝা গেল, এটা দ্বীপ। আয়ত আকার। লম্বায় মাইল পঞ্চাশেক। চওড়ায় মাইল পঁচিশ। ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড হ্রদটা। লম্বায় তা প্রায় মাইল পনেরো—চওড়ায় মাইল সাত আট। অতবড় বলেই সমুদ্র বলে মনে হয়ে ছিল।

কিন্তু দ্বীপটা পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে বোঝা গেল না। দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি নয় তো?

গুহার মধ্যে একটা ছুরী ছাড়া ধারালো অস্ত্র আর নেই। বন্দুকও নেই। কিন্তু বন্দুকের অভাব মিটিয়ে ছিল দুটো অদ্ভুত জিনিস দিয়ে। একটার নাম 'বোলা'। দুটো লোহার বল একটা লম্বা দড়ির দুদিকে বাঁধা। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা এই 'বোলা' ছুঁড়ে জন্তু জানোয়ারকে নাগপাশে বেঁধে ফেলে—জ্যান্ত বন্দী করে। আর একটা জিনিস হল, দড়ির একটা ফাঁস। নাম, 'ল্যাসো'। এটিও আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের অস্ত্র। ছুটন্ত জন্তু জানোয়ারকে জ্যান্ত ধরার পক্ষে অতুলনীয়।

ফ্রাঁসোয়াকে গাছের তলায় কবর দিয়ে ওরা ফিরে এল জাহাজে। নদীর ধার দিয়ে এল বলে বেশী ঘুরতে হল না। রাতে দেখা গেল আকাশে তারাবাজির খেলা।

হাউই ছুঁড়ে পথের নির্দেশ দিচ্ছে গর্ডন!

পরের দিন ব্রাণ্ট বলল মানুষের কংকাল পাওয়ার রোমাঞ্চকর কাহিনী। সবশেষে বললে—"শীত আসার আগেই ঐ গুহায় উঠে যাওয়া দরকার। জাহাজে থাকা ঠিক হবে না।"

গর্ডন রাজী হল। বাকী সকলে সায় দিলে। কিন্তু জাহাজ ভর্তি জিনিসপত্র সে গুহায় নিয়ে যাওয়া যায় কি করে?

ঠিক হল, একটা ভেলা বানাতে হবে জাহাজের তক্তা খুলে নিয়ে। শুরু হল সাঁড়াশি, শাবল, হাতুড়ি দিয়ে তক্তা খোলার পালা। কিন্তু কয়েক খানা কাঠ খুলেই কালঘাম ছুটে গেল বেচারীদের। বেশ বোঝা গেল, পুরো জাহাজটাকে ভাঙতে গেলে মাস কয়েক লাগবে।

বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন ওদের কষ্ট দেখে। এপ্রিলের শেষের দিকে ঝড় উঠল। অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। জাহাজ ভাঙতে হবে বলে দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে ছেলেরা জঙ্গলের ধারে তাঁবু পেতে রাত কাটাচ্ছিল

বলেই রক্ষে। সকাল বেলা এসে দেখলে পাগলা ঝড় চারদিক তছনছ করে গেছে—জাহাজটাকে ভেঙেচুরে বালির ওপর ছড়িয়ে রেখেছে।

দিন কয়েকের মধ্যেই তৈরী হয়ে গেল তিরিশ ফুট লম্বা আর পনেরো ফুট চওড়া একটা ভেলা। তার ওপর জাহাজের মালপত্র চাপিয়ে নদীর ওপর দিয়ে টেনে আনা হল পাহাড়ের গুহায়। জাহাজের পেতলের কামান দুটিকে পযন্ত এনে বসিয়ে দেওয়া হল গুহার দরজার দুপাশে। যেহেতু এক ফরাসী নাবিক এখানে দেহ রেখেছেন, তাই গুহার নাম রাখা হল—ফরাসী গুহা।

মেঝের ওপর কাঠের পাটাতন বিছিয়ে তার ওপর বিছানা পেতে দেওয়া হল পনেরো জনের। ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রকোপ এখানে নেই—শীতকালে জমে যাওয়ার দুশ্চিন্তাও নেই।

শীতের ভয় ব্রাণ্টের মনে দেখা দিয়েছিল নদীপথে আসবার সময়ে। নদীর জলে বরফ ভাসতে দেখেছিল সে। শীত আসতে না আসতেই যেখানে বরফ ভাসে, শীত এলে সেখানে তো সবই জমে যাবে।

জাহাজের পতাকাটা মাস্তুল সমেত পুঁতে রাখা হল সমুদ্রতীরে। দূর দিয়ে জাহাজ গেলে যেন দেখতে পায়।

দিব্বি হৈ-হৈ করে দিন কাটতে লাগল বাচ্চাদের। এ-এক দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। প্রতিদিনই বনভোজন হচ্ছে বলা যায়। বনের পাখী মেরে এনে রান্না হচ্ছে। তাই খেয়ে বনের মধ্যেই ছুটোছুটি খেলা—মন্দ কী?

একদিন একটা ফাঁদ দেখা গেল বনের মধ্যে। মানুষের পাতা ফাঁদ। ওপরে কাঠকুটো পাতা। ভেতরে একটা হিংস্র জন্তুর কংকাল। চোয়াল আর দাঁত দেখলেই বোঝা যায় মাংসাশী জন্তু। ফাঁদে ধরা পড়ার পর না খেয়ে মারা গেছে।

ফাঁদটা নতুন করে পেতে রাখবার পর একদিন একটা এমূ পাখী ধরা পড়ল। অনেকটা উটপাখীর মত দেখতে। মুখটা প্রকাণ্ড মুরগীর মত। ভয়ানক শক্তিশালী।

সার্ভিস বললে—"'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' বইতে পড়েছি উটপাখী খুব পোষ মানে। আমিও এর পিঠে চড়ব।"

উইলকক্স লাফিয়ে নামল গর্তের মধ্যে। চক্ষের নিমেষে গায়ের কোট দিয়ে 'এমূ'র মুখ ঢেকে দিতেই ছটফটানি বন্ধ হল তার। তারপর দড়ি দিয়ে পা আর গলা বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হল ফরাসী গুহায়।

দিন কয়েক পরে ঠিক হল, এ-ঘরে আর কুলোচ্ছে না। ঘরটা একটু

বাড়িয়ে নেওয়া দরকার। একদিকের দেওয়াল চুনাপাথর দিয়ে তৈরী। খুব নরম। ছুরী দিয়ে কচকচ করে কাটা যায়। সেইদিকের দেওয়াল কেটেই ঘর বাড়ানোর চেষ্টা শুরু হল। কিন্তু দিন কয়েক পরেই আরম্ভ হল ভূতের উপদ্রব।

সুড়ঙ্গটা তখন চার পাঁচ ফুট লম্বা হয়েছে। এক মনে গাঁইতি চালাচ্ছে ব্রাণ্ট, আচমকা গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল অদ্ভুত একটা কান্না শুনে। গুঙিয়ে গুঙিয়ে কে যেন দেওয়ালের মধ্যে কাঁদছে!

ওরে বাবা! ছুটে বেরিয়ে এল ব্রাণ্ট। গর্ডন আর বাক্সটার শুনে দৌড়ে গেল সুড়ঙ্গের মধ্যে। দুজনেই বেরিয়ে এল মুখ কালো করে। সত্যি সত্যিই কে যেন কাঁদছে দেওয়ালের মধ্যে।

পনেরো জনের প্রত্যেকেই শুনে এল সেই কান্না। সারারাত ভয়ের চোটে ঘুমোতে পারল না বাচ্চারা। কিন্তু কী আশ্চয! দেওয়ালের ভূত-ও যেন ঘুমিয়ে পড়ল রাত্তিরবেলা। ভোর হতেই আবার শুরু হল ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না!

গর্ডন বললে—"পাহাড়ের গায়ে কোনো ফাটল নেই তো? চলো তো গুহার মাথায় গিয়ে দেখে আসি।"

গেল সবাই। পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত দেখে এল। কিন্তু ঝর্ণা বা ফাটল চোখে পড়ল না।

বিকেলবেলা ফিরে আসার পর দেখা গেল, ফ্যান উধাও হয়েছে!

রাত দুটোর সময়ে অপার্থিব কণ্ঠে কে যেন ককিয়ে উঠল সুড়ঙ্গের মধ্যে দেওয়ালের ভেতর থেকে। তারপর সব চুপ!

মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল পনেরো জনের নিশীথ রাতের সেই রক্ত জল করা চীৎকার শুনে।

পরদিন সকাল হতেই ফের শাবল দিয়ে সুড়ঙ্গ বাড়িয়ে চলল ব্রাণ্ট। আচমকা একটা বিরাট চাঙর ভেঙে পড়ল ভেতর দিকে—ফুটো দিয়ে হাতের শাবলটাও পড়ে গেল ওদিকে।

আর ঠিক তখনি দেওয়ালের গর্ত দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা জন্তু। হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল বাচ্চারা। জন্তুটা কিন্তু সোজা দৌড়ে গিয়ে চকচক করে জল খেতে লাগল জলের পাত্র থেকে।

এবার দেখা গেল জানোয়ারটাকে। ফ্যান—ওদেরই কুকুর!

এ আবার কি রহস্য! দেওয়াল ফুঁড়ে ফ্যান গেল কি করে ওদিকে? তবে কি গোপন সুড়ঙ্গ আছে কোথাও? লণ্ঠন জ্বালিয়ে সন্তর্পণে ভেতরে পা দিল

ব্রান্ট। পেছন পেছন অন্য সবাই। আচমকা হোঁচট খেয়ে একটা কনকনে ঠাণ্ডা মড়ার ওপর আছড়ে পড়ল উইলকক্স!

আঁৎকে উঠে তড়াক করে লাফ দিয়ে ছিটকে এল উইলকক্স। লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড শেয়াল। টুঁটি ছিন্ন ভিন্ন। মরে কাঠ হয়ে গেছে।

এতক্ষণে বোঝা গেল দেওয়ালের মধ্যে কান্নাকাটি আর ভয়ংকর চীৎকারের রহস্য। বাইরে থেকে এই বন্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে নিশ্চয় একটা যাতায়াতের পথ আছে। বাতাস আসছে সেইখান দিয়েই—তাই লণ্ঠন জ্বলেছে অত সহজে-- বিষাক্ত গ্যাস থাকলে নিভে যেত।

বাইরের বাতাস ঐ পথ দিয়ে এঁকে বেঁকে ভেতরে ঢুকে বাঁশি বাজাত। দেওয়ালের ওপরে থেকে মনে হত ভূতে কাঁদছে। শ্বান সেই সুড়ঙ্গ পথেই এখানে এসেছিল। শেয়ালটাকে সে-ই ঘায়েল করেছে রাত ছুটোর সময়ে। তারপর আর বেরোতে পারেনি—খুব সম্ভব বেরোনোর পথ পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। তাই তেষ্টার চোটে ছুটে গিয়ে আগে জল খেয়েছে সে।

কিন্তু কোথায় সেই গর্ত? কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পাওয়া গেল বাইরে— একটা ঝোপের আড়ালে। সত্যিই পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে মুখটা।

নতুন গুহাটা আকারে প্রথম গুহার ডবল। আগাগোড়া গ্র্যানাইট পাথরের তৈরী। শোওয়ার ব্যবস্থা হল এই ঘরেই। রান্নাঘর রইল সামনের ঘরে। গুহার মুখে বসল দরজা—দেওয়াল খুঁড়ে তৈরী হল ছুটো ঘুলঘুলি।

সার্ভিসের একটা সখ কিন্তু মিটল না। উটপাখীর পিঠে চড়ল বটে—কিন্তু পাখী আর নড়ল না। খুব সম্ভব কোট ঢাকা থাকায় দেখতে পাচ্ছিল না বলেই নড়ছিল না। সার্ভিস তার চোখের ঢাকনি খুলে দিতেই ঘটল বিপত্তি।

নক্ষত্রবেগে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হল 'এমু' পাখী। আছড়ে পড়ল সার্ভিস। হাড়গোড় না ভাঙলেও গতরে ব্যথা রইল অনেকদিন।

নভেম্বর মাসে পাঁচজনের একটা ছোট্ট দল বেরোলো দ্বীপ দেখতে। সঙ্গে রইল ক্যান আর রবারের একটা ভাঁজ করা নৌকো। বন্দুক, ছোরা আর রেড ইণ্ডিয়ানদের সেই ছুটো আজব অস্ত্র—বোলা আর ল্যাসো। বাক্সটার এই ছুটি হাতিয়ার বেশ রপ্ত করে নিয়েছিল বলেই জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে এল ছুটো পাহাড়ী ছাগলের বাচ্চা তার একটা ঘোড়ার মত নিরীহ জন্তু। নাম, গুয়োনাকা। উটের মত অনেকটা দেখতে হলেও গুয়োনাকো পোষ মানবে ঘোড়ার মতই।

বাক্সটারের সাফল্যে ধন্যি-ধন্যি রব উঠল ফরাসী গুহায়।

পোষা জানোয়ার থাকলেই খোঁয়াড় দরকার। সেটাই বা বাদ যায় কেন? ফরাসী গুহায় র‍্যাদা, করাত, পেরেক, হাতুড়ি আছে। বনে গাছপালার অভাব নেই। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই ছেলের দল একটা জন্তুদের বড়সড় ঘর বানিয়ে ফেলল। গুয়োনাকো আর ছাগলদের রাখা হল সেখানে। ফাঁদের মধ্যেও একটা গুয়োনাকো, দুটো ছাগল আর একটা উটপাখী ধরা পড়েছিল। তাদেরও ঢোকানো হল খোঁয়াড়ে। এমন কি পাখী পর্যন্ত ধরা দিতে লাগল ফাঁদের মধ্যে। সব পাখী না মেরে ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দেওয়া দরকার। তার মানে একটা পাখীর খাঁচা-ও দরকার। জাহাজ থেকে আনা লোহার জাল দিয়ে তৈরী হল পাখীর খাঁচা। হাঁস আর পায়রার ডিমে ভরে উঠল খাঁচা। গুহার দুপাশে সব্জির চাষ করা হয়েছিল। সেখানেও আনাজ ফলছে বিস্তর। সুতরাং না খেয়ে মরবার ভয় আর নেই।

কিন্তু যদি গুলি বারুদ ফুরিয়ে যায়? মোকো তাই বললে—"তোমরা এত করছো, খান কয়েক তীর ধনুক বানিয়ে নিতে পারছো না?"

কথাটা মনে ধরল সকলের। তক্ষুনি নদীর ধারে গিয়ে নলখাগড়ার বন থেকে তীর খুঁজে আনা হল। অ্যাশ গাছের ডাল দিয়ে তৈরী হল ধনুক—লতা দিয়ে ছিলে। দুদিনেই তীর-ধনুক ছুঁড়ে পাখী-শিকারে পোক্ত হয়ে উঠল বাক্সটার, ক্রশ, উইলকক্স।

এই সময়ে একটা মস্ত বড কাজে হাত দিল ডোনাগান। শীত এল বলে। ফরাসী গুহায় বাতি জ্বালানোর জন্যে প্রচুর তেল দরকার। সীলের চর্বি থেকে সেই তেল বানিয়ে নিলে কেমন হয়?

আরম্ভ হল সীল অভিযান। কাঠ কেটে একটা গাড়ী তৈরী হল। চাকাওলা গাড়ী। দু দুটো গুয়োনাকা খালি পিপে ভর্তি গাড়ীটাকে টেনে নিয়ে চলল সমুদ্রের ধারে। ছোট ছেলেরাও চলল সঙ্গে। এতবড় একটা শিকার-দৃশ্য কে না দেখতে চায়?

অনেক দূরে একটা উপসাগরের তীরে দলে দলে সীল মাছ রোদ পোহাচ্ছিল। সব মিলিয়ে গোটা পঞ্চাশেক তো হবেই। ওরা জঙ্গলের আড়ালে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়াল সীলদের। তারপর ডোনাগানের হুকুম পাওয়া মাত্র শুরু হল গুলিবর্ষণ।

একটা গুলিও ফস্কাল না। ডোনাকান বন্দুক ফেলে রিভলবার হাতে তাড়া করল সীলদের পেছনে। তিরিশটা সীল মাছ পড়ে রইল বালিতে। বাদবাকী মুখ তুলে ল্যাজ নেড়ে পালিয়ে গেল জলে।

তখনকার মত সবাই ফিরে এল নদীর ধারে। স্নান করে জিরিয়ে নিয়ে

ফের গেল সীল-সৈকতে। শুরু হল কাটাকুটির পালা। মাংস কেটে বার করতে গিয়ে চর্বিতে আর রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল প্রত্যেকেই। মোকো পাথরের উনুন সাজিয়ে কড়াতে জল বসিয়ে দিলে। জল ফুটতেই মাংস সমেত চর্বির ডেলা ফোটানো হল তাতে। কিছুক্ষণ পরেই মোটা তেল ভেসে উঠল ওপরে। আর সে কী দুর্গন্ধ!

নাক টিপে হাতায় করে সেই তেল নিয়ে ভরা হতে লাগল একটার পর একটা পিপেতে। সেদিন কাজ শেষ হল না। পরের দিন বিকেল নাগাদ দেখা গেল মোট বারো পিপে তেল পাওয়া গেছে। এবার আসুক শীত, আসুক শৈত্য—ভয় কিসের?

ডিসেম্বরে বড়দিন। জাহাজের তক্তা দিয়ে স্টেজ বানিয়ে নাটক অভিনয় করল ছেলেরা। সারাদিন ক্রিকেট আর ফুটবল খেলা হল খোলা জায়গায়।

দশ মাস কাটল দ্বীপে। কিন্তু একটা জাহাজও গেল না পাশ দিয়ে। আদৌ আসবে কী?

শীত আসার আগে আর একটা কাজ সেরে এল ব্রাণ্ট। গর্ডনকে একদিন বললে—"দেখো, দ্বীপের পূবদিকে কি আছে, এখনো আমরা নিজের চোখে দেখিনি। ফ্রাঁসোয়ার ম্যাপে বলছে সমুদ্র আছে, তবুও নিজে দেখতে চাই। রাজী?"

"নিশ্চয়," বললে গর্ডন। তাই ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে মোকো আর সহোদর ভাই জ্যাক-কে নিয়ে নৌকোয় চেপে বসল। কিছুক্ষণ পরেই হ্রদে এসে পড়ল নৌকো। তারপর পূবদিকে যেতেই পাওয়া গেল আর একটা নদী। সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই নদী দিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখা গেল গুহার পর গুহা। প্রকৃতি এদিকে পাথর সাজিয়ে খান বারো বড় বড় ঘর রেখে দিয়েছেন অতিথিদের জন্যে। ওদের জাহাজ যদি এদিকে ভাঙতো, গৃহসমস্যা আর থাকত না।

মরুভূমির মত রুক্ষ প্রান্তরে বালি আর পাথর ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। দ্বীপের মাঝখানটাই কেবল উর্বর—হ্রদ আছে বলে। আশপাশে শুধু বালি আর কাঁকর।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক—"ওকী! ধোঁয়ার মত কি যেন দেখা যাচ্ছে না!"

চমকে উঠল ব্রাণ্ট। চোখে দূরবীন লাগিয়ে তাকাল পূবদিকে। সমুদ্র যেখানে আকাশে মিশেছে, সেখানে আবছা মত। অস্পষ্ট কুয়াশার মত কি যেন রয়েছে। ধোঁয়া নয়—অন্য কিছু?

রাত নামল। রান্নায় বসল মোকো। খাওয়া-দাওয়ার পর দুই ভাইকে ধারে-কাছে না দেখতে পেয়ে একটু খটকা লাগল ওর। এমন সময়ে কানে একটা শব্দ ভেসে এল। কে যেন কোথায় কাঁদছে।

পা টিপে টিপে উঠে গেল মোকো। শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে দেখলে, একটা গাছের তলায় গম্ভীর মুখে বসে ব্রাণ্ট। পায়ের কাছে বসে ঝরঝর করে কাঁদছে জ্যাক।

দু' চারটে কথা শুনেই পরিষ্কার হয়ে গেল কান্না-রহস্য। ফিরে এল পা টিপে টিপে।

জোয়ার আসতেই দু' ভাই ফিরে এল নৌকোয়। মোকো চুপি চুপি বললে ব্রাণ্টকে—"আমি সব শুনেছি। জ্যাক-কে তুমি ক্ষমা করো।"

দারুণ চমকে উঠল ব্রাণ্ট—"শুনেছো? কিন্তু আমি ক্ষমা করলেও আর কেউতো করবে না।"

"কেউ না জানলেই হল। আমি কাউকে বলব না," বলল মোকো।

এবার শুরু হল দলাদলি। পনেরোজনের মধ্যে একজনকে নেতা করা দরকার। যার কথা সবাই শুনবে। ডোনাগানের ইচ্ছে ছিল নিজে হওয়ার। কিন্তু প্রথম বছর সবাই চেয়েছিল গর্ডনকে। দ্বিতীয়বার চাইল ব্রাণ্টকে। ভোট নিয়ে দেখা গেল ডোনাগানের পক্ষে ভোট দিয়েছে মাত্র তিনজন। তখন থেকেই এই তিনজনকে নিয়ে দল ছেড়ে যাওয়ার প্ল্যান আঁটতে লাগল ডোনাগান। কথায় কথায় ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেল ব্রাণ্টের সঙ্গে।

এই সময়ে একটা ভীষণ উত্তেজনার ঘটনা ঘটল দ্বীপে। শীতের বরফে সারা দ্বীপ তখন ছেয়ে গেছে। বরফের প্রান্তরে লোহার জুতো পরে ছুটে চলার মত মজা আর নেই। স্কেটিং বিদ্যায় সবচাইতে পোক্ত জ্যাক। ক্রস আর ডোনাগানও কম যায় না। জাহাজে স্কেটিং-য়ের সব সরঞ্জামই ছিল। সুতরাং কুয়াশা ঢাকা ঐ অন্ধকার প্রান্তরেই শুরু হল ছুটোছুটির খেলা। দেখতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল জ্যাক, ডোনাগান আর ক্রস।

কিছুদূর গিয়েই ডোনাগান ক্রসকে টেনে নিয়ে গেল উল্টো দিকে—বুনো-হাঁসের সন্ধানে। জাগুয়ারের সামনে পড়ার ভয় আছে জেনেও যেতে ছাড়ল না।

জ্যাক ফিরে এল একটু পরেই। কিন্তু ওরা দুজন আর ফিরল না। জ্যাক আর দাঁড়াল না। বাঁশি বাজাতে বাজাতে ফের ছুটল ওদের সন্ধানে। কিছুক্ষণ পর জ্যাক পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

এবার ভয় পেল প্রত্যেকেই। নিশ্চয় অন্ধকারে পথ হারিয়েছে তিনজনে। এখন উপায় ?

"দাগো কামান।" বলল ব্রাণ্ট।

তৎক্ষণাৎ বারুদ ঠেসে পরপর দুটো কামান দাগল বাম্নটার। অনেক মাইল দূরেও ভেসে গেল ভয়ংকর সেই শব্দ। কিন্তু কেউ ফিরল না।

দশ মিনিট পর আবার কামান ছোঁড়া হল। এবার দূর থেকে ভেসে এল বন্দুকের জবাব। তারপরেই কুয়াশার মধ্যে থেকে নক্ষত্রবেগে বেরিয়ে এল দু'দুটো ছায়ামূর্তি! ডোনাগান আর ক্রস। জ্যাক নেই!

ব্রাণ্ট বললে—"আমি যাব জ্যাক-কে খুঁজতে।" গর্ডন ওকে জোর করে আটকে রেখে আগুন জ্বালল নিশানা করার জন্যে। শুকনো কাঠের আগুন লক লক করে লাফিয়ে উঠল অনেক ওপরে।

আচম্বিতে দেখা গেল একটা দ্রুত সঞ্চরমান ছায়ামূর্তি। উল্কাবেগে ছুটে আসছে কুয়াশার মধ্যে থেকে। জ্যাক আসছে! জ্যাক! পেছনে পেছনে দানবাকৃতি দুটো জানোয়ার তেড়ে আসছে ওকে ধরবার জন্যে।

"ভালুক! ভালুক!"

হ্যাঁ, ভালুক তাড়া করেছে জ্যাক-কে। ধরে ফেলল বলে। সহসা ডোনাগান স্কেটিং করে ছিটকে গেল বরফের ওপর দিয়ে। পর-পর দুটো গুলিতে শুইয়ে দিল ভালুক দুটোকে!

ফিরে এলে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল ব্রাণ্ট—"ধন্যবাদ ডোনাগান আমার ভাইকে বাঁচানোর জন্যে।"

পাথরের মত মুখ করে ডোনাগান বললে—"আমার কর্তব্য আমি করেছি।

এর পরেই ওরা চারজন আলাদা হয়ে গেল দল থেকে। মনকষাকষি চলছিল অনেকদিন থেকেই। কথা কাটাকাটি থেকে শেষকালে হাতাহাতি পর্যন্ত না গড়ায়—এই ভয়েই বোধহয় অনেকদিন থেকেই ডোনাগান ওর তিন প্রাণের বন্ধুকে নিয়ে শলাপরামর্শ করত। ফ্রাঁসোয়ার আঁকা বিদঘুটে ম্যাপটাকেও নকল করে নিয়েছিল। তাই ভালুকের তাড়া খাওয়ার মাস দেড়েক পরে নউই অক্টোবর চারজনে বেরিয়ে এল দল থেকে।

চারজন মানে, ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স। মতলব ঠিক করা ছিল আগে থেকেই। ওরা থাকবে দ্বীপের পূবদিকে। নদীর ধারে বনজঙ্গলে শিকার মিলবে। ঐ দিকেই আমেরিকা। জাহাজ যেতেও পারে দূর দিয়ে। নিশানা করা যাবে পাড় থেকে।

ফরাসী গুহায় আসার পর থেকেই দ্বীপের নানান জায়গার এক-একটা নাম দিয়েছিল ছেলেরা। যেমন, হ্রদের নাম ফ্যামিলি লেক, পশ্চিমদিকের নদীর নাম জিল্যাণ্ড রিভার, পূবদিকের নদীর নাম ঈষ্ট রিভার। গোটা দ্বীপটার নাম হয়েছিল চারম্যান আয়ল্যাণ্ড—যেহেতু ওরা চারম্যান স্কুলেই পড়ত একসঙ্গে।

চারজন দলছাড়া ছেলে এল এই ঈষ্ট রিভারের দিকে। ক্ষিদে পেলে বালি-হাঁস শিকার করে নিয়ে ঝলসে নিল আগুনে। ঘুমোলো গাছের তলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে। পথে একটা গণ্ডারের মত বিরাট প্রাণী দেখে আঁৎকে উঠলেও গুলি করতে হাত কাঁপেনি, খতম জানোয়ারটার কাছে গিয়ে দেখা গেল, গণ্ডার নয়—ট্যাপির। দক্ষিণ আমেরিকার নদীর তীরে থাকে।

ঈষ্ট রিভারের মোহানাতে অনায়াসেই একটা বন্দর হতে পারে। ওদের জাহাজ এদিকে এলে কোনো ভুর্ভাবনা থাকত না। সমুদ্রের ধারে বড় বড় পাথরের চাঁই। অসংখ্য গুহাঘর। একটা ঘর পছন্দ হল ডোনাগানের। মেঝেতে মিহি বালি বিছোনো। গ্র্যানাইট দেওয়াল।

পরের দিন সকাল বেলা সমুদ্রের ধাব দিয়ে ওরা অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গেল। তারপরেই উঠল ঝড়। আকাশ কালো হয়ে গেল বিকেল নাগাদ। সেই সঙ্গে বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ।

বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল জিনিসটা। বিরাটকায় কি একটা বস্তু জল থেকে উঠে আসছে ওদের দিকে। দেখেই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল উইলকক্স। ডোনাগানের কিন্তু মনে হল, জিনিসটা সমুদ্র-দানব নয়, নৌকো।

রাত নটা নাগাদ তুফান মাথায় নিয়েও ওরা এগিয়ে গেল বালির ওপর পড়ে থাকা প্রকাণ্ড জিনিসটার দিকে। কি দেখল?

একটা প্রকাণ্ড নৌকো। ঝড়ের ঠেলায় ডাঙায় উঠে এসেছে। ঠিক সেই সময়ে বিদ্যুৎ মশাল জ্বালল আকাশে। বাজ গর্জন করল ভীষণ বেগে। এঁকাবেঁকা বিজুলী রেখায় দেখা গেল নৌকোর একপাশে ছুটো মানুষের মড়া চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে!

এই পর্যন্ত দেখতে না দেখতেই বাজ পড়ল ধারেকাছে। সেকী আওয়াজ! ভয়ের চোটে প্রাণ উড়ে গেল চারজনের। মাথায় বাজ পড়বে নাকি? ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। ভোরের দিকে পাগলা তুফান পালাতেই আকাশ শান্ত হল। ওরা সমুদ্রতীরে ফিরে এল মড়া ছুটোকে গোর দেওয়ার জন্যে।

দেখল, মড়ারা অদৃশ্য হয়েছে!

নৌকোর ভেতরে একটা পেতলের ফলকের লেখা দেখে চমকে উঠল ডোনাগান। সানফ্রান্সিসকোর জাহাজ থেকে এসেছে নৌকোটা! আমেরিকার নৌকো! কিন্তু মানুষ দুটো বেঁচে উঠল, না, জলে ভেসে গেল?

ব্রাণ্ট আর গর্ডনের দুজনেরই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ডোনাগানরা চলে যাওয়ার পর থেকে। গর্ডন অবশ্য বোঝাতো ব্রাণ্টকে—"ভাবছো কেন, দুদিন ঘুরেই সখ মিটে যাবে। ফিরে আসবে ফরাসী গুহায়।"

ব্রাণ্ট তাই দূর সমুদ্রের জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হল। প্রথমদিকে বালির চড়ায় মাস্তুল পুঁতে পতাকা উড়িয়ে ছিল ডগায়। তারপর পতাকার বদলে উড়িয়েছিল একটা বেলুন—যাতে আরো দূর থেকে চোখে পড়ে। এখন ঠিক করল, বেলুনের চাইতেও আকর্ষণীয় কিছু একটা আকাশে উড়িয়ে রাখতে হবে। জিনিসটা আর কিছুই নয়—একটা অতিকায় ঘুড়ি।

ক্যানভাস ছিল জাহাজে, বেত পাওয়া গেল জঙ্গলে। তাই দিয়ে তৈরী হল প্রকাণ্ড ঘুড়ি। তারের কাটিম দিয়ে হল ঘুড়ির লাটাই। সমুদ্রের জোর হাওয়ায় ঘুড়ি উড়বে ভাল। তলায় একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখলে রাতেও দেখা যাবে আকাশ-পিদিমকে।

কিন্তু যেদিন ঘুড়ি ওড়ানোর কথা, সেদিনই উঠল ঝড়। এই সেই ঝড় যার পাল্লায় পড়ে পড়ে সমুদ্রের নৌকো উঠে এসেছিল ডাঙায়—ডোনাগানদের সামনে। পরের দিন আকাশ ফর্সা হতেই ফের তোড়জোড় আরম্ভ হল ঘুড়ি ওড়ানোর। ছেলেরা রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়ালো আজব ঘুড়ির আশ্চর্য আকাশ-বিহার দেখবার জন্যে। জাহাজের একটা মজবুত হুইলকে মাটিতে পুঁতে লাটাই বানানো হয়েছে। ইস্পাতের তারের সুতো ছাড়বে ব্রাণ্ট, ঘুড়ি ওড়াবে বাক্সটার আর গর্ডন।

আচমকা ঘেউ ঘেউ করে উঠল ফ্যান। দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল একটা গাছের সামনে।

সবিস্ময়ে ছেলেরা দেখল, ফ্যানের সামনে মাটিতে পড়ে একজন মহিলা। জ্ঞান নেই। কিন্তু প্রাণ আছে।

জ্ঞান ফেরার পর ভদ্রমহিলা বললেন, তাঁর নাম কেট। বাড়ী আমেরিকায়। সানফ্রানসিসকো থেকে জাহাজে চেপে চিলি যাচ্ছিলেন। জাহাজে ছিল

আটজন নরপিশাচ। মানুষ পদবাচ্য নয় মোটেই। পালের গোদার নাম ওয়ালস্টোন।

এরা মাঝপথে ক্যাপ্টেনকে মেরে ফেলে জাহাজ দখল করল। সব যাত্রীদেরই যমালয়ে পাঠালো—বাঁচিয়ে রাখল কেবল কেট-কে। আর জাহাজের ফার্স্ট মেট ইভান্সকে—নইলে জাহাজ চালাবে কে? ওদের উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকায় গিয়ে ক্রীতদাস বিক্রীর ব্যবসা করা।

কিন্তু মাঝপথে উঠল ঝড়। হঠাৎ কিভাবে জানি আগুন লাগল জাহাজে। নৌকো নিয়ে বোম্বেটেরা নামল জলে। ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকো তেড়ে এল ডাঙার দিকে। চোরা পাথরে লেগে তলা জখম হল। একজনকে হাঙরে টেনে নিলে। পাঁচজন সমুদ্রে পড়ল। দুজন ডাঙায়। কেট-কে ওরা দেখতে পায়নি। কেট ছিলেন ওল্টানো নৌকোর আড়ালে। জ্ঞান হলে শুনলেন, দ্বীপে ঠাঁই নিয়েছে মোট সাতজন বোম্বেটে—ইভান্সকে বেঁধে রেখেছে। বন্দুক-পিস্তল কিচ্ছু ডুবতে দেয়নি।

কথা বলতে বলতে বোম্বেটেরা সরে যেতেই কেট উঠে ছুটেছিলেন বনের মধ্যে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

সব শুনে ব্রান্ট বললে—"গর্ডন, আমি মোকো-কে নিয়ে চললাম ডোনাগানদেব খোঁজে। ওরা জানে না সাতজন খুনে ডাকাত বন্দুক নিয়ে দ্বীপে নেমেছে। কুকুরের মত গুলি করে মারবে ওদের। আমি চললাম। তোমরা হুঁশিয়ার থেকো।"

মোকো-কে নিয়ে ব্রান্ট নৌকো ভাসাল জলে। হ্রদের জল দিয়ে কিছুদূর যেতেই রাত নামল। অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, তীরের জঙ্গলে আগুন জ্বলছে এক জায়গায়।

কাদের আগুন? বোম্বেটেদের নাকি? নৌকো বেঁধে রেখে বন্দুক বাগিয়ে পা টিপে টিপে নামল ব্রান্ট। দূর থেকে দেখল, আগুনের পাশে কম্বল জড়িয়ে কে যেন শুয়ে আছে। আর একটা প্রকাণ্ড কালো জাগুয়ার নিঃশব্দে এগোচ্ছে সেইদিকে।

পরক্ষণেই করুণ আর্তনাদ করে উঠল শায়িত মূর্তিটা। জাগুয়ার লাফিয়ে পড়েছে। কিন্তু কম্বল মোড়া থাকায় ঠিক কামড়াতে পারছে না। ব্রান্ট বন্দুক ফেলে কুড়ুল বাগিয়ে ছুটে গিয়েই এক কোপ বসিয়ে দিল জাগুয়ারের মাথায়। এক কোপেই খতম হল ভীষণ জাগুয়ার।

ততক্ষণে বন থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে আরও তিনটি মূর্তি—ক্রস, ওয়েব,

উইলকক্স। কম্বল মোড়া মূর্তিটিও বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে ব্রাণ্টের পানে। সে ডোনাগান। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল শুধু ব্রাণ্টের জন্যে—যার ওপর রাগ করে সে বেরিয়ে এসেছিল দল ছেড়ে।

এরপর রাগ জল হয়ে গেল প্রত্যেকেরই। ডোনাগান একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল। সবাই মিলে ফিরে এল ফরাসী গুহায়।

ব্রাণ্ট বুদ্ধিমান ছেলে। বেলুনটাকে চুপি চুপি নামিয়ে আনল মাস্তলের ডগায়। বোম্বেটেরা ঐ দেখে যদি চড়াও হয় ওদের ওপর?

কিন্তু বোম্বেটেরা এখন কোথায়? দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে কিনা জানা যায় কি করে? মতলব বাৎলালো ব্রাণ্ট। কবে কোন এক ইংরেজ মেয়ে নাকি ঝুড়িতে চেপে ঘুড়িতে করে আকাশে উড়েছিল। ব্রাণ্টও উড়বে সেইভাবে। দেখবে, অনেক দূরেও বোম্বেটেদের দেখা যায় কিনা।

ঝুড়ি জাহাজ থেকেই আনা হয়েছিল। মাস্তলে বাঁধা এই ঝুড়িতে বসে নাবিকরা দূরদিগন্ত দেখে। ইস্পাতের তার কাটিমেই ছিল। প্রথমে পাথরের ওজন চাপিয়ে দেখা গেল ঘুড়ি উড়তে পারে কিনা। তারপর যে-ই ব্রাণ্ট উঠতে যাবে ঝুড়িতে—হাউমাউ করে উঠল ওর ভাই জ্যাক।

"দাদা, দাদা, আমাকে উঠতে দাও। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।"

সবাই তো হতভম্ব। জ্যাক আবার কি অপরাধ করল?

জ্যাক তখন কাঁদতে কাঁদতে খুলে বলল তার মহাপাপের কাহিনী। পনেরোটি ছেলের আজ এই দুর্ভোগ শুধু তার জন্যে। ঝড়-বাদলায় মজা দেখবার জন্যেই সেই রাতে জাহাজের দড়িটা সে খুলে দিয়েছিল। তারপর জাহাজ যখন তুফান দরিয়ায় ছুটে চলল ঘুমন্ত ছেলেদের নিয়ে—ভয়েময়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল নিজের কেবিনে—কাউকে কিছু বলেনি। এই কথাই সে কাউকে বলতে পারেনি—পুরো দুবছর মন মরা হয়ে থেকেছে—হাসতেও পারেনি।

ডোনাগান বললে—"যাকগে যা হবার তা হয়ে গেছে। দুবছরে মনে মনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। আর প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই।"

ব্রাণ্ট গিয়ে উঠল ঝুড়িতে। উঠে গেল অনেক উঁচুতে। নির্মেঘ আকাশে সারা দ্বীপটা ভাসছিল চোখের সামনে। কি দেখল কে জানে। চেঁচিয়ে বললে—"আছে! আছে! ওরা দ্বীপেই আছে!"

ঘুড়িটাকে নামিয়ে আনবার সময়ে ঘটল বিপদ। মাটি থেকে বেশ খানিকটা

ওপরে থাকতেই তারে পাক খেয়ে কেটে গিয়ে ঘুড়ি উড়ে গেল বাতাসে। ঝুড়ি শুদ্ধ ব্রাণ্টও চলল শূন্যপথে, 'গেল, গেল' হাহাকার শোনা গেল নীচে।

কিন্তু ভগবান বাঁচালেন ব্রাণ্টকে। ঘুড়িটা তেরচাভাবে ব্রাণ্টকে নিয়ে গিয়ে পড়ল হ্রদের জলে। ঘুড়ি ভেসে গেল স্রোতের টানে—অক্ষত দেহে ব্রাণ্ট উঠে এল তীরে !

এর পরেই একদিন ফরাসী গুহার কাছেই একটা তামাক খাওয়ার পাইপ দেখা গেল। সর্বনাশ ! বোম্বেটেরা কি তাহলে ধারে কাছেই ওৎ পেতে আছে ?

সাতাশে নভেম্বর একটা নতুন ঘটনা ঘটল। সেদিনও ঝড়ের উৎপাতে আর বর্ষার ধারা বর্ষণে ছেলেরা ফরাসী গুহায় বসে আছে দরজা বন্ধ করে। এমন সময়ে বাইরে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। এলোপাতাড়ি গুলি চলছে যেন।

ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল ছেলেদের। তবে কি দুযোগের রাতেই ফরাসী গুহা আক্রমণ করতে এল ডাকাতরা ? বড়রা লাফিয়ে উঠল বন্দুক নিয়ে। দাঁড়াল দরজার পাশে।

এমন সময়ে দমাদম ধাক্কা পড়ল দরজার পাল্লায়। সেইসঙ্গে আর্ত চীৎকার —"শীগগীর দরজা খোলো ! বাঁচাও ! বাঁচাও !"

কেট দৌড়ে গেলেন দরজার সামনে। কান পেতে শুনলেন আর্ত চীৎকারটা। পরক্ষণেই বললেন—"দরজা খুলে দাও—এখুনি !"

দরজা খুলতেই ঝড়ো কাকের মত ভেতরে ধেয়ে এল একজন ফরাসী নাবিক।

নাবিকের নাম ইভান্স। কেট যে জাহাজে ছিলেন, তার ফার্স্ট মেট।

ইভান্সের কাহিনী সত্যিই রোমাঞ্চকর। বোম্বেটেরা ওকে আটকে রেখেছিল দ্বীপের পূবদিকে একটা গুহায়। ভাঙা নৌকোটাকে বালির চড়া থেকে তুলে এনেছিল সেখানে। সামনেটাই শুধু ভেঙেছিল। মেরামত করে নিলেই জলে ভাসানো যায়।

মেরামত করার যন্ত্রপাতি যে এ-দ্বীপেই আছে, সে-খবরও পেয়েছিল বোম্বেটেরা অদ্ভুতভাবে। ছেলেরা ভয়ের চোটে জঙ্গলে বেরোতো না, এমন কি বন্দুক পর্যন্ত ছুঁড়ত না পাছে আওয়াজ শুনে বোম্বেটেরা ছুটে আসে বলে। তা সত্ত্বেও একদিন হ্রদের তীরে একটা অদ্ভুত ঘুড়ি আটকে থাকতে দেখে টনক নড়ে ওদের। ক্যানভাস আর বেতের তৈরী ঘুড়ি। এই ঘুড়িতেই ব্রাণ্ট আকাশে উড়েছিল—তারপর হ্রদের জলে ঠিকরে পড়েছিল।

ওয়ালস্টোন তখন খুঁজে খুঁজে এদিকে এসেছিল। যদিও ফরাসী গুহার দরজা বন্ধ থাকত দিবারাত্র, তাহলে ফাঁক দিয়ে লণ্ঠনের আলো দেখে ফরাসী

গুহার অস্তিত্ব টের পায় ওয়ালস্টোন। একদিন এসে ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরেছিল সমস্ত রাত—শুধু ওদের কথাবার্তা শোনবার জন্যে। ঝোপের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল ওর তামাক খাওয়ার পাইপ—পরদিন ছেলেদের চোখে পড়ে পাইপটা।

ওয়ালস্টোন অত্যন্ত নির্মম লোক। মানুষ নয়, পশু বললেও চলে। মাত্র পনেরোটা ছেলেকে মেরে ফেলে যন্ত্রপাতি দখল করবার মতলব আঁটছিল তখন থেকেই। ওর পক্ষে অসাধ্য কিছুই নয়।

এইসব শুনে ইভান্স আর স্থির থাকতে পারেনি। পালিয়ে এসেছে পূবদিক থেকে পশ্চিমে। ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এসেছে এতদূরেও। এখনো গায়ে আঁচড়টিও ফেলতে পাবেনি।

গর্ডন মাথা চুলকে বললে—"কিন্তু নৌকোটা মেরামত করে নিলেই হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যাবে ?"

হেসে ফেলল ইভান্স—"দূর বোকা! হাজার হাজার মাইল যাওয়ার দরকার কী ? পূবদিকে মাত্র তিরিশ মাইল গেলেই তো দক্ষিণ আমেরিকা।"

"অ্যাঁ!" চমকে উঠল ছেলেরা।

"আরে হ্যাঁ। এ-দ্বীপ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপের একটা—নাম হ্যানোভার আয়ল্যাণ্ড। ওদিককার জল-ও অগভীর—নৌকো নিয়ে যাওয়া যাবে অনায়াসেই।"

ইভান্স বললে—"ওরা জানেনা আমি তোমাদের কাছে ঠাঁই নিয়েছি। কেট-ও যে রয়েছে এখানে, তাও জানে না। ওদেরকে জানতেও দিতে চাইনা। কিন্তু তোমরা তৈরী হও। ওরা আসবেই।"

সত্যি সত্যিই তারা এল। এল অদ্ভুতভাবে। রক আর ফোর্বস নামে দুজন বোম্বেটে কাঁচুমাচু মুখে আশ্রয় চাইল ছেলেদের কাছে। তাদের জাহাজ নাকি ডুবে গেছে।

ছেলেরা বুঝল, মিথ্যে ছলনা করে ফরাসী গুহায় ঢুকতে চাইছে ডাকাতরা। ছেলেমানুষ ভেবে ন্যাকামি শুরু করেছে।

ইভান্স আর কেট লুকিয়ে রইল পেছনের হল ঘরে। সামনের ফরাসী গুহায় থাকতে দেওয়া হল দুজনকে। মোকো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুল পাশে।

মাঝরাতে চুপিচুপি উঠল রক আর ফোর্বস। মোকো-র কাছে এসে দেখলে দিব্বি ঘুমোচ্ছে ছেলেটা। মোকো কিন্তু মোটেই ঘুমোয়নি—মটকা মেরে পড়েছিল।

দরজায় গিয়ে পাথর সরিয়ে যেই খিল খুলতে যাবে রক, অমনি ইভান্স পেছন থেকে কাঁধ খামচে ধরল তার। ভূত দেখার মত চমকে উঠল রক। ওরা ভেবেছিল, গুলির ঘায়ে ইভান্স কোনকালে মরে গেছে। বেঁচে আছে কে জানত?

বড় ছেলেগুলো দৌড়ে এসে জাপটে ধরল ফোর্বস-কে। রক কিন্তু চক্ষের নিমেষে ইভান্সের কাঁধে ছুরী মেরে পালিয়ে গেল বাইরে।

কেট বললেন—"ফোর্বস-কে মেরোনো। ওর জন্যেই ওয়ালস্টোন আমাকে মারে নি।"

কি আর করা যায়! কেট-যের ইচ্ছেমত পিছমোড়া করে বেঁধে ফোর্বস-কে ফেলে বাখা হল পেছনকার ঘরে!

ওয়ালস্টোন দলবল নিয়ে বাইরে ওৎ পেতে ছিল। রক আর ফোর্বস দরজা খুলে দিলেই ভেতরে ঢুকে ঘুমন্ত ছেলেগুলোকে কেটে ফেলবে—এই ছিল ওর মতলব। কিন্তু ধুরন্ধর ছেলেদের হুঁশিযারিতে তা আর হল না।

কিন্তু আর তো ফরাসী গুহায় বসে থাকা যায় না। এসপার কি ওসপার করে ফেলা দরকার। লড়াই যখন শুরু হয়েছে, তার শেষ না করে ছাড়া হবে না।

ইভান্সের কাঁধের চোট তেমন মারাত্মক নয়। তাই সকাল হতেই ব্রাণ্ট, ডোনাগান, সার্ভিস আর গর্ডনকে নিয়ে বেরোলো ডাকাতদের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধ করতে।

ফোবস একদম বোবা হয়ে গিয়েছে। পেট থেকে কথা বার করার অনেক চেষ্টা করেছিল ইভান্স, পারেনি। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকেছে।

বেশ বোঝা গেল, জঙ্গলের মধ্যেই আড়ালে আবডালে ওৎ পেতে বসে আছে শয়তান বোম্বেটেগুলো। আড়াল থেকেই গুলি চালাবে। হলও তাই।

এক জায়গায় দেখা গেল বেশ খানিকটা ছাই পড়ে। পোড়া কাঠ থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে একটু একটু করে। বোম্বেটেরা রাত কাটিয়েছে এইখানে। হয়ত একটু আগেও ছিল। ছেলেদের পায়ের শব্দে পালিয়েছে।

সাবধান হওয়ার আগেই সত্যি সত্যিই বন্দুক গর্জে উঠল। একবার··· দুবার···তিনবার···চারবার! শন্‌শন্‌ করে একটা গুলি বেরিয়ে গেল ব্রাণ্টের কানের পাশ দিয়ে। ডোনাগান যেন ক্ষেপে গেল তাই দেখে। পাগলের মতো ধেয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে বন্দুকের শব্দ আর ঝিলিক লক্ষ্য করে। ছুটতে ছুটতেই গুলি চালালো নিজের বন্দুক থেকে।

ডোনাগানকে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে যেতে দেখে সবাই ছুটেছিল পেছন

পেছন। বেশীদূর যেতে হল না। ডোনাগান এক গুলিতেই একজন বোম্বেটেকে খতম করেছে। বাকী সবাই পালিয়েছে ঐটুকু ছেলের সাহস আর গুলির প্রতাপ দেখে।

পালিয়েও বেশীদূর যায় নি। কেন না, আবার গুলির শব্দ এল ঝোপের মধ্যে থেকে। সঙ্গে সঙ্গে কপাল খামচে ধরে বসে পড়ল সার্ভিস। গুলি তার কপালের ছাল চামড়া তুলে নিয়ে গেছে। ভেতরে ঢোকেনি।

হঠাৎ আর একটা গুলি সাঁই সাঁই করে ছুটে গেল গর্ডনের পাশ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে খচমচ খচমচ শব্দ শুনে দেখা গেল বন্দুক হাতে ছুটছে রক। দেখেই বন্দুক তুলে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি করল ইভান্স। অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটল সঙ্গে সঙ্গে। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল রক।

অন্য সময় হলে গা ছমছম করে উঠত সবারই। কিন্তু তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানির সময়। রক-কে আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না। গুলি খেয়েও যেন সে শূন্যে মিলিয়ে গেছে।

ঠিক এই সময়ে উল্টো দিক থেকে ভেসে এল দারুণ ঝটাপটির শব্দ। সেই সঙ্গে ডোনাগানের চীৎকার—"খবরদার ব্রাণ্ট, ছাড়বে না বদমাসটাকে! আসছি আমি!"

আর একটা ষণ্ডা হার্মাদকে জাপটে ধরেছিল ব্রাণ্ট প্রাণের মায়া না রেখে। কিন্তু অসুরের মত লোকটার সঙ্গে পারবে পারবে কেন ঐটুকু ছেলে? চক্ষের নিমেষে ব্রাণ্টকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুরী তুলল বুকে বসাবার জন্যে। চোখের নিমেষেই সব শেষ হয়ে যদি না ঠিক তখনি সামনে গিয়ে দাড়াত ডোনাগান। বন্দুক তুলে গুলি করতে যাচ্ছে, অমনি ব্রাণ্টকে ছেড়ে বাঘের মত লাফিয়ে এল ডাকাতটা এবং ডোনাগানকে হতচকিত করে দিয়ে ছুরী বসিয়ে দিলে তার বুকে।

ইভান্স যখন দৌড়ে এল, খুনে ডাকাতটা ততক্ষণে জঙ্গলে উধাও হয়েছে।

ডোনাগানের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল সবাই। ক্রমশঃ নেতিয়ে পড়েছে ছেলেটা। বোধ হয় আর বাঁচবে না। ধরাধরি করে ছেলেরা তাকে ফরাসী গুহার দিকে আনছে, এমন সময়ে দেখা গেল আর একটা ভয়ংকর দৃশ্য!

ওয়ালস্টোন দুজন বোম্বেটেকে নিয়ে ফরাসী গুহা আক্রমণ করেছে। জ্যাক আর কোষ্টারের টুঁটি টিপে ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনছে বাইরে। দুই বোম্বেটের হাতে দুটি ছেলে ছটফট করছে—কিন্তু পালাতে পারছে না। তৃতীয় বোম্বেটে দৌড়ে গিয়ে নদীর ওপর নৌকোয় দাঁড়িয়ে। মতলব অতি পরিষ্কার। ছেলে দুটোকে নৌকোয় তুলে দ্বীপের পূবদিকে পালাবে ওয়ালস্টোন। তারপর শুরু হবে অকথ্য নির্যাতন।

ওরা দ্রুত চলেছে নৌকোর দিকে। উঠে পড়ল বলে। বাক্সটার পাগলের মত ছুটল তাই দেখে। কোষ্টারকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে লাফিয়ে পড়ল একজন বোম্বেটের ওপর। কিন্তু এক ঘুসিতেই ছিটকে পড়ল বাক্সটার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এসে ফ্যান। ঘাড় কামড়ে ধরল বোম্বেটেটার! এবার আর কোষ্টারকে ধরে রাখা গেল না। দুহাতে বোম্বেটেটা লড়তে গেল ফ্যানের সঙ্গে। এমন কি ওয়ালস্টোনও জ্যাককে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে এল ফ্যানকে টেনে নামানোর জন্যে।

এই হল সুবর্ণ সুযোগ। এতক্ষণ ইভান্স, ব্রাণ্ট প্রমুখ বন্দুকধারীরা গুলি করতে পারেনি পাছে জ্যাক আর কোষ্টার জখম হয় এই ভয়ে। এবার বন্দুক তুলল ইভান্স।

ঠিক এমনি সময়ে করাসী গুহা থেকে বেরিয়ে এল বোম্বেটে ফোর্বস। ওয়ালস্টোন তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল মহা আনন্দে—"তাড়া তাড়ি এস। ছিলে কোথায় এতক্ষণ?" তাই দেখেই, বন্দুক ঘুরিয়ে ফোর্বসকে তাগ করল ইভান্স।"

অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটল ঠিক তখনি। বোম্বেটে হলেও ফোর্বসের ভেতরে মনুষ্যত্ব ছিল। কেট-কে সে-ই প্রাণে বাঁচিয়েছে। এখন বাঁচাল জ্যাক-কে। খরগোশের মত দৌড়ে গেল ওয়ালস্টোনের দিকে। গিয়েই দমাদম ঘুসি চালাতে লাগল তার মুখের ওপর।

ওয়ালস্টোন তো হতভম্ব! রাতারাতি স্যাঙাৎ যে শত্রু হয়ে যাবে, তা সে ভাবতে পারেনি। পলকের মধ্যে কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। খুন করতে হাত কাঁপে না তার। এবারও কাঁপল না। কোমরের ছুরী সটান ঢুকিয়ে দিল ফোর্বসের বুকে। বুকফাটা চেঁচিয়ে উঠে লুটিয়ে পড়ল ফোর্বস।

ফের জ্যাককে ধরতে গেল ওয়ালস্টোন। কিন্তু বাহাদুর ছেলে বটে জ্যাক। এর মধ্যেই তৈরী হয়ে নিয়েছে সে। তাই তিলমাত্র দ্বিধা না করে রিভলবার তাগ করে উপর্যুপরি গুলি বর্ষণ করল ওয়ালস্টোনের বুকের ওপর।

থরথর করে কেঁপে উঠল ওয়ালস্টোন। মরণ মার খেয়েও পিছু টলতে টলতে এগিয়ে গেল নৌকোর দিকে। অন্য বোম্বেটেরা ততক্ষণে নৌকোয় উঠে পড়েছে। ওয়ালস্টোন রক্তাক্ত দেহে নৌকোয় পা দিতেই নৌকো ছেড়ে দিল সবাই মিলে।

ভীষণ আওয়াজটা শোনা গেল ঠিক সেই মুহূর্তে। সমস্ত দ্বীপ থর থর করে উঠল যেন ঘন ঘন বজ্রগর্জনে। নৌকোর আশপাশের জলে এসে পড়ল একটার পর একটা কামানের গোলা। তারপরেই তিন বোম্বেটে শুদ্ধ নৌকো খান খান হয়ে ভেঙে তলিয়ে গেল সর্বশেষ কামানের গোলায়।

মোকো একাই কামান দেগে নিশ্চিহ্ন করে দিল বোম্বেটেদের চারম্যান আয়ল্যাণ্ড থেকে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল তিন বোম্বেটের দেহ।

ফোর্বস আর ডোনাগানকে নিয়ে আসা হল ফরাসী গুহায়। দুজনেরই আঘাত মারাত্মক। কিন্তু ডোনাগান ধীরে ধীরে সেরে উঠল সেবা শুশ্রূষার ফলে। মারা গেল ফোর্বস। মরবার আগে ক্ষমা চেয়ে গেল সবার কাছে দুষ্কর্মের জন্যে।

রক কেন গুলি খেয়েও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছিল, ভৌতিক সেই রহস্যের সমাধান হল দুদিন পরেই। জন্তুদের জন্যে পাতা ফাঁদে পাওয়া গেল তার মৃত দেহ। গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁদের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল যেন অদৃশ্য হয়ে গেল রক।

ইভান্স এবার উঠে পড়ে লাগল নৌকো মেরামতি নিয়ে। দ্বীপের পূব প্রান্ত থেকে নিয়ে আসা হল ডাকাতদের বড় নৌকোটা। যন্ত্রপাতি দিয়ে তলা মেরামত শেষ করতেই জানুয়ারী ফুরিয়ে গেল। দরকারী জিনিস পত্র দিয়ে নৌকো বোঝাই করার পর পোষা জন্তুগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হল খোঁয়াড় থেকে। গুয়োনারা, ছাগল, উটপাখী ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে গেল জঙ্গলে। পাখীর খাঁচা পর্যন্ত খুলে দিয়ে বনের পাখীকে ছেড়ে দেওয়া হল বনের মধ্যে।

বুক টনটন করতে লাগল ছেলেদের দ্বীপ ছেড়ে আসবার সময়ে। এত কষ্টের মধ্যেও এ-দ্বীপকে তারা ভালবেসেছিল। তাই চোখ মুছতে মুছতে পনেরো জন ডানপিটে উঠে বসল নৌকোয়। হাল ধরল ইভান্স। কেট ভোলাতে লাগলেন বাচ্চাদের।

দিন সাতেক পরে একটা জাহাজ দেখা গেল দিগন্তে। কলে চলা জাহাজ। বাচ্চা কাচ্চাদের চেঁচামেচি শুনে জাহাজের লোকজন কিন্তু মোটেই অবাক হল না। দু'বছর আগেকার আশ্চর্য সেই কাহিনী জানা ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেনের। কাগজে কাগজেও কম লেখালেখি হয়নি নিপাত্তা জাহাজ ভর্তি ছেলে-পুলেদের নিয়ে। তাদের বাবা-মায়েরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন হারা-নিধিদের ফিরে পাওয়ার জন্যে। শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

নৌকোভর্তি সতেরোজন আরোহীকে জাহাজে তুলে নেওয়ার পর পরিষ্কার হল সেই রহস্য।

ভাসমান নগরী

(এ ফ্লোটিং সিটি)

....

[জুল ভের্ণ একবার স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফেরবার পথে টেমস নদীর জাহাজঘাটায় একটা অতিকায় জাহাজ তৈরী হতে দেখে বন্ধুদের বলেছিলেন—"আমার যখন অনেক টাকা হবে, এই জাহাজে চড়ব।"

মাত্র চারখানা নতুন ধরনের উপন্যাস লিখে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পর ভের্ণ তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছে পূর্ণ করলেন। জাহাজে চড়লেন বটে, কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। সেই নিয়েই এই কাহিনী।

জাহাজটা জাহাজ-বিজ্ঞানের বিস্ময় হলে কি হবে, সত্যিই যেন অভিশপ্ত। উদ্যোক্তাদের পয়সা জলে দিয়েছে, ডিজাইনারের মন ভেঙে দিয়েছে, বেশ কিছু মাঝিমাল্লা প্রাণ হারিয়েছে। তবুও উনবিংশ শতাব্দীর জাহাজ-ইতিহাসে 'গ্রেট-ইস্টার্ণ' একটা মনে রাখবার মত নাম হয়ে থাকবে।

কাহিনীর মধ্যে সমুদ্র যাত্রার দৈনন্দিন বর্ণনা আর জাহাজের বর্ণনা আজকের যুগে একঘেয়ে লাগতে পারে, এই আশংকায় তা বাদ দেওয়া হল। জুল ভের্ণের দুটি মস্ত ত্রুটি কিন্তু প্রকট হয়েছে এ-উপাখ্যানে। উনি স্ত্রী-চরিত্র আঁকতে পারতেন না। আর, বিভিন্ন দেশের আদব-কায়দা সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাখতেন না। ভূগোল পড়া বিদ্যে আর গাইড বুক ঘেঁটে চেয়ার-টেবিলে বসেই বিশ্ব পর্যটন করতেন।]

....

১৮ই মার্চ, ১৮৬৭। লিভারপুল পৌঁছে গ্রেট-ইস্টার্ণ জাহাজে একটা বার্থ বুক করলাম। অনেকদিনের সাধ আজ পূর্ণ হবে। দিনকয়েক পরেই এই জাহাজে চেপে আটলান্টিক পেরিয়ে নিউইয়র্ক পৌঁছোবো।

গ্রেট-ইস্টার্ণকে শুধু জাহাজ বললে মানে খাটো করা হয়। একটা ছোটখাট দুনিয়া বললেই চলে এ জাহাজকে। দূর থেকে দেখলে একটা দ্বীপ ভাসছে বলে মনে হয়।

শুনলাম ২০শে মার্চ জাহাজ ছাড়ছে। ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসনকে বলে-কয়ে ১৯শে মার্চ জাহাজে ওঠবার ব্যবস্থা করলাম। জাহাজ ছাড়ার আগের তৎপরতা দেখবার জন্যে মনটা আকুলি-বিকুলি করছিল আমার

জেটিতে পৌঁছে একজন দীর্ঘদেহী যুবাপুরুষকে দেখলাম দাঁড়িয়ে থাকতে। খানদানী চেহারা। ইংরেজ অফিসারদের দেখতে যেরকম হয় আর কি। দেখেই চেনা-চেনা মনে হল। ইণ্ডিয়ান আর্মিতে আমার এক বন্ধু আছে। তাকেও দেখতে এইরকম। কিন্তু সে তো এখন বোম্বাইতে। তাছাড়া, তার স্বভাবই হল হৈ-চৈ করা। কিন্তু এই ভদ্রলোক অত্যন্ত বিষণ্ণ। শোকে-তাপে যেন ভেঙে পড়েছে।

স্টীমারে চেপে তিন মাইল দূরে ভাসমান নগরী গ্রেট-ইস্টার্ণ-য়ের পাশে পৌঁছোলাম। দূর থেকে কুয়াশার মধ্যে বিপুল কায়া দেখে সত্যিই রোমাঞ্চ অনুভব করলাম সর্বাঙ্গে।

জাহাজের প্যাডল-বক্সের প্যাডলগুলো দেখবার মত। চওড়ায় বারো ফুট। শুধু প্যাডল বক্সটারই ওজন নব্বই টন!

জাহাজে উঠে বসে থাকতে পারলাম না। এলাহি কাণ্ডকারখানা দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। ইঞ্জিন রুমের পাশে একটা হোটেল পর্যন্ত রয়েছে দেখলাম।

শুনলাম, ২০শে মার্চ ছাড়বার কথা থাকলেও রওনা হতে দেরী হবে গ্রেট-ইস্টার্ণ-য়ের। জোর মেরামতি চলছে গোটা জাহাজ জুড়ে। সবশুদ্ধ বিশ বার আটলান্টিক পেরিয়েছে গ্রেট-ইস্টার্ণ। কিন্তু শেষের দিকে একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনার পর এ-জাহাজ পরিত্যক্ত হয়। যাত্রী জাহাজ হিসেবে তৈরী হলেও যাত্রীরা গ্রেট-ইস্টার্ণ আর উঠতে চাইত না। শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে একেবারেই বরবাদ হতে বসল এতবড় জাহাজখানা। কাজে লাগানোর মত কাজ পাওয়া মুস্কিল হল।

আটলান্টিক টেলিগ্রাফের তার পাতা নিয়ে তখন মস্ত সমস্যা দেখা যায়। ছোটখাট জাহাজে তার পাততে গিয়ে ল্যাজেগোবরে হতে হয়েছিল ইঞ্জিনীয়ারদের। কিন্তু গ্রেট-ইস্টার্ণ অন্যান্য কাজে অকেজো হওয়ার পর দেখা গেল এ-কাজে তার জুড়ি নেই। ২,১০০ মাইল লম্বা ৪,৫০০ টন ওজনের ধাতুর তার বইবার ক্ষমতা গ্রেট-ইস্টার্ণ ছাড়া আর কোনো জাহাজের নেই। তার পাতবার সময়ে সমুদ্রের দুলুনিতেও গ্রেট-ইস্টার্ণ টলমল করবে না।

কিন্তু এত তার বয়ে নিয়ে যেতে গেলে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার। তাই ছ'টা প্রকাণ্ড বয়লারের দুটো আর তিনটে অতিকায় ফানেলের একটা সরিয়ে ফেলা হল। সে জায়গায় বসানো একটা জলের ট্যাঙ্ক। তারগুলো ডুবিয়ে রাখা হল সেই ট্যাঙ্কের জলে যাতে হাওয়া লেগে খারাপ হয়ে না যায়। তার

পাতবার সময়ে ট্যাঙ্কের মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে নামিয়ে দেওয়া হত আটলান্টিকের জলে।

তার পাতা শেষ হবার পর ফের অতবড় জাহাজটা পড়ে রইল জাহাজ-ঘাটায়। এবার এগিয়ে এল ফ্রান্সের একটা কোম্পানী। বিস্তর টাকা খরচ করে গ্রেট-ইস্টার্ণকে দিয়ে যাত্রী বওয়াব পরিকল্পনা করল এই কোম্পানী। নতুন করে বয়লার বসিয়ে জাহাজের স্পীড বাড়ানোর জন্যে কনট্রাক্ট দিল লিভার পুলের একটা কোম্পানীকে। আরও একটা কোম্পানীর ওপর ভার রইল অন্যান্য মেরামতির।

নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ রওনা হতে পারছে না এই কারণেই।

দিনরাত কাজ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ২৬শে মার্চ গ্রেট-ইস্টার্ণ ফের জলে ভাসবে।

২৬শে মার্চ ডেকের ওপব একজন অফিসারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম— "আজ রওনা হচ্ছি তো ?"

"নিশ্চয়। যাত্রীবা এলেই জাহাজ ছাডবো।"

"কত যাত্রী ?"

"বাবোশ থেকে তেবোশ।"

ঘুবে ঘুবে দেখতে লাগলাম ভাসমান নগবীর বিস্ময়কব প্রস্তুতি পর্ব। এমন সময়ে গলুইযেব কাছে দেখলাম জেটিব সেই যুবাপুরুষকে। এবার দেখেই কিন্তু চিনলাম।

"ফেরিয়ান নাকি এখানে ?"

"তুমি-ও তো এখানে।"

"তাহলে ঠিকই দেখেছিলাম সেদিন। জেটিতে তুমিই দাঁড়িয়েছিলে, তাই না ?"

"ছিলাম। কিন্তু তোমাকে তো দেখিনি।"

"কোথায চলেছো ? আমেবিকা ?"

"এক মাসের ছুটি কাটাতে হলে আমেবিকা ছাড়া আব কোন চুলায় যাই বলো।"

"ইণ্ডিয়া থেকেই আসছো তো ?"

"হ্যা। গোদাবরী জাহাজে।"

"কিন্তু হঠাৎ দেশভ্রমণের বাতিক হল কেন ?"

"মনটাকে অন্যমনস্ক রাখতে," বিষাদশীর্ণ মুখে বলল ফেরিয়ান।

প্রথম দুর্ঘটনাটা ঘটল নোঙর তোলবার সময়ে।

নোঙর তোলার জন্যে একটা ইঞ্জিন ছিল জাহাজের গলুইতে। ছেষট্টি হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন। বয়লার থেকে সিলিণ্ডারের মধ্যে স্টীম ঠেলে দিলেই তা বনবন করে ঘুরতে থাকবে। শেকলকে গায়ে গুটিয়ে নিয়ে নোঙর তুলে নেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ইঞ্জিনও থই পাচ্ছে না। নোঙর আর উঠছে না। শেষকালে পঞ্চাশজন খালাসীকে হাত লাগাতে হল ক্যাপস্ট্যান ঘুরিয়ে নোঙর টেনে তোলার জন্যে।

আমি তখন আরও কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে সামনে দাঁড়িয়ে। আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন একজন প্যাসেঞ্জার। অধীরভাবে কাঁধ ঝাঁকাচ্ছিলেন বারবার। হাবভাব দেখে হাসি পাচ্ছিল আমার। কাজকর্মের শম্বুকগতি দেখে টিটকিরি মারছিলেন বিরামবিহীনভাবে। সব মিলিয়ে ভদ্রলোককে সঙ্গী হিসেবে মন্দ লাগল না আমার।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন ভদ্রলোক—"কোনো মানে হয়? ইঞ্জিনের কাজ মানুষকে সাহায্য করা—মানুষের সাহায্য নেওয়া নয়।"

এই কথা বলতে না বলতেই ভীষণ সোরগোল শোনা গেল সামনে। ক্যাপস্টান-বার যারা-যারা ধরেছিল, তারাই ধড়াধড় ছিটকে পড়ছে চারদিকে। মেশিনের একটা ডাণ্ডা ভেঙে গেছে। উল্টোদিকে পাক খাচ্ছে চাকা। শেকলের ভারে ক্যাপস্টানকে রুখে রাখা যাচ্ছে না। কারও মাথায় লাগছে, কারও বুকে। ডাণ্ডার ঘায়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল চারজন, জখম হল বারো জন।

বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন পাশের সহযাত্রী—"শুরুটা ভালই হল দেখছি।"

"খুবই খারাপ," বললাম আমি। "কার সঙ্গে কথা বলছি জানতে পারি কী?"

"ডক্টর পিটফার্জ।"

২৮শে মার্চ সকাল নটায় ডেকে দেখা হয়ে গেল ক্যাপ্টেন ফেরিয়ানের সঙ্গে। সঙ্গে রয়েছেন আরও একজন আর্মি অফিসার গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। লম্বা গোঁফ আর চওড়া গালপাট্টায় বেশ মানিয়েছে। চেহারা দেখে মনে হয় দুর্দান্ত সাহস রাখেন।

আলাপ করিয়ে দিলেন ফেরিয়ান—"আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন কর্সিকান, ইণ্ডিয়ান আর্মি।"

গ্রেট-ইস্টার্ণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। দশ হাজার টন লোহা দিয়ে তৈরী হয়েছে শুধু খোল-টাই। তেরোটা বড় বড় ওয়াটার-টাইট কমপার্টমেণ্ট আছে সামনের দিকে। আগুন বা জল—কিছুতেই ঘায়েল হবার আশংকা নেই। লোহার পাতগুলো লাগাতেই গেছে তিরিশ লক্ষ বল্টু। ইচ্ছে করলে দশ হাজার প্যাসেঞ্জার বইতে পারে এই একটা জাহাজ।

ডেকে সবশুদ্ধ ছটা মাস্তুল আর পাঁচটা ফানেল আছে। ৫,৪০০ বর্গফুট পুরু ক্যানভাস লেগেছে পাল তৈরী করতে। মূল মাস্তুলটা ২০৭ ফুট উঁচু (ফরাসী ফুট)। তার মানে, নোতরদামের বিখ্যাত গির্জেও লম্বায় খাটো আকাশছোঁয়া এই মাস্তুলের সামনে।

ফানেলগুলো নব্বই ফুট উঁচু। ডেকের সঙ্গে মোটা মোটা চেন দিয়ে বাঁধা।

দিন কয়েক পরে সমুদ্র অশান্ত হল। ভীষণ দুলতে লাগল গ্রেট-ইস্টার্ণের মত পেল্লায় জাহাজও। দূরবীণ কষেও ধারে কাছে ডাঙার চিহ্ন দেখা গেল না।

ডেকে দাঁড়িয়ে আছি। সমুদ্রের ভয়াল রূপ দেখছি। এমন সময়ে কানের কাছে বলে উঠলেন ডক্টর পিটফাজ:

"দেখছেন কি! আরো হবে! কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।"

"আমাদের কপালে তো?"

"জাহাজের কপালে। সুতরাং আমাদের কপালেও বলতে পারেন।"

"এতই যদি ভয় তো এলেন কেন?"

"জাহাজডুবি দেখবার জন্যে।"

"গ্রেট-ইস্টার্ণে এই প্রথম চড়লেন মনে হচ্ছে?"

"মোটেই না। এর আগে বেশ কয়েকবার হয়ে গেছে।"

"তাতেও এত ক্ষোভ!"

"ক্ষোভ? আরে মশায়, আমি গ্রেট-ইস্টার্ণের ধ্বংস-দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবার জন্যে বারবার এ-জাহাজে চড়ছি।"

"ডক্টর, বিশবার আটলান্টিক পেরিয়েছে গ্রেট-ইস্টার্ণ। সুতরাং আরো অনেকবার সাগর পাড়ি দেওয়ার মুরোদ তার আছে।"

"দূর মশায়, এ-জাহাজে অভিশাপ আছে। অভিশপ্ত জাহাজের সব কিছুই অশুভ জানবেন। শেষটাও। দেখলেন না নোঙর তুলতে গিয়ে কি কাণ্ড ঘটল। গ্রেট-ইস্টার্ণের জন্ম যাঁর হাতে, সেই ব্রানেল ইঞ্জিনীয়ারকেও মরতে হয়েছে শোচনীয়ভাবে।"

"তাতে কী?" বললাম আমি।

"মুচকি মুচকি হাসছেন মনে হচ্ছে? জানেন কী গ্রেট-ইস্টার্ণের বোঝা কাঁধে নিয়ে বেশ কয়েকটা কোম্পানী লালবাতি জ্বেলেছে? গ্রেট-ইস্টার্ণের জন্ম হয়েছিল উদ্বাস্তুদের অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু আজও অস্ট্রেলিয়ার ডাঙা ছোঁয়নি। স্পীডের দিক দিক দিয়েও যে কোনো সমুদ্র-জাহাজের তুলনায় একে শামুক বললেই চলে। দাঁড়ান, দাঁড়ান। আরও আছে। একজন পাকা ক্যাপ্টেন গ্রেট-ইস্টার্ণের ভার নেওয়ার পর জলে ডুবে মারা গেছেন। অনেক অদ্ভুত গল্প শোনা যায় গ্রেট-ইস্টার্ণ সম্বন্ধে। যেমন, আমেরিকার জঙ্গলে যে পথ হারায় নি, সে লোকটাও গ্রেট-ইস্টার্ণের খোলে ঢুকে পথ হারিয়েছে। আজও তাকে দেখা যায় নি।"

"কী মুস্কিল—"

"শোনা যায়, জাহাজ তৈরীর বয়লারে জ্যান্ত সেদ্ধ হয়ে গিয়েছিল একজন ইঞ্জিনীয়ার।"

"দুর্ঘটনা তো ঘটবেই—"

"উনিশ বারের যাত্রায় লিভারপুল থেকে নিউইয়র্ক যেতে গিয়ে কি কাণ্ড ঘটেছিল জানেন?"

"আজ্ঞে না।"

ডক্টর পিটফার্জ তখন অত্যন্ত ভয়ংকর একটা বর্ণনা শুনিয়ে দিলেন। ঝড়-বাদলায় গ্রেট-ইস্টার্ণ ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়েছিল সেবার। প্যাডেল বেঁকে গিয়ে জাহাজের খোল জখম করেছিল। তিন টন ওজনের ট্যাঙ্ক জাহাজের ঢুলুনিতে হড়কে গিয়ে গিয়ে হাতুড়ির মত ডেকের সমস্ত রেলিং চুরমার করে দিয়েছিল। মাস্তুল ভেঙে গিয়েছিল। ইঞ্জিন জখম হয়েছিল। পাল উড়ে গিয়েছিল। একটা গরু ছাদ ভেঙে মেয়েদের ঘাড়ে পড়েছিল। সাতদিন এক নাগাড়ে চলেছিল সেই বিপর্যয়।

"এবারেও যে সেরকম ঘটবে না, তা কে বলতে পারে?" বললেন ডক্টর পিটফার্জ।

ডক্টর কথাগুলো সিরিয়াসলি বললেন কি ঠাট্টা করে বললেন ঠিক বুঝলাম না। গ্রেট-ইস্টার্ণের শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে ওঁর মনে যেন তিলমাত্র সংশয় নেই। ভারী আশ্চর্য তো!

পরদিন সকালেও সমুদ্র শান্ত হলনা। সকাল নটা নাগাদ মাইল তিনচার দূরে কি যেন একটা দেখা গেল। ভাঙা জাহাজ হতে পারে, মরা তিমি হতে পারে, জাহাজের ডোবা খোল-ও হতে পারে। কি জিনিস তা কেউ না

জানলেও বাজী ধরার হিড়িক পড়ে গেল গ্রেট-ইস্টার্ণে। সবচেয়ে ডাকসাইটে জুয়াড়ীকে দেখে মোটেই ভাল লাগল না আমার। চোখে-মুখে তার ভণ্ডামি মাখানো। কপালে বলিরেখা। হাবভাবে ঔদ্ধত্য। সবসময়ে ভ্রূকুটি করে থাকার ফলে ভুরুজোড়া প্রায় জুড়েই রয়েছে। চোখ দুটো পাথরের মত নির্দয় নির্মম। কাঁধ উঁচু। চিবুক সামনে ঠেলে বার করা। গলার স্বর কর্কশ। ঠাট্টা-ইয়ার্কি চাষাড়ে। গলা তুলে লোকটা বললে—জিনিসটা নিশ্চয় মরা তিমি।

শেষ পর্যন্ত বাজী হারতে হল। কাছে এলে দেখা গেল জিনিসটা একটা আধডোবা জাহাজের উল্টোনো খোল।

গ্রেট-ইস্টার্ণে অনেক রকমের যাত্রীর পরিচয় পেলাম। ডক্টর পিটফাজ সরসভাবে বর্ণনা দিলেন এক-একজনের। যেমন একজন কেমিস্ট। ভদ্রলোক নাকি একটা গরুর যাবতীয় পুষ্টি নিংড়ে নিয়ে একটিমাত্র মাংস বড়ি তৈরীর ফরমূলা আবিষ্কার করেছেন। বড়ির দাম হবে মাত্র পাঁচ শিলিং। আরেকজন বের করেছেন একটা স্টীমের ঘোড়া। ঘড়ির ডালার মধ্যে লুকোনো থাকবে কলের ঘোড়া—দম দিলেই চলবে। আরেকজন ফরাসী—তিরিশ হাজার পুতুল নিয়ে আমেরিকায় চলছে দিন কেনবার জন্যে। পুতুলগুলোর বৈশিষ্ট্য হল ইয়াঙ্কি ভাষায় 'বাবা' শব্দটা বলতে পারে বেশ মিষ্টি করে।

ডক্টরের বর্ণনায় স্থান পেল এমনি বহু বিচিত্র চরিত্র। তার মধ্যে ছিল অতি কদাকার একটা চরিত্র। চেহারার বর্ণনা শুনেই চিনতে পারলাম। মরা তিমি-এই বাজী ধরে জাহাজ শুদ্ধ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল লোকটা।

নাম তার হ্যারি ড্রেক। কলকাতার এক কারবারীর ছেলে। জুয়াড়ী। চরিত্রহীন। তরবারী যুদ্ধে পোক্ত। সর্বস্ব খুইয়ে চলেছে আমেরিকায় ভাগ্য অন্বেষণে। লোকটার এক দোসর আছে। জার্মান ইহুদী। স্বভাব চরিত্রে ড্রেকের সমান যায়।

যে কোনো জাহাজ চব্বিশ ঘণ্টায় তিনশ মাইল যেতে পারে। কিন্তু ছত্রিশ ঘণ্টা পরে দেখা গেল গ্রেট-ইস্টার্ণ এসেছে মাত্র তিনশ কুড়ি মাইল।

পিটফাজের কাছ থেকে এসে ফেবিয়ানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জল-তরঙ্গ দেখছিল ফেবিয়ান। জলের ম্যাজিক দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি ওকে বিরক্ত করিনি। শুধু দেখছিলাম।

হঠাৎ ফেবিয়ান বললে আমাকে—"ঢেউগুলো দেখেছো? ঠিক ইংরেজী 'L' আর 'E'র মত।"

বুঝলাম না ওর হঠাৎ উত্তেজনার কারণ। ঢেউয়ের মধ্যে হঠাৎ L আর E আবিষ্কার করল কেন, তাও বুঝলাম না। শুধু আঁচ করলাম অক্ষরগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মধ্যে। জলের মধ্যেও দেখছে তার প্রতিবিম্ব।

গাঢ় কণ্ঠে শুধোলাম—"ফেবিয়ান, কি হয়েছে তোমার?"

ফ্যাকাসে হেসে বলল ফেবিয়ান—"বুকের অসুখ। বাঁচবার কোনো আশা নেই।"

"বুকের অসুখের ওষুধ তো আছে।"

"এ অসুখের ওষুধ হয় না।"

বলে, আর কথা না বাড়িয়ে নিজের কেবিনে চলে গেল ফেবিয়ান।

পরদিন ৩০শে মার্চ সারাদিন ফেবিয়ানকে দেখলাম না। সন্ধ্যের দিকে ক্যাপ্টেন কর্সিকানের মুখে শুনলাম ওর বুকের অসুখের বৃত্তান্ত।

কাহিনীটা খুবই করুণ। বছর দুয়েক আগে ফেবিয়ানের মনে সুখ ছিল। বোম্বাইয়ের একটি মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। মেয়েটির নাম মিস হজেস। দুজনেরই ইচ্ছে ছিল বিয়ে করে ঘরসংসার পাতার। কিন্তু বিধি বাম। তাই মেয়েটির বাবা কলকাতার এক ব্যবসাদারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের ঠিক করে ফেললে। তাতে নাকি কারবারের সুবিধে হবে। মেয়ের মতামতের ধার ধারল না। মিস হজেসকে সেই থেকে আর দেখতে পায়নি ফেবিয়ান।

"নাম কি মেয়েটির?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"এলেন হজেস।"

"Ellen! তাই বুঝি ঢেউয়ের মধ্যে E আর L অক্ষর কল্পনা করছিল ফেবিয়ান কাল সন্ধ্যায়। স্বামীর নাম কি?"

"হ্যারি ড্রেক।"

"ড্রেক! কিন্তু সে-লোক তো এই জাহাজেই রয়েছে।"

"বলেন কী!" চমকে উঠলেন কর্সিকান।

ঠিক এই সময়ে হ্যারি ড্রেক গেল কিছুদূর দিয়ে। আমি দেখিয়ে দিলাম ক্যাপ্টেন কর্সিকানকে। দপ করে চোখ জ্বলে উঠল ক্যাপ্টেনের।

বললেন আমাকে—"আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। ওরা কেউ কাউকে চেনে না। চিনলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। ফেবিয়ান পাগলা কুকুরের মত মারবে হ্যারিকে। আমাদের দুজনকেই দেখতে হবে, ওদের মধ্যে যেন কোনমতেই টক্কর না লাগে। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হলে হ্যারি মরবেই। জানেন তো,

মেয়েরা স্বামীকে যত ঘৃণাই করুক না কেন, স্বামীর হত্যাকারীকে কখনো বিয়ে করতে পারে না।"

পরের দিন বিলিয়ার্ড রুমে ডক্টর পিটফার্জের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম ক্যাপ্টেন কর্সিকানের। যথারীতি অভিশপ্ত গ্রেট-ইস্টার্ণের গল্প কথা শুনতে হল কর্সিকানকে।

ভুরু কুঁচকে বললেন—"অভিশপ্ত? আপনি এ-সব কুসংস্কারের বিশ্বাস করেন?"

উল্টে পিটফার্জই প্রশ্ন করলেন—"আমার গল্প শুনে বিশ্বাস হল না বুঝি? আপনি অবিশ্বাস করলেও গ্রেট-ইস্টার্ণের ধ্বংস তো আটকাবে না।"

বিদ্রূপের হাসি হেসে কর্সিকান বললেন—"সত্যি?"

ক্ষেপে গেলেন পিটফার্জ—"আপনি জানেন কি এ-জাহাজে রাত্রে ভূত ঘুরে বেড়ায়?

"ভূত! ভূতেও বিশ্বাস করেন?"

"করি বৈকি। এতগুলো লোকে কি মিথ্যে বলছে? অফিসাররা দেখেছে এ-ভূতকে। খালাসীরাও দেখেছে। অন্ধকার চেপে বসলেই একটা ছায়া মূর্তি ঘুরে বেড়ায় জাহাজে। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়—আর দেখা যায় না।"

লাফিয়ে উঠলেন কর্সিকান—"আসুন তাহলে আজ রাতে ভূত দর্শন করা যাক।"

"আজ রাতেই?" শুধোলেন পিটফার্জ।

"নিশ্চয়।"

পরের দিন পয়লা এপ্রিল। আটলান্টিকের শোভা সত্যিই দেখবার মত।

ক্যাপ্টেন কার্সিকানের মুখে শুনলাম, ডক্টরকে নিরাশ হতে হয়েছে কাল রাতে। ভূত দেখা দেয় নি।

ফেবিয়ানের খোঁজে ডেকে গেলাম। ফেবিয়ান ডেকেই পায়চারী করছিল। মুখে কথা নেই। চোখে শূন্য দৃষ্টি। ওর ভাবনায় বাধা দিলাম না। নীরবে হাঁটতে লাগলাম পাশে পাশে।

এমন সময়ে হ্যারি ড্রেককে দেখা গেল অদূরে। কয়েকবার পাশ দিয়ে ঘুরেও গেল। আমার চোখের ভুল কিনা জানি না, প্রতিবারেই মনে হল হ্যারি ড্রেক যেন বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেল ফেবিয়ানের পানে।

ফেবিয়ানের ও চোখ এড়ায়নি সেই চাহনি। তাই জিজ্ঞেস করল আমাদের—"লোকটা কে?"

"জানিনা," মিথ্যে বললাম আমি।

"লোকটার চাহনি মোটেই ভাল নয়।" বলল ফেবিয়ান।

তেসরা এপ্রিল ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি আর কর্সিকান। এখনো পর্যন্ত হ্যারি বনাম ফেবিয়ান সংঘর্ষ লাগেনি। কর্সিকানের সঙ্গে এই সব কথাই বলছি আর দেখছি জাহাজ-ক্যাপ্টেনের হুঁশিয়ারি। দিন কয়েক আগেই একটা জাহাজ এ-অঞ্চলে ভাসমান হিম-শৈলর ঘায়ে জখম হয়েছে। তাই আধ ঘণ্টা অন্তর বালতি ভর্তি জল তুলছেন সমুদ্র থেকে। তাপ মাত্রা মাপছেন। এক ডিগ্রী টেম্পারেচার কমলেও অন্য পথে যাবেন।

ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এলাম জাহাজের পেছন দিকে। জায়গাটা অন্ধকার। সবাই এখন সেলুন ঘরে আমোদ প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু ঐ নির্জন অন্ধকারে দেখলাম একটি ছায়ামূর্তি নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে আছে রেলিংয়ে ভর দিয়ে। কর্সিকান অন্ধকারের মধ্যেও কিন্তু চিনতে পারল দেহের আদল দেখে।

বলল —"ফেবিয়ান।"

ফেবিয়ান-ই বটে। ঝকঝকে চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওপর ডেকের দিকে। কি দেখছে ওখানে? চোখের মধ্যে এত দীপ্তি কেন?

কাছে গেলাম। নরম গলায় ডাকলাম—"ফেবিয়ান।"

ফেবিয়ান শুনতেও পেলনা। এবার ডাকল কর্সিকান। কেঁপে উঠল ফেবিয়ান।

বলল—"চুপ! চুপ!"

বলে, হাতের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল ওপরের ডেকের এক ধারে একটা প্রায় অদৃশ্য চলন্ত মূর্তি।

"ব্ল্যাক লেডী।" বিষাদ-শীর্ণ হাসি হেসে বলল ফেবিয়ান।

সারা গায়ে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম সেই কথা শুনে। ভাল করে ঠাহর করে দেখলাম, প্রায়-অদৃশ্য ছায়ামূর্তিটা একজন মহিলার। মাথায় ঘোমটা, গায়ে বোরখার মত জামা।

"পাগল একদম পাগল দেখতে পাচ্ছেন না?" ফিসফিস করে বলল ফেবিয়ান। কিন্তু একই রকম প্রদীপ্ত চোখে চেয়ে রইল আগুয়ান ছায়ামূর্তির পানে। এগিয়ে আসছে ব্ল্যাক লেডী। কাছে আসতে আমি স্পষ্ট দেখলাম,

ঘোমটার মধ্যেও যেন চোখ দুটো তার জলজল করছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়েছিল ফেবিয়ান। সম্মোহিতের মত পা বাড়াল সামনে মেয়েটির আরো কাছে যাওয়ার জন্যে।

ব্ল্যাক লেডী কিন্তু জলজলে চোখে চেয়েছিল ফেবিয়ানের পানেই। আচমকা এক হাত রাখল বুকের ওপর। থমকে দাঁড়াল। বুকের স্পন্দন পরখ করল যেন। পরক্ষণেই ত্রস্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

ফেবিয়ান আর ধরে রাখতে পারল না নিজেকে। হাঁটুর জোর যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল দারুণ উৎকণ্ঠায়। তাই হাঁটু ভেঙে ধপ করে নত জানু হয়ে বসে পড়ল ডেকের ওপর।

বলল ফিসফিসিয়ে "এসেছে! সে এসেছে!"

পরক্ষণেই ফিরে এল সম্বিৎ—"ভুল! ভুল! চোখের ভুল!"

ক্যাপ্টেন কর্সিকান দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন ফেবিয়ানের হাত—"এসো ভাই। এখানে আর না।"

ফেবিয়ান ভুল দেখেনি। ঠিকই দেখেছিল। ভাগ্যের ফেরে ফের দুজনে কাছাকাছি এসেছে। ফেবিয়ান আর এলেন।

ফেবিয়ান আর একটা কথা ঠিক বলেছে। এলেন সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। আশাভঙ্গের বেদনা, একটা বদমাস চরিত্রহীনের স্ত্রী হওয়ার যন্ত্রণা এবং জমাট অশ্রু মন ভেঙে দিয়েছে এলেনের। মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

আমি আর কর্সিকান বুঝলাম সবই। কিন্তু কিছুই ভাঙলাম না ফেবিয়ানের কাছে। দুজনেই ঠিক করলাম, এলেনের কাছে ঘেঁসতে দেওয়া হবে না ফেবিয়ানকে।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে সেরকম নয়। পরের দিন যা ভয় করছিলাম, তাই ঘটল।

বিকেল চারটে নাগাদ নকল রেস খেলার আয়োজন হল ডেকের ওপর গ্রেট-ইস্টার্ণের দুপাশ দিয়ে চওড়া রাজপথ আছে। রেসকোর্স তৈরী হল সেই রাস্তায়। এক চক্কর ঘুরলেই ১৩০০ গজ পাড়ি দেওয়া হবে। কম রাস্তা নয় জনা বারো গাট্টাগোট্টা নাবিক ঘোড়া হতে চাইল। মানে, দুপায়ে দৌড়ে ঘোড়ার অভাব পূরণ করবে তারা। বাজী ধরা হল এই বারো জনের ওপর। মাঝখানে দূরবীন হাতে দাঁড়িয়ে গেল যাত্রীরা। হট্টগোলে কানের পোকা পর্যন্ত বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল।

দেখলাম, হ্যারি ড্রেক যথারীতি কর্কশ কণ্ঠে উল্টোপাল্টা কথা বলছে। হাঁকডাক ছাড়ছে। কেউ পাত্তাও দিচ্ছেনা। ফেবিয়ানও বাজী ধরেছে। কিন্তু নির্লিপ্তভাবে।

শুরু হল রেস! শেষও হল। জিতল একজন স্কচ নাবিক। হ্যারি তক্ষণি হেঁকে উঠে বললে—"বাজে কথা। আবার দৌড় হোক।"

ঠিক তখুনি আশ্চর্য শান্ত গলায় ফেবিয়ান বলে উঠল—"না, আর রেস হবে না।"

"কেন?" হ্যারির গলায় যেন বাঘ ডাকল। "আপনি জিতেছেন বলে?"

"না। আমি হেরেছি। কিন্তু দৌড় ঠিকভাবেই হয়েছে—বাজে ভাবে নয়। সুতরাং আর না।"

"কে মশাই আপনি? আমাকে শেখাতে এসেছেন····· "

কথার মাঝে বাধা পড়ল কর্সিকান এসে পড়ায়। ঝগড়া আর গড়াতে দিলেন না। মুখ লাল করে এবার অন্তর-টিপুনি ছাড়ল হ্যারি—"তাই বলুন! একা লড়বার ক্ষমতা নেই—দোসর চাই।"

কান পর্যন্ত লাল হয়ে গেল ফেবিয়ানের। কিন্তু কর্সিকান তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন কেবিনের দিকে। যেতে যেতে ফেবিয়ান শুধু একটা কথাই বললে—"সুযোগ পেলেই ওর দাঁত কপাটি উড়িয়ে ছাড়ব আমি।"

পাঁচই এপ্রিল ভারী সুন্দর সূর্যোদয় ঘটল আটলান্টিকের ওপর।

ফেবিয়ানের ঘরে গিয়ে ফেবিয়ানকে পেলাম না। খটকা লাগল মনে। তাহলে কি এলেনের কাছেই গিয়েছে ফেবিয়ান? অসম্ভব নয়।

তাই মেয়েদের গুলতানি মারার ঘরে গিয়ে দেখলাম এলেন আছে কিনা। তারপর গেলাম কেবিনের সামনে দিয়ে। কিন্তু কোনো কেবিনেই হ্যারি ড্রেকের নাম দেখলাম না। গোটা জাহাজটা ঘুরে এলাম। কিন্তু হ্যারি ড্রেকের নাম কোনো দরজায় না দেখে অবাক হলাম খুবই। স্টুয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করেও হ্যারি ড্রেকের কেবিনের ঠিকানা জানতে পারলাম না। শেষকালে সিঁড়ির নীচে মুখোমুখি দুসারি আধো-অন্ধকার কেবিন দেখলাম। দেখেই বুঝলাম, এলেনকে লুকিয়ে রাখবার এই হল প্রকৃষ্ট জায়গা। হ্যারি ড্রেক নিশ্চয় এখানেই আছে।

প্রত্যেকটা কেবিনের সামনে দিয়ে গেলাম। কিন্তু হ্যারির নাম লেখা দরজা চোখে পড়ল না। খুব দমে গেলাম। ফিরে আসছি সিঁড়ির দিকে, এমন সময়ে শুনলাম কে যেন গান গাইছে। মেয়েলী গলা। কান্নার মত

করুণ স্বর। গান ঠিক নয়। গুনগুন করে যেন বিলাপ করছে। শুধু স্বরটা খুব ক্ষীণভাবে কোনো একটা দরজার ফাঁক দিয়ে কানে ভেসে আসছে।

মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে রইলাম শুধু গানের শব্দগুলো শোনবার জন্যে। কিন্তু একবর্ণও বুঝলাম না। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনে চমকে উঠে লুকিয়ে পড়লাম অন্ধকার কোনে। হ্যারি ড্রেক নৃশংস পুরুষ। বউয়ের গান আড়ি পেতে শুনছি জানলে আমাকে আস্ত রাখবে না।

গানটা থেমে গিয়েছিল। একটু পরেই আবার শুরু হল। চোরা পায়ের শব্দও অনেকটা এগিয়ে এসেছে। একটা দরজার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছিল অলিন্দে। সেই আলোয় দেখলাম, ফেবিয়ান চোরের মত হাঁটছে আর কানখাড়া করে গানের শব্দগুলো শোনবার চেষ্টা করছে।

আমি যা পারিনি, দেখলাম ফেবিয়ান তা পারল। অন্ধ যে-ভাবে সুতো ধরে এগিয়ে যায়, ফেবিয়ানও তেমনি শুধু গান শুনে কি-এক অদৃশ্য আকর্ষণে এলেনের ঘরের দরজায় পৌঁছে গেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল আচ্ছন্নের মত। কি মতলব ওর? দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবে নাকি?

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে টানলাম ওকে সিঁড়ির দিকে। ফেবিয়ান বাধা দিল না। শূন্যগর্ভ কণ্ঠে শুধু বললে—"কার গান বলো তো?"

"জানি না," বললাম আমি।

"সেই পাগল মেয়েটার। কিন্তু ওর পাগলামির ওষুধ আমি জানি। একটু ভালবাসা পেলেই সেরে উঠবে।"

'ফেবিয়ান, চলে এসো। আর না।"

আর একটা কথাও বলল না ফেবিয়ান। ডেকে ফিরে এসে পা বাড়ালো নিজের কেবিনের দিকে।

সেই রাতে ঝড় উঠল। ঢেউয়ের দোলায় নাগরদোলার মত দুলতে লাগল ভাসমান নগরী। ভোরের দিকে টলতে টলতে ডেকে উঠে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই—একটা খুঁটির গায়ে লেপটে দাঁড়িয়ে আছেন শুধু ডক্টর পিটফাজ। ঝড়ের ধাক্কায় যেন আঠার মত সেঁটে রয়েছেন খুঁটির সঙ্গে।

অতি কষ্টে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ঝড়ের হুংকারের ওপরে গলা চড়িয়ে বললেন পিটফাজ—"কেমন? বলেছিলাম না গ্রেট-ইস্টার্ণ অভিশপ্ত জাহাজ? তীরে এসে তরী ডোবে কিনা দেখুন। সাইক্লোন বড় সাংঘাতিক জিনিস।"

কি আর বলব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ঝঞ্ঝার রুদ্রলীলা। সাইক্লোন কাটিযে পৌঁছোতে পারবে তো গ্রেট-ইস্টার্ণ?

গলার শিব তুলে পিটফার্জ বললেন—"বাঁচবার তুটো পথই খোলা আছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন কোনো পথটাই নেবেন না।"

"কেন নেবেন না?" আমিও চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"কেন না সামনেই একটা ফাঁড়া আছে।"

সেই ঝড়ে গ্রেট-ইস্টার্ণ ডুবে যায় নি। কিন্তু জাহাজের একজন নাবিক প্রাণ হারিয়েছিল। ঝড় থামলে ক্যানভাসে মুডে সমুদ্রে সমাধি দেওয়া হল তাকে।

ঝড থামল বটে, জাহাজও ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল, কিন্তু খোলের মধ্যে জল ঢুকে ছোটখাট একটা লেক বানিয়ে ফেলল সেখানে। পাম্প বসানো হল খোলের জল সমুদ্রে ফিরিয়ে দেওবার জন্য। আমি কিছুক্ষণ সেই দৃশ্য দেখে ফিরে এলাম সেলুন ঘরে। বাইরে থেকেই শুনলাম ভীষণ হট্টগোল চলছে ভেতরে। তুটো কণ্ঠস্বর খুবই চেনা। কথা কাটাকাটি চলছে হ্যারি ড্রেক আর ফেবিযানের মধ্যে।

কি একটা ব্যাপারে যেন বাজী ধবা হযেছিল। ঝগডাব সূত্রপাত সেই থেকেই। সবেগে দবজা ঠেলে আমি যখন ঘবে ঢুকলাম, ঠিক তখনি হ্যাবির চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি তুলেছে ফেবিযান। কিন্তু ঘুসি নেমে আসবার আগেই ঝড়ের মত মাঝখানে এসে গেলেন ক্যাপ্টেন কর্সিকান।

খুব ঠাণ্ডা নিরুত্তেজ গলায ফেবিযান বললে—"ঘুসিটা গা পেতে নেওযার ইচ্ছে আছে না, নেই?"

"আছে বই কি। এই রইল আমাব কার্ড," বলে নিজের নাম লেখা কার্ডখানা ছুঁড়ে দিল হ্যারি ড্রেক।

কার্ডটা কুডিযে নিল ফেবিযান। চোখ বুলোনোব সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ।

"হ্যারি ড্রেক! আপনি! আপনি! আপনি!"

"হ্যাঁ আমি, ক্যাপ্টেন ফেবিয়ান," অবিচল কণ্ঠে জবাব দিল হ্যারি ড্রেক।

নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল একটা রহস্য। ফেবিয়ান জাহাজে উঠেছে, হ্যারি ড্রেক গোড়া থেকেই তা জানে। ঝগড়া বাঁধিযে ডুয়েল লড়বার ফিকিরে ঘুরছে যাত্রা শুরুর দিন থেকেই।

পরের দিন আটুই এপ্রিল হ্যারি ড্রেকের দোসর এসে জানিয়ে গেল, লড়তে যখন হবেই, তখন তা চটপট সেরে ফেলা ভাল। নিউইয়র্কে পৌছোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী নয় হ্যারি ড্রেক। আজই সন্ধ্যা ছটার সময়ে ওপরের ডেকে পেছন দিকে হ্যারি তরবারি নিয়ে হাজির থাকবে। ও জায়গায় ও সময়ে আর কেউ থাকে না। সুতরাং ক্যাপ্টেন ফেবিয়ান যেন হাজির হন তাঁর সহযোগীকে নিয়ে।

পাঁচটা দশ মিনিট ফেবিয়ানকে নিয়ে ওপরের ডেকে গেলাম আমি, পিটফার্জ আর কর্সিকান। তারও দশ মিনিট পরে একজন বন্ধুকে নিয়ে এল হ্যারি ড্রেক। মুখ উত্তেজনায় গনগনে। জিঘাংসায় জ্বলন্ত। বিদ্বেষে কালো। সে-তুলনায় ফেবিয়ান সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ওর মন এখানে নেই—এলেনকে নিয়ে তন্ময়।

তরবারি দুটো হাতে নিয়ে মেপে দেখলেন কর্সিকান। তারপর দুটোর মধ্যে থেকে একটা তরবারি টেনে নিল ফেবিয়ান—অপরটা এক ঝটকায় টেনে নিয়েই রুখে দাঁড়াল হ্যারি ড্রেক।

তখুনি সভায় লক্ষ্য করলাম, হ্যারি ড্রেক ল্যাটা। কিন্তু ফেবিয়ান নয়। তার মানে, এ-যুদ্ধে সুবিধে হ্যারির—অসুবিধে ফেবিয়ানের।

শুধু হল তরবারির লড়াই। অসিতে অসি ঠোকাঠুকির ঝনঝনানি আর ফুলকি বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যুতের মত চর্কী পাক দিতে লাগল ডেকের ওপর। দক্ষতায় কেউ কম যায় না। হ্যারি মারমুখো - ফেবিয়ান নির্লিপ্ত। হ্যারি উত্তেজিত - ফেবিয়ান প্রশান্ত।

এক রাউণ্ড লড়বার পর সামান্য বিরতি। ফেবিয়ানের বাহু দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে।

আবার শুরু হল লড়াই। আকাশও পাল্লা দিয়ে মুখ কালো করেছিল এতক্ষণ। এবার বিদ্যুৎ চমকালো, মেঘ ডাকল। ঠন-ঠন ঠনাঠন শব্দে তলোয়ারে তলোয়ারে লড়াই চলল বিরাম বিহীন ভাবে!

আচমকা তলোয়ার নিয়ে ফেবিয়ানের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল হ্যারি। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললাম। কিন্তু এক ঝটকায় হ্যারিকে সরিয়ে দিয়ে তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিল ফেবিয়ান।

ঘৃণা কর্কশ কণ্ঠে বললে হ্যারি – "তলোয়ার কুড়িয়ে নিন।"

শুনতে পেল না ফেবিয়ান। একদৃষ্টে চেয়ে রইল উল্টো দিকে।

দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম ব্ল্যাক লেডীর বোরখা ঢাকা কৃষ্ণকালো মূর্তি। পায়ে-পায়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আসরের দিকেই এগিয়ে আসছে এলেন।

আবার কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হ্যারি। কিন্তু ফেবিয়ানের কানে সে কথা ঢুকল না। হঠাৎ মাথার ওপর তলোয়ার তুলে চেঁচিয়ে উঠল হ্যারি—"এলেন! তুমি এখানে কেন?"

তারপরেই যা ঘটল তা শুধু উপন্যাসেই মানায়। আচমকা আকাশজোড়া ঝলসানিতে দিন হয়ে গেল চারিদিক। একই সঙ্গে কানফাটা বজ্রনিনাদ এবং পরক্ষণেই অন্ধকার। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। একটু পরে চোখ সয়ে যাবার পর দেখলাম, এলেন তখনো এগিয়ে আসছে। নাকে ভেসে এল গন্ধকের গন্ধ। এলেন ঝুঁকে দাঁড়াল ফেবিয়ানের ওপর। পরক্ষণেই তাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল হ্যারির দিকে।

হ্যারি তলোয়ারটা মাথার ওপর তুলেই দাঁড়িয়েছিল একইভাবে। মুখটা শুধু কালো হয়ে গিয়েছিল। দেখেই ঘোর সন্দেহ হল আমার। মাথার ওপর তলোয়ার তুলে বজ্রকে কি নিজের ওপরেই ডেকে আনল হ্যারি ড্রেক?

এলেন গিয়ে হ্যারির কাঁধ ছুঁতেই বুঝলাম, সন্দেহ আমার মিথ্যে নয়। হাতের ছোঁয়া লাগতে না লাগতেই গড়িয়ে পড়ল হ্যারি। আর নড়ল না।

৯ই এপ্রিল নোঙর ফেলল গ্রেট ইস্টার্ণ। নোঙর তুলবে ১৬ই এপ্রিল। এই সাতদিন জাহাজ মেরামতে যাবে। বেশ কয়েক জায়গায় জখম হয়েছে গ্রেট-ইস্টার্ণ।

নিউইয়র্কে পা দিলাম বিকেল তিনটের সময়ে। শহর দেখা সাঙ্গ হলে ছোট জাহাজে চেপে নায়গারা দেখতে গেলাম। পিটফার্জ আমার সঙ্গে ছিলেন। কর্সিকান আগে বেরিয়ে গিয়েছিল ফেবিয়ান আর এলেনকে নিয়ে।

১২ই এপ্রিল নায়গারা পৌছোলাম। ১৩ই এপ্রিল পিটফার্জকে নিয়ে পা দিলাম কানাডার মাটিতে। সেইখানেই দেখা হয়ে গেল কর্সিকানের সঙ্গে। শুনলাম, ফেবিয়ানকে এখনো চিনতে পারেনি এলেন। তবে ডাক্তারা বলেছেন, চিন্তার কারণ নেই। এলেন ভাল হয়ে উঠবে।

দেখলাম, দূরে নায়গারা জলপ্রপাতের ধারে একটা চ্যাটালো পাথরের ওপর প্রস্তরমূর্তির মত বসে রয়েছে এলেন। পেছনে দাঁড়িয়ে ফেবিয়ান। নিষ্পলক চাহনি নিবদ্ধ এলেনের ওপরে।

নাটকীয় ঘটনাটা ঘটল চোখের সামনেই। নায়গারা শব্দটার মানে বজ্রনাদ। লক্ষ বজ্র একসঙ্গে গর্জন করলে যে-আওয়াজ হয়, একা নায়গারা যেন বিরামবিহীনভাবে চেঁচিয়ে চলেছে সেইভাবে। হুড়হুড় করে জল পড়ছে

অনেক উঁচু থেকে নীচে। জলের তোড়ে পাথর ক্ষইছে অবিরত। ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, বছরে নাকি একগজ পেছিয়ে আসছে নায়গারা। ভীষণ সুন্দর এই জলধারার পানে পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল এলেন। হঠাৎ যেন টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল প্রপাতের কিনারায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ফেবিয়ানও গেল পেছন পেছন।

পা দুটো ঈষৎ বেঁকে গেল এলেনের। যেন ঝাঁপ দিতে চাইছে। পরক্ষণেই পেছিয়ে এসে বলে উঠল আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে :

"হা ভগবান! এ কোথায় এলাম আমি?"

পরক্ষণেই নিশ্চয় টের পেল কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক পেছনটিতে, ঘাড় ফেরালো। ফেবিয়ানকে দেখেই নিমেষ মধ্যে চোখ-মুখের ভাব পাল্টে গেল। আলো জ্বলে উঠল চোখের মধ্যে :

"ফেবিয়ান! ফেবিয়ান! এত দেরী কেন তোমার?"

ফেবিয়ানের মুখ থেকে রক্ত নেমে গিয়েছিল এতক্ষণ। দুহাতে খপ করে ধরে ফেলল এলেনকে।

জ্ঞান হারালো এলেন! হোটেলে নিয়ে এলাম দুজনকে। একটানা ঘুমিয়ে ওঠার পর সম্পূর্ণ হয়ে উঠল এলেন।

ইউরোপ ফেরবার পথে দেখি পিটক্যাজ আবার গ্রেট-ইস্টার্নের টিকিট কেটেছেন।

"কি ব্যাপার! আপনি?" অবাক হলাম আমি।

"গ্রেট-ইস্টার্নের ধ্বংস দেখতে হবে না?" অম্লান বদনে বলল অদ্ভুত মানুষটা।

এই ঘটনার আটমাস পরে একটা টেলিগ্রাম পেলাম পিটক্যাজের কাছ থেকে। অবশেষে গ্রেট ইস্টার্ন ধ্বংস হয়েছে। তার স্বাস্থ্য আগের চাইতেও ভাল আছে।

চলন্ত বাড়ী

(স্টীম হাউস)

[পরাধীন মানুষের পক্ষ নিয়ে অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন জুল ভের্ণ। তাঁর দুটি শ্বাসরোধী উপন্যাসে ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণের উল্লেখ আছে। ক্যাপ্টেন নিমোর মত বিখ্যাত চরিত্রকে তিনি ভারতীয়রূপেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়াও বহু উপন্যাসে ভারতবর্ষের পটভূমিকাকে ব্যবহার করেছিলেন।

সিপাই বিদ্রোহ তাঁর মনে নাড়া দিয়েছিল খুবই। ক্যাপ্টেন নিমো কল্পনায় এসেছিল সেই কারণেই। কিন্তু আগাগোড়া ভারতীয় পটভূমিকায় উপন্যাস কখনো লেখেন নি—এইটি ছাড়া।

'স্টীম হাউস' দু'খণ্ডে লেখা উপন্যাস। কানপুরের ভয়ংকর (Demon of Kanpur) আর বাঘ ও বেইমান (Tiger & Traitors)।

ক্যাপ্টেন নিমোর মত কাল্পনিক হিরো নয়, ইতিহাসের নায়ক নানাসাহেবকে দেখা যাবে আশ্চর্য এই রোমাঞ্চিকার পাতায় পাতায়।

জুল ভের্ণ ভারতবর্ষে কখনো আসেন নি। তাই তার ভারত-বর্ণনা যে কোনো ভারতীয়ের কাছে ত্রুটিযুক্ত মনে হবে। কাহিনী সংক্ষেপিত করার সময়ে এই অংশগুলিই বাদ পড়েছে মূলকাহিনীকে অব্যাহত রেখে।]

প্রথম খণ্ড ঃ

কানপুরের ভয়ংকর

(ডেমন অফ কানপুর)

ফেরারী ফকির

দেওয়াল থেকে ইস্তাহারটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে জনারণ্যে হারিয়ে গেল অদ্ভুত ফকিরটা।

বয়স তার বেশী নয়। খুব জোর চল্লিশ। বলিষ্ঠ চেহারা। অফুরন্ত স্বাস্থ্য, শক্তি আর প্রাণ প্রাচুর্যে টলমল মুখচ্ছবি। বাঁ হাতের একটা আঙুল নেই।

ইস্তাহারটা ছিঁড়ে ফেলবার সময়ে গনগনে আগুন জ্বলে উঠল যেন ফকিরের চোখে। ঔরঙ্গাবাদের সর্বত্র লেপ্টে দেওয়া হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তির বার্তা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে শহর-গ্রামেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে নানাসাহেবকে ধরিয়ে দিলে। শোনা যাচ্ছে, এই বোম্বাই প্রদেশেই নাকি লুকিয়ে আছে সে। জীবিত অথবা মৃত—যে অবস্থাতেই হোক—তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে আর অভাব থাকবে না।

ঔরঙ্গাবাদের পথেঘাটে এই নিয়ে তখন জোর গুলতানি চলছে। টাকার লোভ কার নেই? ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের পর দশবছর কেটে গেছে। বিপ্লবী নেতা নাকি নেপালে আত্মগোপন করেছিল। গোরা পল্টনের তাড়া খেয়ে চীনের দিকে পালিয়েছে। কিন্তু খবর এসেছে এখন সে এখানেই —এই ঔরঙ্গাবাদে।

নানাসাহেব। অশরীরীর মত এতদিন বৃটিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরছে বিশাল এই উপমহাদেশের পথে ঘাটে-প্রান্তরে। বিদেশী শাসনকর্তা শত্রুর শেষ রাখতে চায় না। কে জানে, দুর্ধর্ষ লোকটা আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবে কিনা চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে?

ঔরঙ্গাবাদের রাস্তায় রাস্তায় এই নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। এক জায়গায় একটা বড় জটলা দেখে দাড়িয়ে গেল ফকির।

জ্বলন্ত চোখে শুনল একজনের লম্বা চওড়া বক্তিমে। নানাসাহেবের শিবিরে দীর্ঘদিন বন্দী থাকতে হয়েছিল তাকে। তাই সে চেনে নানাসাহেবকে। সুতরাং প্রতিশোধ নেওয়ার এই মওকা সে ছাড়বে না। ফেরারীকে ধরিয়ে দেবেই।

কে যেন ভীড়ের মধ্যে থেকে বললে—"কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন? আঙুল কাটা একটা লাশও পাওয়া গেছে।"

"মিথ্যে কথা।" গর্জে উঠল সেই লোকটা। "আঙুল কেটে একটা লাশকে হাজির করা হয়েছিল পুলিশের সামনে। নানাসাহেব এখনো বেঁচে আছে। আমি তা প্রমাণ করব।"

চকিতে আঙুল কাটা হাতটা আলখাল্লার মধ্যে লুকিয়ে ফেলল ফকির। চোখ জ্বলতে লাগল বাঘের মত।

কিন্তু গা ঢাকা দিল না। দূর থেকে নজর রাখল সেই লোকটার ওপর। দেখল, সে ভীড় থেকে বেরিয়ে গেল নদীর ধারে। নদীতে ভাসছে একটা নৌকো। ঐখানেই তার ডেরা।

তখন সন্ধ্যে হয়েছে। আচমকা লোকটার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফকির। নির্জন নদীতীরে লুটিয়ে পড়ল তার ছুরিবিদ্ধ দেহ।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও কিন্তু সে চিনতে পারল ঘাতককে। দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। শুধু বলল—"আপনি!"

"হ্যাঁ, আমি। নানাসাহেব।"

কিন্তু আর তো সময় নেই। আজ রাতেই যে শহর ছেড়ে পালাতে হবে। এদিকে কড়া পাহারা বসেছে নগর দ্বারে।

পাঁচিল ধরে হাঁটতে লাগল ফকির। অনেক দূর আসবার পর একটা শেকড় বেয়ে উঠে এল পাঁচিলের ওপর। তারপর একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে এগোলো অনেকখানি। এখনো মাটি রয়েছে তিরিশ ফুট নীচে।

আচমকা গর্জে উঠল বন্দুক। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। পর-পর আরও কয়েকবার অগ্নিবর্ষণের শব্দে কেঁপে উঠল নিশুতি রাত। গুলির ঘায়ে ভেঙে গেল ডালটা।

অত উঁচু থেকে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়েও কিন্তু আহত হল না ফকির। অপূর্ব কৌশলে মাটি স্পর্শ করেই ছিটকে গেল। উল্কাবেগে মিলিয়ে গেল গোরা পল্টনের শিবিরের পাশ দিয়ে রাতের অন্ধকারে।

ঔরঙ্গাবাদ পড়ে রইল পেছনে।

মঁসিয়ে মঁক্লের ডাইরী :

আমি ভারতবর্ষে এসেছিলাম ইঞ্জিনীয়ার ব্যাঙ্কস এর সঙ্গে আড্ডা মারবার জন্যে। ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল প্যারিসে। তারপর ব্যাঙ্কস চলে এল ইণ্ডিয়ায় রেলপথ বসানোর কাজ নিয়ে। বন্ধুত্ব কিন্তু চিড় খেল না।

১৮৬৭ সালে ভারতবর্ষে এলাম শুধু ওর সঙ্গেই চুটিয়ে আড্ডা মারতে। সেইসঙ্গে ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন শহরগুলোও দেখবার ইচ্ছে ছিল। ব্যাঙ্কস-ও ছুটি পেয়েছিল মাস কয়েকের। তাই আমার ভারত ভ্রমণের প্রস্তাব শুনে আনন্দে আটখানা হল।

কলকাতায় পৌঁছোতেই আলাপ জমে গেল ব্যাঙ্কস-এর আরো কজন প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্যাপ্টেন হুড আর কর্ণেল মুনরো।

কর্ণেল মুনরো থাকেন কলকাতার একধারে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। ভীড়-ভাট্টা নেই। সাহেব পাড়া বলেই হট্টগোল কম।

কর্ণেলের বয়স এখনো পঞ্চাশ পেরোয়নি। প্রায় সমবয়েসী সার্জেন্ট ম্যাক-নীল তাঁর নিত্যসঙ্গী। একই বাড়িতে থাকেন দুজনে। দুজনেই অবসর

নিয়েছেন মিলিটারী থেকে একই সময়ে। লড়াই করেছেন একসাথে। অবসর জীবনও যাপন করেন একসাথে। দেশে ফিরে যেতে মন চায়নি কারোরই।

কর্ণেল মুনরো দেশে ফিরে যান নি বিশেষ একটি কারণে। ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষ একশ বছর আগে এসেছিলেন ইণ্ডিয়ায়। স্যার হেক্টর মুনরো তাঁর নাম। ভীষণ নিষ্ঠুর আর বদমেজাজী। একবার একটা ছোটখাট বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে একসঙ্গে জনা তিরিশ বিদ্রোহীকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তোপের মুখে।

তাঁরই বংশধর কর্ণেল মুনরো। সিপাই বিদ্রোহের সময়ে উত্তর ভারতের নানা জায়গায় দারুণ লড়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রী কে হারান কানপুরে। বিদ্রোহী সিপাইরা খুন করে তাঁর প্রাণাধিকা স্ত্রী-কে।

সেই থেকে সিপাই বিদ্রোহ বা নানাসাহেবের নাম শুনলেই মাথা ঠিক রাখতে পারেন না কর্ণেল মুনরো। পল্টন থেকে অবসর নিয়েছিলেন শুধু একটি কারণে। নানাসাহেবকে খুঁজে বের করবেন এবং নিজের হাতে খুন করবেন।

কিন্তু বৃথাই তিনি আর সার্জেণ্ট ম্যাক-নীল গোটা ভারতবর্ষ তোলপাড় করে বেড়ালেন। নানাসাহেব প্রত্যেকের চোখে ধুলো দিয়ে রইলেন। তারপর খবর এল, নেপালে মারা গিয়েছেন নানাসাহেব।

নিশ্চিন্ত হলেন কর্ণেল মুনরো। কিন্তু সিপাই-বিদ্রোহ বা নানাসাহেবের নাম সইতে পারতেন না। বন্ধুরা তা জানতেন। তাই ভুলেও নাম উচ্চারণ করতেন না তাঁর সামনে। এমনকি নানাসাহেব যে ফের বোম্বাই প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছেন, এ খবরটিও চেপে যাওয়া হয়েছে তাঁর কাছে। শুনলেই তো এখুনি ছুটবেন স্ত্রীহত্যার প্রতিশোধ নিতে।

এহেন কর্ণেল মুনরোর কলকাতার বাড়ীতে বসে এক সন্ধ্যায় জোর গুলতানি চলছে। আড্ডায় রয়েছি আমি, কর্ণেল মুনরো, ব্যাঙ্কস আর ক্যাপ্টেন হুড। ক্যাপ্টেন হুডের বয়স কম। ভারতবর্ষকে নিজের দেশের মতই ভালবাসেন। অ্যাডভেঞ্চার পেলে যেন হাতে স্বর্গ পান। ভীষণ ডাকাবুকো টাইপের লোক। ভালো শিকারী। বাঘের যম।

কথা হচ্ছিল দেশভ্রমণে যাওয়া নিয়ে। আমি আর ব্যাঙ্কস বেড়াতে বেরোবো শুনে আসর সরগরম। কর্ণেল মুনরো অবশ্য ঘরকুনো মানুষ। কোথাও বেরোতে চান না। ক্যাপ্টেন হুডের ইচ্ছে নয় রেলে চেপে দেশ বেড়ানো। না হাঁটলে মজা কিসে? ব্যাঙ্কস তাই শুনে তাঁকে ঠাট্টা করতেই আমি বললাম—"সব চাইতে ভালো হত যদি নিজের বাড়ীটা নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরোনো যেত।"

তাই শুনে হো-হো করে হেসে উঠল ব্যাঙ্কস—"শামুক নাকি ?"

আমি বললাম—"শামুক কিন্তু নিজের খোলার বাড়ী নিয়েই বেড়াতে বেরোয়। কারও ধার ধারে না।"

কর্ণেল মুনরো এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার বললেন—"নিজের বাড়ীতে বসে দেশ বেড়ানোর মত মজা আর আছে নাকি।"

ধুয়ো ধরে বললেন হুড—"সত্যিই তো। রান্নাঘর থেকে আরম্ভ করে শোবার ঘর পর্যন্ত সঙ্গে থাকলে সুবিধে কত। ডাকবাংলোয় উঠতে হচ্ছে না, রাস্তায় খাবারও কিনতে হচ্ছে না।"

আজগুবি আলোচনা পেলে মানুষ আর কিছু চায় না। জোর কদমে এগিয়ে চলল বাজে কথার আড্ডা। এমন বাড়ী না হয় বানানো হল, কিন্তু টেনে নিয়ে যাবে কে? গরু ঘোড়া? দূর! দূর! তার চাইতে হাতি হলে তো আরো ভাল হয়! রাজারাজড়ার মতই বনবাদাড় ভেঙে মাঠবন পেরিয়ে কাদাডোবা টপকে এগিয়ে যাওয়া যাবে ভারতবর্ষের একদিক থেকে আরেকদিকে।

ব্যাঙ্কস অতিশয় ঝানু ইঞ্জিনীয়ার। ফস করে বলে বসল—"তার চাইতে স্টীম হাতি জুতলে কেমন হয়?"

"স্টীম হাতি?"

"নিশ্চয়। কত সুবিধে স্টীমের হাতিতে! খাওয়ানোর ঝামেলা নেই, দলাইমলাই করার হাঙ্গামা নেই, বুনো জানোয়ারের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকার দরকারও নেই। মেশিনটা চালু রাখার জন্যে লাগবে শুধু খানিকটা তেল আর কাঠ বা কয়লা। ভারতবর্ষের বনেজঙ্গলে কাঠ দেদার মিলবে।"

হুড বললেন—"সে তো পঞ্চাশ বছর পরের কথা।"

"দূর! দূর! পঞ্চাশ বছর কেন! স্টীম হাতি তো বানিয়েছি আমি।" বলল ব্যাঙ্কস।

"বানিয়েছেন? আপনি? বলেন কী?"

"সত্যিই বানিয়েছি। চলন্ত বাড়ীতে বসেই এবার ভারতবর্ষ দেখতে বেরোবো ভাবছি। কর্ণেল মুনরো, আপনি আসছেন?"

"নিশ্চয়", এককথায় রাজী হয়ে গেলেন কর্ণেল মুনরো।

আবার নানাসাহেব

রাতের আঁধারে গা ঢেকে ছুটে চললেন নানাসাহেব। নিরীহ ফকিরবেশী দুর্দান্ত নানাসাহেব। মারাঠা রাজবংশের মূর্তিমান অগ্নিশিখা—নানাসাহেব!

শিবাজীর মত তিনিও স্বপ্ন দেখছেন। এবারের বিদ্রোহ শুধু সিপাইদের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ অংশ নেবে তাতে। ভারতজোড়া আগুন জ্বালবেন নানাসাহেব। তাই তো নেপাল থেকে পালিয়ে এসেছেন বোম্বাইয়ের মাটিতে। বিদেশী কুত্তাকে দেশ ছাড়া না করা পর্যন্ত শান্তি নেই তাঁর। যারা নিষ্ঠুরভাবে নিধন করেছে রাজা-রাণী সেপাইদের, তাদের স্বহস্তে নিধন না করা পর্যন্ত ঘুম নেই তাঁর। কর্ণেল মুনরো এঁদেরই একজন। প্রয়োজন হলে কলকাতা পযন্ত ছুটে যেতে রাজী নানাসাহেব। মুনরোর রক্ত দেখতে বিশ্বের শেষপ্রান্তেও যেতে প্রস্তুত।

নিশুতিরাতে ছুটতে ছুটতে নানাসাহেব এসে পৌছোলেন ইলোরার পর্বত-গুহায়। পরিত্যক্ত এই পাহাড় মন্দিরে এখন কেউ থাকেনা। একটা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের মধ্যে গুটিসুটি মেরে প্রবেশ করলেন নানাসাহেব। আঙুল মুখে পুরে শিস দিতেই একটা আলো জ্বলে উঠল দূরে। তারপর কাছে এসে দাঁড়াল নেউলের মত একটি ক্ষিপ্রমূর্তি। নানাসাহেবের সহোদব ভাই এবং দোসর।

ফিসফিস করে কথাবার্তা হল। তারপর বেরিয়ে এল দুজনে। কিছু দূরে জঙ্গলেব মধ্যে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল কালাগনি—নানাসাহেবের বিশ্বাসী অনুচর।

ঘোড়া ছুটল টগবগিয়ে। অনেকক্ষণ পরে অনেক মাইল পেরিয়ে আসার পর ওঁরা পৌছোলেন অজন্তার বিখ্যাত উপত্যকায়। প্রবেশ পথে বিরাট জঙ্গল। আচমকা মাথার ওপরকার ডাল থেকে বানরের মত টুপ টুপ করে লাফিয়ে নেমে এল অনেকগুলো কৃষ্ণকালো মূর্তি। প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

চোখ বুলিয়ে নিলেন নানাসাহেব। সংখ্যায় তারা বেশী নয়। কিন্তু প্রত্যেকেই হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাঁর জন্যে।

"চলো", হেঁকে উঠলেন নানাসাহেব। নেকড়ের মত অনুচর ক'জন ছুটে চলল তাঁর ঘোড়ার পেছন পেছন। দেখতে দেখতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ছোট্ট দলটা।

মঁসিয়ে মক্লের ডাইরী লিখছেন

যথাসময়ে হাতিটানা বাড়ী নামল রাস্তায়। তাক লেগে গেল পথচারীর। গোলগোল চোখ করে দাঁড়িয়ে গেল ছেলেবুড়ো মেয়ে পুরুষ।

তাবৎ কলকাতা হতভম্ব হয়ে গেল সেই আশ্চর্য গাড়ী দেখে। এমন গাড়ী যে কল্পনাও করা যায় না! প্রকাণ্ড একটা কলের হাতি গড়গড় করে টেনে নিয়ে চলেছে দু'দুটো বাড়ীকে!

চোখ ছানাবড়ার মত করে চেয়ে রইল কলকাতাবাসীরা। দেখতে দেখতে শহর ছাড়িয়ে চলন্ত বাড়ী পৌঁছে গেল ফরাসি শহর চন্দননগরের পথে।

আশ্চর্য শকট সন্দেহ নেই। হাতির শুঁড় উঠছে নামছে হেলছে দুলছে তালে তালে ভক্ ভক্ করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে ডগা দিয়ে। শুঁড়ের মত দেখতে হলেও জিনিসটা আসলে ধোঁয়া বার করে দেওয়ার চিমনী ছাড়া কিছুই নয়।

পেল্লায় হাতির পিঠে একটা গম্বুজাকৃতি ঘর। চারদিকে কাঁচের জানলা বসানো। অনেকটা হাওদার মত দেখতে। কিন্তু হাতি ইঞ্জিনের চালক বসে আছে সেইখানে।

কলের হাতি তো। মাহুত দরকার হয় না। মাথায় ডাঙস মারারও প্রয়োজন হয় না। হাওদাঘরে বসে খটাখট করে শুধু সুইচ টিপলেই হাতির পেটে ঠাসা কলকজা চলবে খড়াং খড়াং করে। বয়লারে জল ফুটবে, আগুন কামরায় কাঠ বা কয়লা জ্বলবে, পিস্টন চালু হয়ে যাবে, পাম্প গোঁ-গোঁ গজরানি ছাড়বে, সিলিণ্ডারে বাষ্প জমা হবে। মাঝে মাঝে অবিকল বুনো হাতিব মত বৃংহিত ধ্বনিও ছাড়বে কলের হাতি কাস্তের মত বেঁকানো জোড়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

তোবা! তোবা! কাতাবে কাতাবে লোক দাঁড়িয়ে গেল রাস্তাঘাটে ইঞ্জিনীয়ার ব্যাঙ্কস-এর আশ্চর্য কীর্তি দেখতে। হাতির স্টীম ইঞ্জিনের ক্ষমতা অবশ্য নেহাৎ কম নয়। শদেড়েক হর্স পাওয়ার তো বটেই। অথচ স্টীল মোড়া বিরাট বপু ফেটে যাওয়ার ভয় নেই।

হাতি চলবে বন বাদাড় ভেঙে। শেকল দিয়ে বাঁধা পেছনের বাড়ীদুটো যাবে চাকার ওপর গড়-গড়িয়ে। অত্যন্ত মজবুত চাকা। খারাপ রাস্তাতেও হড়কে যাবে না বা ভেঙে যাবে না। চাকার তলার দিকটাই কেবল দেখা যাচ্ছে। বাকী অংশ ইস্পাতের চাদরে মোড়া। দুটোবাড়ীই মন্দিরের অনুকরণে তৈরী। সামনে পেছনে বারান্দা। গম্বুজের ওপর ফুল লতাপাতার বাহার।

ব্যাঙ্কস অসাধারণ ইঞ্জিনীয়ার। তাই ডাঙা থেকে জলে ঝাঁপ দিলেও যাতে আজব শকট ডুবে না যায়, সেইভাবে বানিয়েছে কলকজা। মানে, হাতির পা-চাকা ঘুরবে স্টীমারের প্রপেলারের মত। বাড়ীদুটোর তলাতেও যেন নৌকো লাগানো আছে—দিব্বি ভাসবে জলের ওপর। ভারতবর্ষে নদী-নালা খানা ডোবার অভাব নেই। বাঁধানো রাস্তা সর্বত্র পাওয়া যায় না। ব্যাঙ্কস সেই ভাবেই তৈরী করেছে হাতি-গাড়ীকে।

কিন্তু কেন? খামোকা এ-গাড়ী তৈরীর প্ল্যানটা তার মাথায় এল কেন?

এল ভুটানের এক রাজার পীড়াপীড়িতে। প্ল্যানটা সেই রাজারই। হঠাৎ সখ হয়েছিল কলের হাতিতে চেপে শিকার করবেন। ব্যাঙ্কস নতুন কিছু করতে পারলে যেন বাঁচে। রাজার ফরমাস মত বিরাট হাতি খেলনা বানাতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গেল ঠিকই, কিন্তু হাল ছাড়ল না। শতেক অসুবিধে সত্ত্বেও শেষ করে আনল অভিনব যন্ত্র-যান।

ঠিক তখনি মারা গেলেন রাজামশায়। অলুক্ষুণে হাতিটাকে রাজপ্রাসাদে ঢোকাতে চাইল না রাজার ছেলেরা। সুতরাং ইঞ্জিনীয়ার ব্যাঙ্কস নাম মাত্র টাকায় তা কিনে নিলে কর্ণেল মুনরোর নামে।

এই সেই গাড়ী। বউ হারানোর শোকে মুহ্যমান কর্ণেল মুনরো পর্যন্ত উৎফুল্ল হলেন আশ্চর্য গাড়ীর ক্ষমতা দেখে। চড়ে বসলেন সামনের বাড়ীতে। সঙ্গে রইলাম আমি, ব্যাঙ্কস, হুড। ইঞ্জিন চালানোর জন্যে হাওদা-বাড়ীতে বসল স্টর। জাতে ইংরেজ। পেছনের বাড়ীতে সার্জেণ্ট ম্যাকনীলের তদারকিতে রইল ফায়ারম্যান কালোঁথ—জাতে ভারতীয়। কর্ণেলের বিশ্বস্ত চাকর গৌমি, রাঁধুনি পারাজার্ড—জাতে ফরাসি।

কলের হাতির নামটি বড় মিষ্টি—বেহেমথ!

আশ্চয এই বেহেমথের দৌলতে ঘরের আরামে ভারতবর্ষ দেখতে বেরোলাম আমরা। ঘরের আরাম, মানে বাড়ীতে বসে থাকলে যাকিছু আরাম পাওয়া যায়, চলন্ত বাড়ীতে তার কোনোটার অভাব রইল না। খাবার ঘরে বসে খেয়েছি, শোবার ঘরে শুয়েছি, লাইব্রেরী ঘরে গল্পর বই পড়েছি। জানলা দিয়ে শুধু তাকিয়ে দেখেছি নতুন নতুন দেশ, গ্রাম, গাছ, বাড়ী। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। গোটা বাড়ীটাই গড়গড় গড়গড় করে চলেছে… চলেছে· চলেছে! আমরা ঘুমোচ্ছি, খাচ্ছি, আড্ডা মারছি আর জানলা দিয়ে দু চোখ মেলে দেশ দেখছি!

এইভাবেই বর্ধমান শহর দেখলাম। তারপর এলাম আরো চওড়া রাস্তায়। আস্তে আস্তে গুম মেরে গেলেন কর্ণেল মুনরো। সার্জেণ্ট ম্যাকনীলও মনিবের মত কথা কমিয়ে ফেলল। বেশ বুঝলাম, দশ বছর আগেকার কথা মনে পড়েছে দুজনের। সিপাই বিদ্রোহের আগুন যেখানে সব চাইতে বেশী জ্বলেছিল, সেই দিকেই ক্রমশঃ এগোচ্ছে বেহেমথ। সুতরাং অন্যমনস্ক হওয়া স্বাভাবিক। পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছে তো।

গয়ায় এসে মজার অভিজ্ঞতা হল। মাঝরাতে স্টর এসে ডেকে তুলল

আমাদের। বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, কাতারে কাতারে সাধুসন্ন্যেসী সটান শুয়ে আছে রাস্তার ওপর। বেহেমথের যাওয়ার পথ বন্ধ।

দেখেই চিনলাম। গয়ার তীর্থযাত্রী। গতকাল দেখেছি এদেরই, কিন্তু এরা এখানে কেন? বেহেমথের পথ জুড়ে এভাবে শুয়েই বা আছে কেন?

হত্যে দেওয়ার কারণটা বুঝিয়ে দিলেন হুড। বললেন—"এতবড় হাতি কখনো দেখেনি তো এরা। সত্যিকারের হাতি যতবড হয়, এ হাতি তার চাইতেও বড়। হাতিদের মধ্যে দানব হাতি বলা চলে। তাই ওরা ভেবেছে, নিশ্চয় স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে এ হাতি। তাই শুয়ে আছে। ভক্তি দেখাচ্ছে।"

ব্যাঙ্কস কিন্তু শংকিত হল। বললে—"শুধু ভক্তি দেখালে তো চিন্তা ছিল না। আমার ভয় হচ্ছে। শেষ পযন্ত রাস্তা আটকে না ছায় এরা। সাধু-সন্ন্যেসীর দল। গায়ে চোট লাগানোও চলবে না আচ্ছা জ্বালায় পড়লাম তো। কালোথ!"

ফায়ারম্যান কালোথ সাড়া দিল সঙ্গে সঙ্গে—"হুজুর?"

"বেশী করে কাঠ ঠাসো। পুরো স্টীম তৈরী রাখো।"

একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটতে লাগল বটে। কিন্তু ভক্তবৃন্দের সরে যাওয়ার লক্ষণ দেখলাম না। এদিকে স্টীম বোঝাই বেহেমথ থরথর করে কাঁপছে। জ্যান্ত হাতি হলে বলতাম, উত্তেজনায় কাঁপছে। কিন্তু তাতো নয়। ফুলস্পীডে ছুটে যাওয়ার জন্যে তৈরী বেহেমথ, অথচ যেতে পারছে না। শুঁড় দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে গল গল করে। স্টরের পাশে ব্যাঙ্কস নিজে বসেছে। খুব সাবধানে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বেহেমথকে ভক্তদের খপ্পর থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। কেউ জখম হলে আর রক্ষে নেই।

"হট যাও! হট যাও!" হাঁক দিল ব্যাঙ্কস। কিন্তু কে কার কথা শোনে? তীব্র শব্দে সিটি দিল বেহেমথ। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি শোনা গেল। এবার ভক ভক করে সাদা ধোঁয়া বেরোলো শুঁড় দিয়ে, চাকাও ঘুরল, কিছু ভক্ত সরেও গেল—

পরক্ষণেই আঁৎকে উঠলাম আমি। দেখলাম, বেশ কিছু ভক্ত বেহেমথের পায়ের তলায় শুয়ে পড়ছে!

আমার চীৎকারে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বেহেমথ। হুড মহাখাপ্পা হয়ে বললে—"কাণ্ড দেখেছেন? ভগবানের হাতি তো! তাই সোজা স্বর্গে যেতে চায় পায়ের তলায় থেঁতো হয়ে!"

ঘাবড়ে গেল ব্যাঙ্কস! কি করবে এ পরিস্থিতিতে? পরক্ষণেই বুদ্ধি এল মাথায়। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর!

বেহেমথের পেটের তলায় অনেকগুলো নল ছিল বাড়তি বাষ্প বের করে দেওয়ার জন্যে। সেই নল দিয়েই হুস হুস করে গরম বাষ্প ছাড়তে লাগল ব্যাঙ্কস।

রগড় দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লাম আমরা। হাতির গোদা চাকা পায়ের তলায় চ্যাপ্টা হওয়া না হয় পুণ্যের ব্যাপার। গরম স্টীমে ঝলসানোর মধ্যে কোনো পুণ্য নেই। সুতরাং গায়ে ফোস্কা পড়তেই চিড়-বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠল ভক্তরা। রাস্তা সাফ হতেই ছুটতে লাগল বেহেমেথ। দেখতে দেখতে ভক্তরা পড়ে রইল পেছনে!

কাশীতে এসে টের পেলাম ফেউ লেগেছে পেছনে।

বেনারস অত্যন্ত প্রাচীন শহব। কিন্তু ঘিঞ্জি। তাহলেও প্রাচীন দেবালয়, অদ্ভূত সুন্দব গঙ্গার ঘাট, মসজিদ, রাস্তাঘাট দেখতে দেখতেই কোথা দিয়ে কেটে গেল সময়। কর্ণেল মুনরো সার্জেন্ট ম্যাকনীলকে নিয়ে গঙ্গার পাড় বরাবর বেড়াতে বেরোলেন; হুড গেলেন পুরোনো দোস্তদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি আর ব্যাঙ্কস চষে ফেললাম গোটা কাশী। গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বলছি। কথা প্রসঙ্গে কর্ণেল মুনরোর নামটা একটু জোরেই বলে ফেলেছিলাম আমি।

অদূরে দাঁড়িয়েছিল একটা লোক। বাঙালি বলেই মনে হল বেশভূষা দেখে। মুনরোর নাম শুনেই ভীষণ চমকে উঠল।

তারপর থেকেই দেখলাম, ছায়ার মত আমাদের পেছন পেছন ঘুরছে লোকটা। মুনরোর নাম শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওপর তার এত নেকনজরের রহস্য বুঝলাম না। কি চায় সে? মুনরোর ঠিকানা?

অনেক জায়গায় ঘুরে ফের ফিরে এলাম গঙ্গার ঘাটে। আর থাকতে পারলাম না। ব্যাঙ্কসকে বললাম লোকটার কথা।

ব্যাঙ্কস বললে—"আমিও দেখেছি মুনরোর নাম শুনেই ওকে চমকে উঠতে। কিন্তু এমন ভান করো যেন আমরা ওকে দেখতেই পাইনি।"

লোকটা কিন্তু হঠাৎ ডিঙি নিয়ে ভেসে পড়ল গঙ্গায়। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল অগুন্তি নৌকোর ভীড়ে।

তখন সন্ধ্যে নামছে। হরেক রকম আতশবাজির দৌলতে আকাশ ঝলমল করছে।

বেহেমথে ফিরে এসে সার্জেন্ট ম্যাকনীলকে বললাম একটু হুঁশিয়ার থাকতে। বিদেশ বিভুঁয়ে কে কি মতলব নিয়ে ঘুরছে বোঝা ভার। বিশেষ করে, কর্ণেল মুনরোর নাম শুনে লোকটা অমন চমকে উঠল কেন?

এলাহাবাদে গিয়ে আরেকটা ঘটনা ঘটল।

শহর বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আলাদা আলাদা ভাবে। কর্ণেল গিয়েছিলেন সার্জেণ্টের সঙ্গে। বেহেমথে ফিরে এসে দেখলাম তিনি হঠাৎ আগের মতই গম্ভীর হয়ে গেছেন। হুঁ-হাঁ ছাড়া কথা বলছেন না। খাওয়াটাই মাটি হয়ে গেল তাঁর অকস্মাৎ গাম্ভীর্যের জন্যে।

ডিনার শেষ করে হঠাৎ কর্ণেল বললেন—"চলুন আমার সঙ্গে ক্যাণ্টনমেণ্টে।"

"এখন?"

"হ্যাঁ। একটা জিনিস দেখাবো।"

ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়ে রাস্তার পাশে থামের গায়ে সাঁটা একটা ইস্তাহারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন কর্ণেল।

এ সেই ইস্তাহার! নানাসাহেবের মাথার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন সরকারবাহাদুর।

আমরা চমকে উঠলাম না দেখে চকিতে কর্ণেল আঁচ করলেন, খবরটা আমরা আগেই জেনেছি। কিন্তু চেপে ছিলাম এতদিন।

জেরার মুখে সত্যি কথা বলতে বাধ্য হলাম। কর্ণেল গুম হয়ে রইলেন।

বললেন—"ম্যাকনীল গেছে গভর্ণরের কাছে। নানাসাহেব সত্যিই বোম্বাই এসেছে কিনা জানতে। যদি কথাটা সত্যি হয়, আজ রাতেই ট্রেনে চেপে আমি বোম্বাই যাবো।"

"তার আর দরকার হবে না," পেছন থেকে বলল ম্যাকনীল। তার হাতে একটা খবরের কাগজ। "গভর্ণর আপনাকে দিলেন পড়বার জন্যে।"

খবরটা একনিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম সকলেই। সাতপুরার কাছে সরকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে আঙুলকাটা নানাসাহেব।

কানপুর।

সারাদিন কর্ণেল মুনরো ঘুর ঘুর করেছেন দুটি ভগ্নস্তূপে। একটিতে কেটেছে তাঁর হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীর ছেলেবেলা। আর একটিতে বন্দী করে রেখেছিল সিপাইরা বাচ্চাকাচ্চা আর মেয়েদের। অকথ্য যন্ত্রণা চলেছিল তাদের ওপর। দুদিন পর কর্ণেল কানপুর ঢুকে আগে গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু বউ আর শাশুড়িকে দেখতে পাননি।

সেই থেকে পাগলের মত নানাসাহেবকে খুঁজছেন উনি। প্রতিহিংসা চাই। প্রতিহিংসা!

অতিকষ্টে তাঁকে আমরা ফিরিয়ে আনলাম বেহেমথে। এখানে আর নয়। কালই পালাবো এ-শহর ছেড়ে।

সন্ধ্যে নাগাদ হুডের মাথায় শিকারের খেয়াল চাপল। কারও কথা শুনল না। কালোথ আর গৌমিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বন্দুক ঘাড়ে করে।

রাত বেড়েই চলল, ফিরল না। এদিকে আকাশের মুখ পুড়ে গেল ঝড়ের আবির্ভাবে।

উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা।

আচমকা শেকল ছিঁড়ে ঝড়-দানব যেন লাফিয়ে পড়ল জঙ্গলের মাথায়। যেন দুম করে ফেটে গেল ঝটিকা-বোমা। এত তাড়াতাড়ি প্রভঞ্জনের হুহুংকার আরম্ভ হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি।

মর্মর ধ্বনি আর্তনাদে পরিণত হল! গোটা জঙ্গলের গাছগুলো ককিয়ে উঠল ঝড়-দানবের অত্যাচারে। মড়মড় করে ভাঙতে লাগল শুকনো ডাল, মেঘের মত উড়ে এল রাশি রাশি ঝরা পাতা। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে জানলা বন্ধ করে দিলাম আমরা।

ঝড়, ঝড়, শুধু ঝড়! বৃষ্টির নামগন্ধ নেই! কিন্তু অরণ্যের প্রভঞ্জন এত প্রচণ্ড, এমন রুদ্র হতে পারে সে ধারণা আমাদের কারোর ছিল না। তাই থ হয়ে দেখতে লাগলাম ঝড়ের টানে ডালপালা পাতা উড়ে যাওয়ার দৃশ্য। কান পেতে শুনলাম লক্ষ শাখা ভেঙে যাওয়ার প্রলয়ংকর ঐকতান।

আচম্বিতে বাজ পড়ল—ঠিক যেন মাথার ওপর।

আতংকে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম ক্ষণেকের জন্যে! ঝড়ের বেগে বেহেমথ উড়ে যায় নি, টলে পড়ে নি। ভারতীয় অরণ্যের সর্বনাশা সাইক্লোনও তাকে নড়াতে পারে নি। কিন্তু বাজের মার কি সইতে পারবে?

ঈশ্বর বাঁচিয়েছে! মাথার ওপর দিয়ে গিয়েও বাজ আছড়ে পড়েছে সামনের গাছটার ওপব। ঠিক মাঝখানে পড়েছে। ফালা ফালা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অতবড় গাছটা। পোড়া ছাল উড়ছে হাওয়ায়!

এমন সময়ে চীৎকাব শুনলাম—"আগুন! আগুন!"

পেছন ফিরে দেখলাম সেই দৃশ্য! অরণ্যে আগুন লেগেছে। শুকনো ডালপালায় লাফিয়ে লাফিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অগ্নিদেবতা। লক্ষ সর্পের মত লকলকে জিহ্বা মেলে ভয়ংকর সোঁ-সোঁ আর্তনাদে দিগন্ত কাঁপিয়ে আগুনের নারকীয় নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেছে ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, গাছে গাছে!

দাবানল! বইয়ের পাতায় দাবানলের কাহিনী পড়া এক জিনিস! আর

চোখে দেখা আর এক জিনিস। বিশেষ করে সে দাবানল যখন বিস্ময়কর বেগে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে।

রাক্ষসের মত হাসছে ঝড়ো হাওয়া! হাততালি দিয়ে বিদ্যুতের মশাল নিয়ে ছুটছে আকাশময়!

কোথায় হুড? কোথায় কালৌথ? কোথায় গৌনি? ওদের ফেলে যাওয়া ছাড়া আর তো উপায় নেই! দাবানল যে এসে গেল।

ধীর-মস্তিষ্কে হাওদা-কেবিনে গিয়ে বসল ব্যাঙ্কস। সঙ্গে স্টর। ঠিক তিন মিনিট অপেক্ষা করা হবে। দাবানল তার মধ্যেই বেহেমথকে ছুঁয়ে ফেলবে ঠিকই—কিন্তু পালানো যাবে তখনও!

শুঁড় তুলে বংশীধ্বনি করল বেহেমথ। তীক্ষ্ণ, তীব্র শব্দ প্রমত্ত ঝড়ের হুংকারকেও ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে। যেখানেই থাকো না কেন হুড, গৌনি, কালৌথ—ছুটে এস বাঁশির আওয়াজ লক্ষ্য করে।

কিন্তু কেউ এল না। কারো বন্দুকের সংকেত শোনা গেল না। বেঁচে আছে তো?

হাতির চোখে এবার আলো জ্বলে উঠল। বাইরে থেকে চোখের মত দেখতে হলেও ও দুটো আসলে স্টীম ইঞ্জিনের সার্চ লাইট। ভীষণ দ্যুতিময় অতিকায় টর্চ বললেও চলে। আলোয় ভেসে গেল সামনের বন। কিন্তু কেউ ছুটে এল না আলোর বৃত্তে।

হতাশ হয়ে পড়লাম আমরা। ব্যাঙ্কস স্টিম ছাড়তে যাচ্ছে। এমন সময়ে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকনীল—"এসে গেসে! এসে গেছে!"

সত্যিই এসে গেছে তিন মূর্তিমান। গৌমিকে ধরাধরি করে বনতল থেকে বেরিয়ে আসছে হুড আর কালৌথ।

চক্ষের নিমেষে টেনে তোলা হল ওদের চলন্ত বাড়ীর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের বেড়াজালের মধ্যে দিয়ে লাফ দিয়ে ছিটকে গেল বেহেমথ।

কিন্তু গৌমি বেঁচে আছে তো? আছে বইকি। বাজটা পড়েছিল ওর পাশেই গাছের মাথায়। হাতের লোহার পাতমারা বন্দুক ছিটকে গেছে, একটা পায়ে কোনো সাড় নেই এবং জ্ঞান হারিয়েছে তখন থেকেই। ভাগ্যিস, বাঁশি বাজিয়েছিল বেহেমথ, নইলে এ যাত্রা আর ফিরতে হত না। অসংখ্য ঝুরিনামা এই রাক্ষুসে জঙ্গলে পথ হারিয়ে উল্টোদিকে ছুটছিল হুড।

কিন্তু দাবানল সমানে ছুটে আসছে পেছনে। পাল্লা দিয়ে ছুটছে বেহেমথ। সে এক অত্যাশ্চর্য দৌড় প্রতিযোগিতা। বনের আগুনের সঙ্গে কলের হাতির রেস।

আচমকা বনের আগুনের সঙ্গে মিতালি পাতালো আকাশের বাজ। কড়-কড়-কড়াৎ করে চোখ ধাঁধিয়ে ফের বাজ পড়ল মাথার ওপর। কিন্তু কিছুই হল না।

কেন? না, আশ্চর্য হাতি বেহেমথ নিজের লটপটে কানের ওপর দিয়ে বাজ টেনে নিয়ে চালান করে দিয়েছে মাটির মধ্যে। ইস্পাতের দেহ তো— বজ্রের বিদ্যুৎ আর দ্বিধা করেনি। সড়াৎ করে ঢুকে গেছে মা ধরিত্রীর বুকে। রেহাই পেয়েছি আমরা।

ভাবলেও অবাক লাগে! এ হাতি যদি রক্ত মাংসের হাতি হত তো বাজের ধাক্কায় ঠিকরে গিয়ে পাকসাট খেয়ে অক্কা পেত সঙ্গে সঙ্গে! ইস্পাতের হাতি বলেই তোয়াক্কা করল না আকাশের বজ্রকেও।

হঠাৎ টাটকা হাওয়ার ঝাপটা লাগল চোখেমুখে। গরম হলকা পড়ল পেছনে। যেন জলন্ত উনুনের মধ্যে থেকে বিপুল বেগে বেরিয়ে এল বেহেমথ।

অরণ্য শেষ হয়েছে। প্রাণে বেঁচে গেলাম আমরা।

এরপর একটা মজার ভয়ংকর ঘটনা ঘটল। একটা ঘটনা না বলে দুটো ঘটনা বলা উচিত অবশ্য।

রেওয়ার দিকে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ একটা চিতাবাঘ লাফিয়ে উঠেছিল বেহেমথের কাঁধে। সত্যি হাতি ভেবেই থাবা মারতে এসেছিল। কিন্তু নখ ভোঁতা হবার জোগাড় হতেই বিষম আক্রোশে ঝুলে পড়ল কান ধরে।

হুড তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে তাগ করল চিতাকে। আমাকে বলল—"মক্রের, বাঘ কখনো মেরেছো? মারোনি? ঠিক আছে, এইটাকে মারো। তুমি ফসকালে আমি মারব। ফক্স!…"

ফক্স তক্ষুণি একটা দোনলা বন্দুক গুঁজে দিলে আমার হাতে। বাঘটা ততক্ষণে হুডকে দেখে ফের উঠে বসেছে হাতির কাঁধে। ল্যাজ আছড়াচ্ছে পটাপট শব্দে। লাফালো বলে!

আমি দড়াম করে বন্দুক ছুড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠে এক লাফে নীচে পড়ল চিতা। চোখের পলকে মিলিয়ে গেল জঙ্গলে। হুড গুলি করবার সময়ও পেল না।

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বেহেমথ। বন্দুক তুলে জঙ্গলে ছুটে গেল হুড। কিন্তু বাঘ তো দূরের কথা। এক ফোঁটা রক্তও দেখতে না পেয়ে ফিরে এল হতভম্ব মুখে।

বললে—"মক্রেরের গুলি নির্ঘাৎ লেগেছিল। সেইজন্যেই গুলি করিনি আমি। কিন্তু রক্তের দাগ কোথায়?"

ম্যাকনীল বললে—"ছররা লাগলে কি রক্ত বেরোয় ?"

"মানে ?"

"দোষটা ফক্সের। বন্দুকে টোটার বদলে ছররা পুরে রেখেছিল। এই দেখুন বাকী গুলিটা।"

সত্যিই তাই! রেগে গিয়ে হুড হুকুম দিলে—"মারাত্মক ভুল। ফক্স, দুদিন ঘর থেকে বেরোবে না।"

যথা আজ্ঞা, বলে মুখ চুণ করে চলে গেল ফক্স।

কিন্তু তারপরেই ঘটল সেই মজার ভয়ংকর ঘটনাটা।

আমাকে আর গৌমিকে নিয়ে শিকার করতে বেরিয়েছিল হুড। রাঁধুনি পারাজার্ড জানিয়েছে, ভাঁড়ার খালি। কিছু টাটকা মাংস না হলেই নয় গৌমি-ও সেবে উঠেছে। সুতরাং শিকাবী হুডকে আর আটকানো গেল না। আমাকে নিযে নেমে এল চলন্ত বাড়ী থেকে।

জঙ্গলের মধ্যে হন্যে হয়ে ঘুবলাম অনেকক্ষণ। জিভ বেরিয়ে গেল—শিকাব পেলাম না। সঙ্গে টোটাভবা বন্দুক আনিনি ইচ্ছে করেই। ছররা আছে পাখী মারার জন্যে। কিন্তু কোথায় পাখী ?

আচমকা পড়লাম বাঘের সামনে। প্রকাণ্ড বাঘ। রাজকীয় চালচলন। একটুও অস্থির হল না। ল্যাজ আছড়ালোনা। ধীরে সুস্থে একপা একপা করে এগিয়ে এল হুডের দিকে।

হুড ছররা ভরা বন্দুক তুলেই তাগ করেছিল বাঘের চোখের দিকে। সিসের গুলি যখন নেই, তখন ছররা দিয়ে চোখ অন্ধ করে দেওয়া ছাড়া বাঁচবার আর পথ নেই। চোখে ছররা ছুড়তে হলে খুব কাছ থেকে গুলি করতে হবে। সুতরাং আসুক বাঘ এগিয়ে।

আতংকে কাঠ হয়ে গেলাম সেই ভয়ংকব দৃশ্য দেখে। নিষ্কম্পদেহে বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে হুড। বাঘ মহাশয় গজেন্দ্রগমনে এগিয়ে আসছে এমনভাবে যেন থালায় খাবাব সাজানোই আছে। টপ করে মুখে পুরে দিলেই হল।

আশ্চর্য কঠিন স্নায়ু বটে হুডের। যে কোনো শিকারী ঐ অবস্থায় ঠকঠক করে কাঁপতে থাকত। হুড কিন্তু উল্টে এক পা এগিয়ে গেল—আর মাত্র হাত তিনেক ব্যবধান বাঘেব সঙ্গে।

পুঁচকে দুপেয়েটার সাহস দেখে প্রকাণ্ড বাঘটা যেন এবার হো-হো করে হেসে উঠবে মনে হল। থমকে দাঁড়িয়ে যেই লাফাতে যাবে, অমনি পর-পর দুবার ট্রিগার টিপল হুড। দ্বিতীয় ট্রিগার টিপতে হলো বাঘের গায়ে নলচে ঠেকিয়ে।

অবাক কাণ্ডটা ঘটল তারপরেই। শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে ধড়াশ করে আছড়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল ব্যাঘ্র মহাশয়।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হুড। পরক্ষণেই চীৎকার করে উঠল ভীষণ আনন্দে—"হুররে! ভাগ্যিস ফক্স ভুল করেছিল।"

"ফক্স কি ভুল করেছিল?" আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে শুধোলাম।

"ফক্স ভুল করে এই বন্দুকে ছররার বদলে সিসের টোটা ভরেছে। আর তোমাকে যে বন্দুকটা দিয়েছিল, তাতে ভরেছিল টোটার বদলে ছররা। বুঝলে তো? তাই বাঘ মরল এবার—প্রাণে বাঁচলাম আমরা! হুররে!"

গুলির খোল-টা বের করে দেখালো হুড। সত্যিই সিসের টোটা!

বেহেমথে ফিরে এসে হুড ডেকে পাঠালো ফক্সকে।

বলল—"যেহেতু তুমি দুটো ভুল করেছো, তোমার দু'দুগুণে চারদিন ঘরে বন্ধ থাকা উচিত। কিন্তু তার বদলে এই নাও একটা সোনার গিনি বকশিস দিলাম।"

বিনা বাক্যব্যয়ে গিনিটা পকেটে পুরে উধাও হল ফক্স।

এবার চলেছি নেপালের জঙ্গলের দিকে। পথে দেখছি কত বিচিত্র উদ্ভিদ। ভারতবর্ষ ছাড়া এমন আশ্চর্য গাছের শোভা বুঝি আর কোথাও দেখা যাবে না।

পথে আবার একটা মজার ঘটনা ঘটল। বেহেমথের সঙ্গে টক্কর দিতে এল রক্তমাংসের তিন-তিনটে হাতি।

জঙ্গলের ধারে জিরোচ্ছি সবাই। অদূরে সরাইখানায় অনেক সওদাগর আস্তানা নিয়েছে। একজন হিন্দুরাজকুমারও এসেছেন। তাঁর লটবহর দেখেই তাক লেগে গেল আমার। বিস্তর উট, হাতি, ঘোড়া, রথ আর ইয়ারবক্সী বিদূষক নিয়ে ভদ্রলোক বেরিয়েছেন দেশ বেড়াতে। নাম, প্রিন্স গুরু সিং।

হঠাৎ দেখলাম জনাকয়েক খানদানী পুরুষ এগিয়ে এল বেহেমথের দিকে। এদের মধ্যে রাজকুমার নিজেও ছিলেন। ভীষণ দাম্ভিক। টাকার গরম হলে যা হয় আর কি। ইংরেজকেও তোয়াক্কা করেন না।

তাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টিটকিরি মেরেছিলেন ভদ্রলোক কলের হাতি বানানো নিয়ে। ভূটানের রাজার উদ্ভট খেয়াল নিয়েও টিপ্পনী ছেড়েছিলেন। রক্তমাংসের হাতির চাইতে শক্তিমান যখন নয়, খামোকা কলকব্জা দিয়ে হাতি বানানো স্রেফ পাগলামি ছাড়া আর কি!

ব্যাঙ্কস মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল, বেহেমথ রক্তমাংসের হাতিদের ভুলে পটকান দিতে পারে ইচ্ছে করলে।

সঙ্গে সঙ্গে বাজি ধরলেন রাজকুমার। বেঁকা কথায় খোঁচাও মারলেন। অত টাকা কি আছে সাহেবের পকেটে?

মুখ রক্ষে করলেন কর্ণেল মুনরো। রাজকুমারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন তিনি।

তৎক্ষণাৎ পেল্লায় তিনটে হাতিকে নিয়ে আসা হল রাজকুমারের হস্তীযূথের মধ্যে থেকে। প্রকাণ্ড হাতি। চেহারা দেখেই তো বুক দুর-দুর করে উঠল ব্যাঙ্কস-এর। বেহেমথ পারবে তো এদের ঠেলা সামলাতে?

শুরু হল টক্কর দেওয়া। ব্রেক টিপে বেহেমথকে মাটি আঁকড়িয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল ব্যাঙ্কস। রাজকুমারের পাহাড় প্রমাণ হাতিরা এগিয়ে এসে ঠেলা মারল বেহেমথকে। কিন্তু কলের হাতির গায়ে পোকা ঠেলা মারছে মনে হল। একদম নড়ল না।

মুখ থমথমে হয়ে উঠল রাজকুমারের। মাহুতরা পর্যন্ত এবার ক্ষেপে গেল। তিন তিনটে হাতি বৃংহিত ধ্বনি করে আরো জোরে ঠেলা মারল বেহেমথকে। সাংঘাতিক ঠেলা! গাছ পর্যন্ত উপড়ে পড়ার কথা সে ঠেলায়।

বেহেমথ কিন্তু নির্বিকার। হেলেও পড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল অচল অটল দেহে।

এবার আক্রমণের পালা নিল ব্যাঙ্কস। ভক্ করে একতাল সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এল বেহেমথের শুঁড় দিয়ে। পরক্ষণেই গড়িয়ে গেল চাকা—তিন তিনটে হাতিকে ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল বেহেমথ।

হাতি তিনটেও যেন আবার উন্মত্ত হল। প্রাণপণে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল। আকাশ-ফাটা ডাক-ও ছাড়ল। কাতারে কাতারে লোক আশে-পাশে দাঁড়িয়ে গেল আশ্চর্য সার্কাস দেখতে।

সার্কাসই বটে! আচমকা বেহেমথের ঠেলায় উল্টে পড়ল দুটো হাতি। প্রিন্স গুরুসিং আর সইতে পারলেন না। এ দৃশ্য কি দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ হন হন করে চলে গেলেন নিজের শিবিরে। শেষ পর্যন্ত দেখবার জন্যে দাঁড়ালেন না।

কিছুক্ষণ পরেই প্রিন্সের অনুচর এসে এক থলি টাকা দিলে কর্ণেল মুনরোকে। বাজির টাকা নিতে হয়। সুতরাং হাত পেতে নিলেন কর্ণেল। কিন্তু কাছে রাখলেন না। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাজকুমারের অনুচরদের সামনে।

হেঁকে বললেন—"বখশিস দিলাম।"

ফের চাকা গড়ালো বেহেমথের। দেখতে দেখতে সরাইখানা পড়ে রইল পেছনে।

আমরা ধবলগিরির তলায় এসে পৌঁছেছি। হিমালয়ের গুরু-গম্ভীর দৃশ্য দেখছি আর ভাবছি না জানি এবার কি অ্যাডভেঞ্চার শুরু হয়। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে এখন আমরা অনেক উঁচুতে—কলকাতা অনেক পেছনে। এবার শুরু হবে নেপালের গহন-অরণ্য।

কিন্তু কেন যাচ্ছি সেখানে? নানাসাহেবের খোঁজে? কিন্তু বনের পাখীকে ধাওয়া করে কি ধরা যায়?

[মক্লের-এর ডাইরী এখানেই শেষ হল]

কে ঐ পাগলি?

সাতপুরার পাহাড়ের দিকে রাতের অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়েছিলেন নানাসাহেব। সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে ছিলেন তাঁর ভাই বালাজি রাও আর চাকর কালাগনি। ইলোরার অন্ধকার সুড়ঙ্গে যাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলেন নানাসাহেব—বালাজি রাও তারই নাম। একই রকম দেখতে দু ভাইকে।

সারারাত ধরে ঘোড়া চালিয়ে বিন্ধ্য পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়ে এসে পৌঁছোলেন নানাসাহেব। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের খেপিয়ে তোলা। তাদের নিয়ে নতুন বিদ্রোহ শুরু করা।

বেশ কিছু দিন পাহাড়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করবার পর ইস্তাহারের কথা ভুলে গেল সবাই। সরকারবাহাদুর ধরে নিলে নানাসাহেবের ফিরে আসার খবর সত্যি নয়।

তখন শুরু হল নানাসাহেবের আসল কাজ। বিদ্রোহী আদিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে নতুন আগুন জ্বালাতে। সঙ্গে রইল বালাজি রাও আর কালাগনি।

সবশেষে এলেন ভূপালে। ভীড়ের মধ্যে সদলবলে দাঁড়িয়ে তিনি মুসলমান শোভাযাত্রা দেখছেন, এমন সময়ে হাত পড়ল কাঁধের ওপর।

সচমকে পেছন ফিরলেন দুর্ধর্ষ নানাসাহেব। দেখলেন একটা পরিচিত মুখ। একজন বাঙালি। সিপাই বিদ্রোহের সময়ে যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছিল বিদ্রোহীদের হয়ে।

গুরুত্বপূর্ণ খবর এনেছে বিদ্রোহী বাঙালি। কর্ণেল মুনরোকে দেখা গেছে কাশীতে!

চোখ জ্বলে উঠল নানাসাহেবের। বালাজি রাও-কে বললেন—"এই যাত্রাই শেষযাত্রা কর্ণেলের। এই পাহাড়েই কবর দেব ওকে।"

কালাগনিকে তখুনি হুকুম দিলেন ছলছুতো করে মুনরোর দলে ভিড়ে যেতে। দশ মিনিটও গেল না। মুনরোর সন্ধানে রওনা হল কালাগনি।

নানাসাহেব রাতের আঁধারে গা ঢেকে এগোলেন সদলবলে। সকালবেলা একটা ছোট নদীর ধারে পৌছোলেন। অনুচররা ঘোড়া নিয়ে এগোলো সামনে। আচমকা বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল অদূরে।

মার মার শব্দে ছুটে আসছে একদল গোরা পল্টন। মুহুর্মুহু বন্দুক ছুঁড়ছে নানাসাহেবদের দিকে।

কয়েকজন লুটিয়ে পড়ল গুলি বিদ্ধ হয়ে। বাকী সবাই ঝাঁপ দিল জলে। ডাঙার মুমূর্ষুদের মধ্যে একজন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে অভিসম্পাতি দিল ইংরেজদের!

এগিয়ে এল গোরা পল্টন। দুজন গোরা চিনিয়ে দিল নানাসাহেবকে। মরবার সময়েও যে বিদেশীদের মুণ্ডপাত করতে চায়—এই সেই বিদ্রোহী?

বহু অনুচর পালিযেছিল জঙ্গলের দিকে। গোরা সৈন্য তাড়া করল তাদের পেছনে। দেখতে দেখতে জনশূন্য হল নদীতীর।

সহসা একটা ঝোপ নড়ে উঠল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বিচিত্র মূর্তি। এক পাগলি। এককালে সুন্দরী ছিল বোধহয়। ফর্সা রঙ। এখন বদ্ধ উন্মাদ। চোখে শূন্য দৃষ্টি। তার অতীত কেউ জানে না। কি অভিপ্রায়ে একটা জলন্ত মশাল নিয়ে রাতের আঁধারে ছুটে চলে মাঠে বনে প্রান্তরে পাহাড়ে—কেউ জানে না। আদিবাসীরা তাকে খেতে দেয়—কিন্তু ধরে রাখতে পারে না। সে ধরা দেয না কেবল ছুটে চলে। হাতে জলন্ত মশাল। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। কণ্ঠে শুধু এক মন্ত্র—"নানাসাহেব! নানাসাহেব!"

নিজের অজান্তেই এই পাগলি গোরা পল্টনদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে নির্জন এই নদীতীরে। গোরা-বাহিনীর অধ্যক্ষ পাগলির মুখে নানাসাহেবের নাম শুনে পেছন নিয়েছিল, পাগলি কিছুই জানতে পারে নি।

ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল সে। হেঁট হয়ে রইল নানাসাহেবের নিষ্প্রাণ দেহের ওপর। বুকের ক্ষতে আঙুল ডুবিয়ে রক্ত মাখল সারা গায়ে। আপন মনে মাথা নাড়ল কয়েকবার। তারপর ধীর পদে মিলিয়ে গেল পাহাড়ের গায়ে।

আদিবাসীরা অদ্ভুত এই উন্মাদিনীর একটা জুৎসই নাম দিয়েছিল। "ছুটন্ত আগুনের শিখা"—এ নাম শুধু তাকেই মানাত রাতের আঁধারে জলন্ত মশাল হাতে ছুটে চলার সময়ে।

ভোজবাজির মতই পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল "ছুটন্ত আগুনের শিখা"।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ

বাঘ ও বেইমান

(টাইগার অ্যাণ্ড ট্রেটর্স)

মক্লের আবার ডাইরী লিখছেন

হিমালয়ের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে পড়ল বেহেমথ। আকাশছোঁয়া ধবলগিরি চোখের সামনে। সাদা বরফে ছাওয়া পাহাড়, অদ্ভুত সুন্দর বনতল আর নির্ঝরিনীর ঝিরি-ঝিরি সংগীত—মাঝে কলের হাতি বেহেমথ।

যে বেহেমথকে এতদিন পাহাড়-প্রমাণ মনে হয়েছিল, হিমালয়ের পাহাড়ের সামনে তাকে মাছির মতই মনে হচ্ছে। শুঁড় তুলে প্রকাণ্ড একটা বীচ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সে। পেছনে শেকল বাঁধা আমাদের চলন্ত বাড়ী। মন্দিরগুলোর গম্বুজে ফুল লতাপাতার কারুকাজ থাকায় গাছপালার চাঁদোয়ার সঙ্গে দিব্বি মিল খেয়ে গেছে। বেমানান শুধু ঐ বিদকুটে যন্ত্রটা—বেহেমথ।

মুনরো তো বলেই ফেললেন—"গির্জের গায়ে মাছি বসছে যেন।"

বড় সুন্দর উপমা দিলেন মুনরো। বিধাতার নিজের হাতে সাজানো এই পর্বতমালা যেন তাঁরই উপাসনা মন্দির। বেহেমথ সেখানে বিদঘুটে মাছি ছাড়া কিছুই নয়।

দীর্ঘ দুমাস একটানা ছুটে চলেছি। একদিনও পুরো বিশ্রাম নিইনি। দু'একঘণ্টার বেশী কোথাও দাঁড়াইনি, রাতটুকু ছাড়া।

ব্যাঙ্কস তাই বললে—"হুড, যাও, এবার মনের আনন্দে শিকার করো। চট করে আর এখান থেকে নড়ছি না।"

"কেন?"

"কলকাতা থেকে বেরিয়েছি দুমাস আগে। বেহেমথের কলকব্জায় তেল দেওয়া দরকার। কালোথ আর স্টরের ওপর সে ভার দিয়েছি। সুতরাং আমাদের এখন ছুটি। মনের আনন্দে বনে জঙ্গলে টহল দেওয়া যাবে। বাঁশীর আওয়াজে ছুটে আসতে হবে না।"

কথা হচ্ছিল খাবার ঘরে বসে। ওদের জোর গলার চেঁচানিতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। আমি ঘরে ঢুকে শুনলাম সোল্লাসে বলছে হুড—"ফক্স, কি শুনলে?"

"আজ্ঞে, শুনেছি।"

"আমার আটচল্লিশ নম্বর বাঘটা তাহলে পাব বলছ ?"

"আজ্ঞে, তাতে আর আশ্চর্য কী !"

কলকাতা থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত এই এক কথা শুনে শুনে কান পচে গেল আমাদের। বাঘ মারা ছাড়া আর কথা নেই হুড আর ফক্সের মধ্যে। হুড সবশুদ্ধ সাত চল্লিশটা বাঘ মেরেছে। হাত নিশপিশ করছে আর একটা শার্দুলকে শার্দুল-স্বর্গে পাঠানোর জন্যে। ফক্সও কম যায় না। হুডের চাইতে খানকয়েক কম বাঘ মেরেছে সে-ও।

সুতরাং দুঁদে শিকারীদের পাল্লায় পড়ে আর বসে থাকা গেল না বেহেমথের ডাইনিংরুমে। সবাই মিলে বন্দুক নিয়ে হই চই করে নেমে এলাম মাটিতে। জঙ্গলে ঢোকার সময়ে হুঁশিয়ার করে দিল হুড। বাঘ মারার মত আনন্দ আর নেই ঠিকই, কিন্তু বাঘের থাবায় পটল তোলার মত নিরানন্দও আর নেই। সুতরাং সাধু সাবধান !

শুধু কি বাঘ ! চার পেয়ে শ্বাপদদের তবুও তো দেখা যায়, তাদের গজরানি শুনে হুশিয়ার হওয়া যায়। ঘাসের বুকে লুকিয়ে সরসরিয়ে ছুটে এসে নিঃশব্দে যারা বিষ ঢেলে দেয় রক্তে, সেই সাপদের মত মহাশত্রুদের রুখব কি দিয়ে ? কিন্তু দল বেঁধে মৃগয়া করতে গেলে ওসব ভয় মাথায় থাকেনা।

কিন্তু অচিরে চমকে উঠলাম অদ্ভুত একটা জিনিস দেখে।

জঙ্গলের মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ঠিক মাঝখানে গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী একটা অদ্ভুত বস্তু। পাখীর বাসা অতবড় হয় না। জংলীদের কুঁড়েও নয়—হলে দরজা জানলা থাকত।

থমকে দাঁড়ালাম আমরা। ভ্যাবাচাকা খেয়ে চেয়ে রইলাম কিম্ভূত-কিমাকার জিনিসটার দিকে। ঠিক যেন অতিকায় মোচা বসানো মেঝের ওপর। মোচার গা তৈরী হয়েছে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে। মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হয়েছে গুঁড়িগুলো। মোচার ছাদেও আড়াআড়ি ভাবে বসানো গাছের গুঁড়ি। ছাদ থেকে একটা লম্বা গুঁড়ি হ্যাণ্ডেলের মত এগিয়ে এসেছে সামনে। শক্ত লতা জড়িয়ে আছে হ্যাণ্ডেলের ডগায় এবং মোচার ছাদে।

ভড়কে গেল হুড নিজেও। ভারতবর্ষের অনেক জঙ্গল সে চষে ফেলেছে। কিন্তু এরকম সৃষ্টিছাড়া জিনিস তো কখনো দেখেনি !

পা টিপে টিপে আরো কাছে এগিয়ে গেলাম আমরা। চারদিক নিস্তব্ধ। প্রকাণ্ড মোচার ভেতর থেকেও কোনো শব্দ আসছেনা।

হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল ব্যাঙ্কস। হাসতে হাসতে বলল—"সাবাস ! ইঁদুর কল দেখেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম সবাই !"

"ইঁদুর কল মানে?" সন্দিগ্ধ সুরে বললে হুড। "হাতির মত ইঁদুর নাকি?"

"আরে তা নয়। বড় জন্তু ধরার খাঁচা-কল। বানানো হয়েছে অবিকল ইঁদুর কলের অনুকরণে। ঐ দ্যাখো কাঠের ডাণ্ডা লতা দিয়ে বাঁধা। ভেতরে খাবার বাঁধা ওজন ঝুলছিল লতার অন্য প্রান্তে। টান পড়তেই ডাণ্ডা ছিটকে গেছে—পাল্লা পড়ে গেছে—হুড়কোটা সড়াৎ করে নেমে পাল্লা এঁটে দিয়েছে।"

এতক্ষণে বুঝলাম, ব্যাক্কস ঠিক ধরেছে। খাঁচাকলই বটে। ইঁদুর কলের রাক্ষুসে সংস্করণ।

আমাদের হুকুমে গৌনি তড়াক করে বানরের মত লাফিয়ে উঠল মোচার মাথায়। মাত্র ছফুট উঁচু খাঁচাকল। লম্বায় বারো ফুট চওড়ায় ছফুট। লতা টেনে কাঠের ডাণ্ডাটা টেনে তুলতেই আমি, ব্যাক্কস, মুনরো আর ফক্স খাঁচার পেছন গিয়ে গায়ের জোরে টান মারলাম লতায়। একটু একটু করে পাল্লা উঠতে লাগল ওপরে।

বন্দুক বাগিয়ে হেঁট হয়ে উঁকি মারল হুড। পাল্লা তখন মাত্র একফুট উঠেছে। বাঘ থাকলে ঐ ফাঁক দিয়েই সড়াৎ করে বেরিয়ে আসত। কিন্তু কেউ এল না।

আরো টান মারলাম চার জনে। পাল্লা আরো উঠল। কিন্তু তবুও কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না। ববং একটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা গেল।

নাক ডাকার আওয়াজ। কে যেন পাশ ফিরে শুল এবং সশব্দে হাই তুলল!

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল হুডের। অন্ধকার কোণে কি একটা নড়ে উঠতেই বন্দুক তাগ করল সেইদিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট গলায় হাউ মাউ করে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল ভেতরে—"গুলি করবেন না! গুলি করবেন না! আমি মানুষ! আমি মানুষ!'

বলতে বলতে জলজ্যান্ত একটা মানুষ তীরের মত ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। দারুণ চমকে লতা ছেড়ে দিলাম আমরা। দুম করে পাল্লাটা ফের নেমে এল খাঁচা-কলের মুখে।

হুড কিন্তু বন্দুক সরালো না। আগন্তুকের বুকের পানে নল তুলে রইল আগের মতই। কাঁইমাই করে বললে আগন্তুক—"আমি বাঘ নই স্যার। বন্দুকটা দয়া করে নামান।"

"কে আপনি?" শুধোলো ব্যাক্কস।

"হ্যাচারালিস্ট ম্যাথিয়াস ভ্যান গুইট।" বলে গড়গড় করে অনেকগুলো জন্তুর আর দুটো কোম্পানীর নাম বলে গেল লোকটা। লণ্ডন আর হামবুর্গের কোম্পানী। জ্যান্ত জন্তু বিক্রী করা তাদের ব্যবসা।

ম্যাথিয়াসের চেহারা দেখে হাসি পেল আমাদের। বছর পঞ্চাশ বয়স। গোল মুখ। পিটপিটে চোখ। উলটোনো নাক। চুল থেকে নখ পর্যন্ত সব কিছুই সব সময়ে নড়ছে, ছটফট করছে। সার্কাসের ক্লাউনের মত। কথা বললেও হাত-পা ছোঁড়ে—না বললেও শূন্যে ঘুসি লাথি মারে। ম্যাথিয়াস আরও পরিচয় দিলে নিজের। এককালে মাস্টারি করতে গেছিল। কিন্তু ছাত্ররা এমন হাসত তাকে দেখে যে হাতেনাতে জন্তু বিদ্যা চর্চায় মন দিয়েছে। অর্থাৎ জন্তুদের জ্যান্ত ধরে চালান দিচ্ছে নানান চিড়িয়াখানায় ইউরোপের দুটো কোম্পানীর হয়ে। মাইল দুয়েক দূরে তার ক্রাল, মানে গ্রাম। স্থানীয় লোকদের নিয়ে সে এই খাঁচাকলটি বানিয়েছিল বাঘ ধরবে বলে। গতকাল একলা এসেছিল বাঘ পড়েছে কিনা দেখবার জন্যে। বেরোনোর সময়ে আপনা থেকেই একটা হাত শূন্যে ছিটকে যাওয়ায় ওজন সরে যায়—পাল্লা বন্ধ হয়ে যায়।

তখন থেকেই পরমানন্দে ঘুমোচ্ছিল ম্যাথিযাস। ঘুম ভাঙতেই দেখল বন্দুকের নল তার দিকে ফেরানো।

এমন সময়ে জঙ্গলের মধ্যে থেকে হই চই করে বেরিয়ে এল কিছু জংলী। ম্যাথিয়াসের সাগরেদ। খাঁচাকলের পাল্লা টেনে তুলল তারা। ম্যাথিয়াস স্বাগতম জানালো আমাদের বাঘের খাঁচার ভেতরটা দেখে যাওয়ার জন্যে। আমরা ভেতরে ঢুকলাম বটে—কর্ণেল দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে।

হঠাৎ একটা বুকফাটা চীৎকার শুনলাম বাইরে। বেরিয়ে এলাম ছুটে। দেখি বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে কর্নেল। পায়ের কাছে একটা বিষধর সাপের অর্ধেক। বাকী অর্ধেকটা অদূরে একজন জংলীর বুকের ওপর। দাঁত দিয়ে কামড়ে রয়েছে বুকটা। মারা যাচ্ছে সে তীব্র বিষের জ্বালায়।

আর একজনকে দেখলাম কর্ণেলের সামনে। কালো বাঘের মত চেহারা। হিন্দু। হাতে জংলীদের কোপাই। ম্যাথিয়াসের অনুচর।

শুনলাম সব কথা। বিষধর সাপটা আর একটু হলে কর্ণেলকে ছোবল মারত। এই লোকটা বন থেকে বেরিয়েই জংলীর হাত থেকে কোপাই কেড়ে নিয়ে দুটুকরো করেছে সাপটাকে চক্ষের নিমেষে। কিন্তু এমনই কপাল—কাটা মুখটা ছিটকে গিয়ে বিষ ঢেলে দিয়েছে একজন জংলীর বুকে।

অভিভূত কণ্ঠে কর্ণেল বললেন—"তোমার উপকার ভুলব না। কি নাম তোমার?"

“কালাগনি,” বলল কালো হিন্দু।

ম্যাথিয়াসের নেমন্তন্ন এড়াতে পারলাম না। সদলবলে গেলাম মাইল দুই দূরের গ্রামে। শক্তখুঁটি দিয়ে ঘেরা বেশ নিরাপদ ঘাঁটি। একপাশে ছটা চাকাওলা খাঁচা। খালি নয় কোনোটাই। গজরানি শুনেই বুঝলাম মাংসখেকো শ্বাপদ দাপাদাপি করছে তার মধ্যে। আরেক পাশে অনেক-গুলো মোষ। খাঁচাগাড়ী টেনে নিয়ে যাওয়া তাদের কাজ। জন্তু ধরা শেষ হলেই খাঁচা টেনে নিয়ে পৌঁছে দেবে সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশনে। গোটা খাঁচাগুলোই রেলে চাপিয়ে বোম্বাই কি কলকাতা রওনা হবে ম্যাথিয়াস।

মোট কটা জন্তু ধরা পড়েছে? সাতটা বাঘ, দুটো সিংহ, তিনটে প্যান্থার আর দুটো লেপার্ড। ম্যাথিয়াস তাতেও খুশী নয়। আরো দুটো লেপার্ড, তিনটে বাঘ আর একটা সিংহ খাঁচায় পুরলেই ডেরা তুলবে এখানকার। বেশীদিন লাগবে না। কালাগনি লোকটা বেশ চালাকচতুর। সদ্য কাজে লেগেছে। কিন্তু জঙ্গলের কোথায় কি আছে সব নখদর্পণে। জন্তুর পায়ের ছাপ দেখেও বলে দ্যায় কে কি চালে চলছে, কোথায় যাচ্ছে, কখন ধরা পড়বে। তরাইয়ের জঙ্গল তো আর আফ্রিকার জঙ্গল নয়। জন্তু এখানে মেলাই।

আমরা কিন্তু চটপট স্টীম হাউসে ফেরবার জন্যে ব্যগ্র হলাম। এসব জঙ্গলে ম্যালেরিয়ার বড় প্রতাপ। ম্যাথিয়াস অবশ্য বাঘ সিংহের মতই ম্যালেরিয়ার ধার ধারে না। কিন্তু আমরা জ্বরে পড়লে দেখবে কে?

ম্যাথিয়াস লোকটা চেহারার দিক দিয়ে কমেডিয়ান হলে কি হবে, নিজের শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ল্যাটিন নামের খই ফুটতে লাগল মুখে। ভারতবর্ষের জন্তু-জানোয়ারদের নিজের সন্তানের মতই ভালবাসে। বন্দুকবাজ হুডের সঙ্গে টক্কর লাগল সেই কারণেই। তুবড়ির মত মুখ ছোটাল ম্যাথিয়াস। ভারত-বর্ষের কটা জন্তু দেখেছে হুড? গাইকোয়াড়ের চিড়িয়াখানায় গেছে কখনো? পাঁচশ বুলবুলের গান শুনেছে সেখানে? দেখেছে ষাট হাজার পায়রার বিবাহবার্ষিকী? গেছে কখনো মহীশূরের রাজপ্রাসাদে? গণ্ডার হাতি বাঘ গুণেও শেষ করা যাবে না সেখানে! ভারতবর্ষ সোনার দেশ, খানদানী জন্তুর দেশ। দেখে আশ মিটবে না! এন্তার ধরেও বন খালি হবে না। সবচেয়ে রাজকীয় হল সোঁদরবনের বাঘ! হ্যাঁ! বাঘের মত বাঘ! রাজার দেশে রাজা বাঘ! অমন চালচলনও পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না কোনো জানোয়ারের মধ্যে। জ্যান্ত বাঘকে মাঠের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার খেলা কখনো দেখেছে হুড? এ দেশেই তা সম্ভব। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে

শিকারীরা। খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়েছে রাজবাঘ। মেরেছে, লড়েছে, সবশেষে নিজেও মরেছে। কিন্তু না মেরে মরেনি। বীরের দেশে বীরবাঘই জন্মায়!

কথা বলতে বলতে গদগদ হয়ে পড়ল ম্যাথিয়াস।

ব্যাক্স বাধা দিয়ে বললে—"বাঘ যে পশুর রাজা, তা বুঝলাম। কিন্তু সিপাই বিদ্রোহের পর তিনবছরের মধ্যেই বাঘের খাবায় মারা গেছে বারো হাজার পাঁচশ চুয়ান্নজন ভারতবাসী। সুতরাং খুনে বাঘদের নিয়ে কি মাথায় নাচা হবে?

অবাক হয়ে বলল ম্যাথিয়াস—"সে কী কথা! ওরা যে ওমোফাগি!"

মানে? ভুরু কুঁচকালো হুড।

"মানে, কাঁচা মাংস খেকো। বিশেষ করে নরমাংস পেলে আর কিছু চায় না।"

"তাতে কি হল?"

"বারে! ক্ষিদে পেলে খাবে না?"

একথার পর আর থাকা গেল না ক্রাল-এ। স্টীম হাউসে রওনা হওয়ার আগে কর্ণেল কালাগণিকে ডেকে বললেন—ইচ্ছে হলেই যেন বেহেমথ দেখতে আসে সে।

ক্যাপ্টেন হুড-ও তাই চায়। কালাগনি নাকি জঙ্গলের পোকা। সুতরাং আটচল্লিশ নম্বর বাঘটাকে জোটাতে হলে কালাগনিকে দরকার বইকি।

কর্ণেলের মুখে ধন্যবাদ শুনে কালাগনি লোকটা কিন্তু আহ্লাদে গদগদ হল না। যাঁকে সে প্রাণে বাঁচিয়েছে, তিনি নিজে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন—অথচ কালাগনি যেন পাথর। মুখের ভাব বাইরে প্রকাশ করল না।

আরেক দফা টক্কর লেগেছিল ম্যাথিয়াসের সঙ্গে হুডের। দুজনের দু'রকম পথ। একজন জন্তু মারতে চায় আরেকজন ধরতে চায়। সারারাত ঝগড়া থামবে না ওদের। তাই হুডকে টেনে নিয়ে ফিরে এলাম স্টীম হাউসে।

সেদিন ছিল ছাব্বিশে জুন। তারপরের তিনটে দিন মাটিতে নামা গেল না। একটানা বৃষ্টি নামল জঙ্গলে।

তিরিশে জুন আকাশ পরিষ্কার হল। চলন্ত মন্দির অথবা প্যাগোডা দেখতে কয়েকজন তিব্বতী এল স্টীম হাউসে। নেপালের জঙ্গল কর্ণেলের কাছে নতুন কিছু নয়। সীমান্তের লোকজনের সঙ্গে আলাপ ছিল আগে থেকেই। তিব্বতীদের খাতির করে বসালেন তিনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন নানাসাহেব সম্পর্কে।

কিন্তু দেখা গেল, তিব্বতীরা আমাদের মতই অজ্ঞ। বিশেষ কিছু খবর রাখে না। ভাসাভাসা একটা খবর শুনেছিল বটে, নানাসাহেব নাকি মারা গেছেন। কিন্তু সত্যিই মারা গেছেন কি তিব্বতের ভেতরে পালিয়েছিলেন, তা কেউ জানে না।

আমি হুড, ফক্স আর গৌমি গেলাম বাঘের খাঁচাকল দেখতে। সত্যিই একটা বাঘ পড়েছে। কালাগনি হাঁকডাক দিলে বাঘটাকে চালান করছে মোষে টানা চাকা-গাড়ীতে।

দেখে খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল হুড—"আহারে, এটাই তো আমার আট চল্লিশ নম্বর হতে পারত।"

"আমার আটত্রিশ", বলল ফক্স।

"আমার এক", বললাম—মিনমিনে গলায়।

ম্যাথিয়াস সান্ত্বনা দিয়ে বললে—"তাতে কী! জঙ্গলে আরো বাঘ আছে। কালাগনিকে নিয়ে যান—বাঘ জুটিয়ে দেবে।"

"কালাগনি" শুধোলো হুড। "এ জঙ্গল তোমার চেনা?"

"বার কুড়ি এ জঙ্গলে ঢুকেছি। টহল দিয়েছি," বলল কালাগনি।

"কে যেন বলছিল একটা বাঘ ঘুরঘুর করছে এখানে?"

"বাঘ নয়, বাঘিনী", বলল কালাগনি।

"চলো, এখুনি মারব তাকে।"

"চলুন।"

বাঘ চাইলেই কি বাঘ পাওয়া যায়? ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বাঘ বার করতে হয় শিকারীদের। খিদে না পেলে বাঘ কখনো শিকারীর বন্দুকের সামনে আসতে চায় না।

সেদিন কিন্তু আমাদের কপাল ভাল বলতে হবে। একটা ঝর্ণার ধারে আধখাওয়া হরিণের সামনে আমাদের নিয়ে গেল কালাগনি। দু দিকের দুটো গাছে উঠলাম আমরা। হুড আর ফক্স একটাতে। গৌমি আর আমি আর একটাতে। কালাগনি রইল পাথরের আড়ালে।

সহসা ফেউ ডাকল। ঝোপ নড়ল। একই সঙ্গে দু-দুটো বন্দুক গর্জালো। "আটচল্লিশ", সোল্লাসে বলল হুড। "আটত্রিশ" উচ্ছ্বাসহীন কণ্ঠে চেঁচালো ফক্স।

বাঘিনী ততক্ষণে বাঘ-স্বর্গে রওনা হয়ে গেছে। নেমে এলাম আমরা। দেখি, বাঘিনীর হৃৎপিণ্ডে বিঁধেছে দুজনেরই গুলি। অব্যর্থ লক্ষ্য দুজনেরই।

গম্ভীর কণ্ঠে হুড বললে—"ঠিক আছে। আধখানা বাঘিনী তোমার।"

নির্বিকার কণ্ঠে ফক্স বললে—"নিশ্চয়।"

তেরোই জুলাই কালাগনি আর দুজন শিকারীকে নিয়ে স্টীমহাউসে এল ম্যাথিয়াস। কর্নেল খুব খাতির করে বসালেন তাদের। এক পেট খাইয়েও দিলেন। মঁসিয়ে পারাজাড রাঁধে ভাল। বন থেকে মেরে আনা পশু-পাখীর টাটকা মাংস দিয়ে অনেকগুলো মুখরোচক খানা হাজির টেবিলে। সেই সঙ্গে ফরাসি সুরা। ম্যাথিয়াস উঠে দাঁড়াল টেবিল থেকে টলতে টলতে। অত্যধিক মদ খেয়েছে বেচারী।

খেতে বসে বেহেমথের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল ব্যাঙ্কস। প্রশংসার শুরু ম্যাথিয়াসের একটা খোঁচা মারা কথা থেকে। কলের হাতি দিয়ে বাড়ীর ট্রেন টেনে নিয়ে যাওয়ার নাকি কোনো মানেই হয় না। ব্যাঙ্কস তখন মিষ্টি মিষ্টি করে শুনিয়ে দিল কলের হাতির অসীম শক্তির কথা। ক্রাল-য়ে যত বাঘবন্দী হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের শক্তি একত্র করলেও বেহেমথের সমান হবে না। প্রিন্স গুরু সিং (সেই দাম্ভিক রাজকুমার) কি রকম অপদস্থ হয়েছিলেন, সে কথাও বলল বসিয়ে রসিয়ে। একা বেহেমথের ঠেলায় তিনটে হাতি পিছু হটেছে এবং দুটি চার পা শূন্যে তুলে চিৎপটাং হয়েছে শুনে ম্যাথিয়াস অবিশ্বাসের হাসি হাসল। বেহেমথ বাঘের কামড়কে ডরায় না, হাতির ঠেলাকে পরোয়া করে না। বনের রাজা বেহেমথ থাকতে ভয় কিসের?

চোখ বড় বড় করে কালাগনি সব শুনছিল। ওর চোখে ভয় দেখলাম না। বিস্ময় দেখলাম। নিছক যন্ত্র যে এত শক্তিমান হতে পারে, তা যেন চোখ দিয়ে দেখে কান দিয়ে শুনেও বিশ্বাস করতে পারছে না। মুখে কিন্তু একটি কথাও বলল না—চোখ-কান দিয়ে গিলল বেহেমথের প্রতিটি কলকব্জা আর কাহিনী।

তেইশে জুলাই পাঁচ মাইল দূর থেকে কয়েকজন পাহাড়ি এল একটা বাঘিনীর খবর নিয়ে। একটা বাঘিনীই ছারখার করে দিচ্ছে গাঁ-টাকে। সাহেবরা গিয়ে যদি তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন, গাঁয়ের লোক বাঁচে।

ক্যাপ্টেন হুড তক্ষুণি তৈরী হল। কর্নেল, গৌমি আর ম্যাকনীল রইলেন স্টীমহাউসে।

আমরা বেরোলাম তিন চারদিনের জন্যে। ক্রাল থেকে কালাগনিকে সঙ্গে নিলাম। আরো তিনজন শিকারী রইল সঙ্গে।

তারপরেই ঘটল সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।

বাঘিনী গা-ঢাকা দিয়ে রইল জঙ্গলে। মানুষের রক্ত চেটে নাকি মানুষের মতই বুদ্ধি বাড়িয়ে তোলে মানুষ-খেকো বাঘেরা। তাই হন্যে হয়ে গেলাম আমরা—বাঘিনীর রূপ আর দেখলাম না।

তারপরেই খবর এল একটা মোষ আধখাওয়া অবস্থায় পাওয়া গেছে। বাঘিনী বাকি মোষটা খেতে নিশ্চয় আসবে সেখানে।

সুতরাং আমরা গিয়ে হাজির হলাম বাঘিনীর খাবার জায়গায়। অনেকক্ষণ ওৎ পেতে থাকার পর মস্ত ঝোপের মধ্যে একটা গুরু গম্ভীর রাগী গর্জন শুনলাম। কিন্তু রূপ দেখাতে বাইরে এল না বাঘিনী।

বুদ্ধি দিল কালাগনি—"সাহেব, আগুন জ্বালতে হবে। ধোঁয়া দিতে হবে। নইলে ও বেরোবে না।"

চমৎকার মতলব। তৎক্ষণাৎ জ্বলল আগুন। ধোঁয়ায় দম আটকে এল আমাদের সকলেরই। বাঘিনীরও। তাই দ্বিতীয় দফা গজরানি ছাড়ল ঝোপের মধ্যে থেকে।

আরো কাঠ পড়ল আগুনে। আরো ধোঁয়ায় চোখ পর্যন্ত জ্বালা করতে লাগল সকলের। বাঘিনীর আর সহ্য হল না। রেগেমেগে ভীষণ ডাক ছেড়ে হলদে বিদ্যুতের মত লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ঝোপের মধ্যে থেকে।

একসঙ্গে দশটা বন্দুক থেকে দশটা গুলি ছুটে গেল। কিন্তু একটাও লাগল না।

বাঘিনীর যাবার পথেই নিষ্কম্প দেহে দাঁড়িয়ে ছিল হুড। এবার গর্জালো তার বন্দুক। গুলি লাগল বাঘিনীর কাঁধে!

এরপরের ঘটনাগুলো দ্রুতগতি সিনেমা দৃশ্যের মত ঘটে গেল পর-পর।

বাঘিনী হুডের ঘাড়ে এসে পড়ল। হুডের বন্দুক ঠিকরে গেল। বাঘিনী হুডকে লক্ষ্য করে থাবা তুলল। কালো বিদ্যুতের মত ছুটে এসে বাঘিনীর টুঁটি টিপে ধরল কালাগনি। আরেক হাতে তুলল ছুরী। বাঘিনীর ঝটকায় ঠিকরে গেল কালাগনি—সেইসঙ্গে ছুরী। হুড পলকের মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে ছুরীখানা তুলে নিয়ে বিঁধিয়ে দিল বাঘিনীর বুকে।

"বাঘ মরেছে! বাঘ মরেছে!" উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল গাঁয়ের লোকজন।

কালাগনির কাঁধ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। বলল আশ্চর্য শান্ত গলায়—"সাহেব, ছেচল্লিশ নম্বর বাঘ আপনিই মারলেন।"

হুড কৃতজ্ঞ কণ্ঠে শুধু বলল—"শুধু তোমার জন্যেই পেরেছি। নইলে বাঁচতাম না।"

বেহেমথে ফিরে এসে পেলাম একটা চিঠি। কর্ণেল মুনরো ম্যাকনীলকে নিয়ে নেপালের সীমান্ত জঙ্গলে গেছেন নানাসাহেবের মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে খবরা-খবর নিতে। ফিরে আসবেন আমরা বোম্বাই রওনা হওয়ার আগেই।

হঠাৎ চোখ পড়ল কালাগনির ওপর। অসীম বিরক্তি তার চোখে-মুখে।

কিন্তু কেন? কর্ণেল মুনরা নেপালে জঙ্গলে গেছেন শুনে অত ব্যাজার কেন সে?

নিশ্চয় ভুল দেখেছি। দোষ আমার চোখের।

বৃষ্টির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। ঝড়বাদলা মাথায় নিয়ে ব্যাঘ্র হত্যা করে চলেছে হুড। ম্যাথিয়াসও ওর টার্গেট মত সিংহ সংগ্রহ করে ফেলেছে। মাঝে একটা ভালুক ধরা দিয়েছিল খাঁচাকলে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। ইউরোপের বাজারে নাকি আমেরিকার গ্রীজলি ভালুকের কদর বেশী—ভারতীয় ভালুকের দাম পাওয়া যায় না।

পনেরোই আগস্ট হয়ে গেল। কর্ণেল এখনো ফিরলেন না। কালাগনিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নেপালের জঙ্গল তার নখদর্পনে কিনা। সে বললে, কর্ণেল তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ভাল করতেন। পথে বিপদ-আপদ এলে বুক দিয়ে আগলে রাখত সে। নানাসাহেব? তিনি নেই নেপালের জঙ্গলে।

আগস্টের শেষের দিকে একটা বিরাট ঘটনা ঘটল।

সে রাতে আমরা ঠিক করলাম চাঁদ উঠলেই শিকারে বেরোবো। মিশমিশে অন্ধকারে হিংস্র জন্তুরা টহল দেওয়া পছন্দ করে না। আলো আঁধারি ওদের হাওয়া খাওয়ার পক্ষে অনুকূল। তাই স্টীমহাউস থেকে আমরা চারজন ক্রাল এলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে ক্রাল-যেই রইলাম। ম্যাথিয়াসও শিকারীদের নিয়ে সঙ্গে যাবে ঠিক করেছিল। কিন্তু একঘুম ঘুমিয়ে নিয়ে তবে যাবে বললে। হুড কিন্তু রাজী হল না। আমাকে নিয়ে ক্রাল-যের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল ঘুম তাড়ানোর জন্যে। চারদিক নিস্তব্ধ। অরণ্যমর্মর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। খাঁচার মধ্যে বাঘ সিংহরাও নড়ছে না। একটা খাঁচাই কেবল খালি আছে এখনো বাকী বাঘটার জন্যে।

ক্রাল-য়ের দরজা কালাগনি বন্ধ করে দিয়ে গেছে। আমরা নিরাপদ। তবুও মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল এই অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্যের জন্যে।

আচমকা খাঁচার জানোয়ারগুলো ডেকে উঠল একসঙ্গে। বাতাস শুঁকতে লাগল পাগলের মত।

একই সঙ্গে কান ফাটানো হুংকার শুনলাম বাইরে। যেন পালে পালে বাঘ একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকি করছে।

ভীষণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল প্রত্যেকেরই। ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। কালাগনি লাফ দিয়ে উঠে গেল উঁচু টঙে। হেঁকে উঠল সোল্লাসে—"দশটা বাঘ। বারোটা লেপার্ড।"

সর্বনাশ! যাদের শিকার করতে যাবো বলে তৈরী হচ্ছি। তারাই এসেছে আমাদের শিকার করতে! ভারতবর্ষে এ-ঘটনা নতুন কিছু নয়। দশ বিশটা গ্রাম ছেড়ে লোক পালিয়েছে দলবদ্ধ বাঘের অত্যাচারে!

হঠাৎ হুড়মুড় করে খুলে গেল ক্রাল-য়ের দরজা!

একী কাণ্ড! দরজা তো কালাগনি বন্ধ করেছিল নিজের হাতে। রোজ করে। আজ খুলে গেল কেন?

ভাববার সময় নেই আর। বাইশটা চতুষ্পদ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। চক্ষের নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল চত্বর। কালাগনি উঠল গাছে। ম্যাথিয়াস কুটিরে। আমি আর হুড খালি খাঁচায়।

তারপরেই চলল নৃশংস হত্যালীলা। রক্তজমানো গজরানির মধ্যে মারা গেল পাঁচটা মোষ, তিনজন জংলী। বাকী মোষগুলো পালিয়ে গেল জঙ্গলে। ছুটন্ত জানোয়ারের ধাক্কায় উল্টে গেল আমাদের খাঁচা—দরজা কিন্তু খুলল না।

খাঁচার মধ্যে থেকেই একটা বাঘকে শুইয়ে দিল হুড। কুটিরের মধ্যে থেকে শিকারীরা গুলি চালিয়ে খতম করল আরও একটা বাঘ আর চিতাকে।

মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল। রক্ত থই থই করতে লাগল ক্রাল-য়ের মধ্যে।

পনেরো মিনিট পরে জঙ্গলে ফিরে গেল খুনে বাঘের দল। সড়াৎ করে গাছ থেকে নেমে দরজা এঁটে দিল কালাগনি।

দেখা গেল, উল্টোনো খাঁচার তলায় একটা বাচ্ছা বাঘ ধরা পড়েছে!

সাতাশ তারিখে ঘুম ভাঙল দারুণ চেঁচামেচিতে। আনন্দের সোরগোল।

কী ব্যাপার? কী ব্যাপার? না, কর্ণেল মুনরো ফিরে এসেছেন।

নানাসাহেবের দর্শন পেয়েছেন কি? মোটেই না। খোঁজখবর? তাও না। এর বেশী কিছু বললেন না মুনরো।

ঠিক হল তেসরা সেপ্টেম্বর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দিকে রওনা হব। মাঝে কোথাও থামব না। শহর দেখবার জন্যে দাঁড়াব না। সিপাই বিদ্রোহের আগুন যেখানে যেখানে জ্বলেছে, সে সব জায়গায় খামোকা টহল দিতে গিয়ে কর্ণেলকে বিমর্ষ করে লাভ কী?

খাবারদাবারের ভাড়ার বোঝাই শুরু হল পশুপাখীর মাংস দিয়ে। ইতিমধ্যে একদিন ম্যাথিয়াস এল কাঁচুমাচু মুখে। বড় বিপদে পড়েছে সে। কৃপা করলে বেঁচে যাবে এ যাত্রা।

কর্ণেল তাকে ঝেড়ে কাশতে বললেন। পেটের কথা না জানলে উপকারটা করবেন কিভাবে?

ম্যাথিয়াস তখন হেঁ-হেঁ করে জানাল তার দুর্বিপাকের কাহিনী। মোষগুলো মারা যাওয়ায় আর নতুন মোষ পাওয়া যাচ্ছে না। খাঁচাগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কি হবে তাহলে? এদিকে কথা আছে, বিশে সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে জন্তুগুলো পৌঁছে দেবে ম্যাথিয়াস। মানে আর মাত্র আঠারো দিন বাকী। কর্ণেল যদি দয়া করে তাঁর বেহেমথকে দিয়ে খাঁচাগুলো টেনে নিয়ে রেলস্টেশনে পৌঁছে দেন—

কর্ণেল চাইলেন ব্যাঙ্কস-য়ের পানে। ব্যাঙ্কস বললে—"বেহেমথ পারবে।"

কর্ণেল বললেন—"ঠিক আছে। এটবা-তে পৌঁছে দেব'খন।"

তেসরা সেপ্টেম্বর সকাল বেলা চুল্লীতে কাঠ চাপিয়ে স্টিম বানাতে গিয়ে দারুণ ফোঁস ফোঁসানি শুনে চমকে উঠল ব্যাঙ্কস। স্টর বুদ্ধি করে ছাই ফেলবার নলের মুখ খুলে রেখেছিল। গরম বাষ্পের ঠেলায় সেইসব নলের মধ্যে থেকেই সড়াৎ সড়াৎ করে বেরিয়ে এল অনেকগুলো বিষধর সাপ!

চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল বেহেমথ এই কদিন। বনের সাপ বাসা নিয়েছিল নলের মধ্যে। এখন গরম বাষ্প গায়ে লাগতেই মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছে।

সবচেয়ে বড় সাপটা বেরোলো হাতির শুঁড়ের মধ্যে থেকে। টাইগার-পাইথন। আধখানা শরীর বার করতেই হুড় গুলি করে গুঁড়িয়ে দিল মাথাটা।

শুরু হল বেহেমথের পুনর্যাত্রা। দু ঘণ্টা পরে পৌঁছোলাম ক্রাল-য়ে। জন্তুভর্তি খাঁচাগুলোকে অনায়াসে টেনে নিয়ে পাহাড়ি পথ বেয়ে এঁকে-বেঁকে এটবা স্টেশনে পৌঁছে গেল বেহেমথ দিন কয়েকের মধ্যে। দশই সেপ্টেম্বব খাঁচাগুলো রেলে চাপানোর পর চাকরী গেল কালাগনির। আর তো তার দরকার নেই।

কর্ণেল কালাগনিকে বললেন তাঁর সঙ্গে বোম্বাই যেতে। কালাগনি কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর রাজী হয়ে গেল।

ম্যাথিয়াসের সঙ্গে আমাদের বিদায়কালীন দৃশ্যটা মনে রাখবার মত। আমরা আড়ম্বরের ধার দিয়েও গেলাম না। ম্যাথিয়াস কিন্তু হাত-পা নেড়ে দারুণ বাড়াবাড়ি করে ফেললে। বেহেমথ যখন অনেক দূরে, তখনও দেখলাম মূক অভিনয় দিয়ে ক্ষিপ্তের মত সে বোঝাতে চাইছে—ইহলোকে এবং পরলোকেও আমাদের মনে রাখবে ওলন্দাজ প্রাণীতত্ত্ববিদ ম্যাথিয়াস ভ্যান গুইট!

নানাসাহেব যে মারা গিয়েছেন, কালাগনি তা জানত না। যেদিন শুনল, সেদিন তার মুখখানা নিমেষ মধ্যে কি রকম যেন হয়ে গেল।

সেদিন ছিল আঠারোই সেপ্টেম্বর। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর কর্ণেল বিশ্রাম করছিলেন। কালাগনিকে ডেকে পাঠাল ব্যাঙ্কস। প্রথমে জিজ্ঞেস করলে, এ-অঞ্চলের পথঘাট এভাবে মুখস্ত হল কি করে। কালাগনি বললে, সে আগে যাযাবর বেনিয়াদের দলে কাজ করত। এরা হাজার হাজার বলদের পিঠে শস্য চাপিয়ে দেশে দেশে সওদা করে বেড়ায়। এ-পথ দিয়ে বহুবার সে গেছে সেই বেনিযাদের সঙ্গে। আবার দেখা হয়ে যেতে পারে।

ব্যাঙ্কস তখন ম্যাপ খুলে বসল। কোন পথ দিয়ে গেলে সুবিধে হবে, জেনে নিলে কালাগনির কাছ থেকে। সবশেষে কিন্তু একটা অদ্ভুত কথা বলল কালাগনি।

বলল—"স্বাধীনতা যুদ্ধ যেখানে-যেখানে হয়েছে, সাহেবরা সেই জায়গাগুলো এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন বুঝলাম না।"

ব্যাঙ্কস তখন বুঝিয়ে বলল কর্ণেলের মনের অবস্থা। শুনে কালাগনি বললে—"কর্ণেল মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন নানাসাহেবকে। উনি এখন ভারতবর্ষে নেই।"

ব্যাঙ্কস বললে—"তুমি কিছুই জানোনা দেখছি। নানাসাহেব মারা গেছেন চারমাস আগে পঁচিশে মে সাতপুরা পাহাড়ে।"

শুনেই কালাগনি চমকে উঠল দারুণভাবে। মুখখানা ভীষণ হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই আশ্চয শান্তগলায় কয়েকটা প্রশ্ন করল খবরটা সম্পর্কে। তারপর চলে গেল ধীর পদক্ষেপে।

আমার মনে খটকা লাগল অনেকগুলো কারণে। ওর এই ঠাণ্ডা বরফের মত কথাবার্তা শুনলেই আমার গা কিরকম করতে থাকে। লোকটা যেন মাথা গরম করতে শেখেনি। সব চাইতে বড় কথা, ও কি সিপাই-বিদ্রোহে আগে ছিল? সিপাই বিদ্রোহকে সিপাই-বিদ্রোহ না বলে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলল কেন?

নানাসাহেব মারা গেছেন শুনে ওরকম ঠাণ্ডা মানুষটাও ওভাবে চমকে উঠল কেন?

তেইশে সেপ্টেম্বর ঝাঁসি মিলিয়ে গেল পেছনে। এই সেই জায়গা যেখানে তুমুল লড়াই হয়েছিল রাণীর সঙ্গে কর্ণেলের। সেই থেকেই নানাসাহেব খড়্গহস্ত হয়েছেন কর্ণেলের ওপর। চব্বিশে সেপ্টেম্বর যাযাবর বেনিয়াদের

দেখলাম। মেঘের মত ধুলোর পর্দায় আকাশ ছেয়ে এগিয়ে এল হাজার চার-পাঁচ ভারবাহী বলদ। আর সুবেশ সুন্দর মাড়োয়ারীরা। স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেককেই দেখতে ভাল। পোশাকও জমকালো। সারা বছর এরা শস্য-সামগ্রী নিয়ে ঘুরছে দেশে দেশে। সিপাই বিদ্রোহের সময়ে দুপক্ষকেই খাবার সরবরাহ করেছে। রণক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে নির্বিঘ্নে চলে গেছে—গায়ে আঁচড়টিও পড়েনি। এরা কিছুতেই অবাক হয় না। বেহেমথকে দেখেও অবাক হল না।

হঠাৎ দেখলাম কালাগনি নেই। গেল কোথায়? নিশ্চয় পুরোনো দোস্তদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

সত্যিই তাই। বেনিয়াদের একদম পেছনে একটা গাঁট্টাগোট্টা লোকের সঙ্গে খুব শান্তভাবে কথা বলতে দেখা গেল তাকে। লোকটাকে কিন্তু বেনিয়া বলে মনে হল না। যাওয়ার আগে একঝলক দেখে গেল কর্নেল মুনরোকে।

পঁচিশে সেপ্টেম্বর রাত্রে অদ্ভুত কতকগুলো পদচিহ্ন দেখলাম জঙ্গলের মাটিতে। অবিকল মানুষের পায়ের ছাপ। কারা যেন সরসর করে সরে গেল লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে। হেঁকে উঠলাম। সাড়া দিল না। হুড আর সইতে না পেরে একটা ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়ল। সারারাত ধরে বিচিত্রকণ্ঠে কারা যেন কথা বলল আশেপাশের জঙ্গলে।

ভোরবেলা আমরা নদী পেরোনোর আয়োজন করলাম। রাতের আগন্তুকদের দেখতে পেলাম এবার। শখানেক হনুমান। মুখপোড়া। ল্যাজঝোলা। বেহেমথকে দেখেই রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল। বেহেমথ জলে নামতেই টপাটপ লাফিয়ে উঠল পিঠে, মাথায়, শুঁড়ে। একশটা হনুমানের বাড়তি বোঝা নিয়ে কিন্তু দিব্যি জলে ভাসল বেহেমথ। চার পা নেড়ে দাঁড়ের মতই জল কেটে ঝপাঝপ শব্দে পেরিয়ে গেল নদী! ওপারে পৌঁছোতেই একশটা হনুমান লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে।

হনুমান রামের অনুচরের বংশধর। হিন্দুদের চোখে ভগবান। আমরাও তাদের গায়ে হাত দিলাম না। কর্নেল আর হুডের হাত থেকে চিনির ডেলা খেয়ে গেল তারা। কিন্তু যাবার সময়ে একটা ধন্যবাদও দিয়ে গেল না।

অসভ্যতা দেখে খুবই বিরক্ত হল ফক্স।

বুন্দেলখণ্ডের সবচাইতে খারাপ জায়গায় এসে পড়লাম উনত্রিশে সেপ্টেম্বর। বিন্ধ্যপর্বতের পাহাড় আর জঙ্গলে পথ চলা দায়। মাঝে মাঝে জলের ধারা পড়ছে। বৃষ্টির জন্যে পথের নিশানা মুছে যাওয়ায় কালাগনিকে নীচে নামতে

হচ্ছে। বেহেমথ দাঁড়াচ্ছে। কালাগনি নেমে গিয়ে রাস্তাঘাট দেখে আসার পর ফের চলছে।

এখনো পর্যন্ত ডাকাত পড়েনি আমাদের ওপর। এ-অঞ্চলে ওদের এড়িয়ে পথ চলা যায় না। ঠগী অথবা পিণ্ডারী ওৎ পেতে থাকে পথের ওপর। বন্ধুর বেশে সঙ্গ নেয়। তারপর ফাঁস বা বিষ দিয়ে যমালয়ে পাঠিয়ে দেয়। ডাকাতরা আসে হা রে-রে-রে করে। আমরা অবশ্য তৈরী সব অবস্থার জন্যেই। অস্ত্রশস্ত্র দেদার আছে। গুলিবারুদের অভাব নেই। হামলা শুরু হলে রুখে দাঁড়াব।

কিন্তু হামলা এল অন্য দিক দিয়ে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বিচিত্র এবং ভয়ংকর। ভারত-ভ্রমণে এর চাইতে বড় ঘটনা আর ঘটেনি।

তিরিশে সেপ্টেম্বর দুপুর নাগাদ দেখলাম গোটা দুই প্রকাণ্ড মাতঙ্গ আমাদের সামনে সামনে চলছে। কলের মাতঙ্গর ফোঁস-ফোঁস ডাক আর চিমনীর কালো ধোঁয়া দেখেই বোধহয় ভড়কে গিয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল দুজনে। পাশ দিয়ে চলে এলাম আমরা। হাতিদুটো কিন্তু চলে গেল না। আসতে লাগল পেছন পেছন।

বারান্দায় বসে খোশগল্প শুরু হল হাতি নিয়ে। সচল পাহাড়ের মত দুটো হাতি হেলেদুলে এগিয়ে আসছে তো আসছেই। তারপরেই দেখলাম আরও একটা হাতি কোত্থেকে এসে ভিড়ে গেল ওদের সঙ্গে। তারপর আরও একটা। তারপরও একটা। একটা একটা করে বেড়েই চলল হাতির সংখ্যা। শেষকালে দেখলাম প্রায় তিরিশটা হাতি শোভাযাত্রা করে গোদাগোদা পা ফেলে আসছে পেছন পেছন। কেউ চেঁচাচ্ছে না। তালে তালে পা ফেলে তিরিশটা ক্ষুদে পাহাড় যেন দলপতিকে ফলো করছে। বলাবাহুল্য, বেহেমথই সেই দলপতি।

এ-দৃশ্য ভাগ্যবান ছাড়া কারো চোখে পড়ে না। আমরাও উল্লসিত হলাম হস্তীযূথের নীরব শোভাযাত্রা দেখে। সৃষ্টি ছাড়া বেহেমথকে দেখে ওরা যে স্তম্ভিত হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কী? ব্যাঙ্কস আর মুনরো কিন্তু শংকিত হলেন। পেছন পেছন আসছে ভাল। যদি সামনে থেকে রাস্তা জুড়ে দাঁড়ায়? তাছাডা ওদের মোটা বুদ্ধিতে কি মতলব খেলছে, বোঝাও তো যাচ্ছে না।

হুড কিন্তু হঠাৎ হস্তী-প্রশস্তি সুরু করে দিলে। পঞ্চমুখ হল হাতিদের বুদ্ধির প্রশংসায়। হাতিরা নাকি আশ্চর্য জানোয়ার। কুকুরের চাইতেও বিশ্বাসী আর প্রভুভক্ত। অসম্ভব কোমল মন। একটা পাখীকেও মারতে চায়

না। কিন্তু বাজারহাট, মালবওয়া থেকে শুরু করে বাচ্চা ছেলে আগলানো পর্যন্ত কোনো কাজেই বুদ্ধির অভাব হয় না।

হুডের বিরাট বক্তৃতা শোনবার পর মুখ খুলল ব্যাঙ্কস। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল হুডের ধারণা। কে বলেছে হাতিদের বুদ্ধি আছে? বুদ্ধি থাকলে অত সহজে খেদায় ধরা পড়ে? অমন পোষ মানে? হাতিদের মগজ কেটেকুটে দেখা গেছে—হুকুম তামিল করার কোষটা ওদের অস্বাভাবিক রকমের বড়। তার মানে, মাহুতরা মাথায় ডাঙশ মেরে যা শেখায়, তাই করে। বুদ্ধি-শুদ্ধি ঘণ্টা আছে। থাকলে অতবড় চেহারা নিয়ে কখনো পোষাবেড়ালের মত গলায় ঘণ্টা বেঁধে মানুষের কথায় ওঠবোস করত না।

জমে উঠল তর্কযুদ্ধ। এদিকে হাতির সংখ্যা যে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, সে খেয়াল ছিল না কারোরই। হঠাৎ কর্ণেল বললেন—"তোমরা তো বকেই যাচ্ছো। এদিকে হাতির সংখ্যা যে প্রায় শখানেক হয়ে গেল!"

দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমাদের!

প্রায় একশটা কালো-কালো মাংসের পাহাড় শুঁড় তুলে দাঁত উচিয়ে নিঃশব্দে আসছে পেছন পেছন। বেহেমথ থেকে অনেক দূরে যদিও, আসল সন্ধ্যার আলো-আঁধারি আর কুয়াশার জন্যে ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না। তার ওপর গোদাগোদা শচারেক পায়ের ধুলোর মেঘ তো আছেই। কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে, পিলে চমকে তোলার পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু কী আশ্চর্য! কেউ তো টুঁ শব্দটিও করছে না? মতলব কি ওদের?

রাত নামল। হস্তীযূথের মধ্যে থেকে এবার একটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা গেল। শব্দটা অনেকটা মেঘ ডাকার মত। গুরু গম্ভীর।

কালাগনি বললে—"ওরা বেহেমথকে শত্রু মনে করছে। সামনে শত্রু পড়লে এইভাবে ডাকে হাতি।"

প্রমাদ গুণলাম এবার!

রাত্রে খানা খন্দ পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দাঁড়িয়ে গেল বেহেমথ। অন্ধকারে হাতিদের দেখতে পেলাম না। শুনতে পেলাম মেঘ ডাকের মত গুরু-গুরু গর্জন। গর্জনটা ক্রমশঃ আমাদের ছেঁকে ধরছে যেন। আওয়াজ আর শুধু পেছনে নেই। সামনে বাঁয়ে ডাইনে পেছনে—সর্বত্র।

তারপর এক সময়ে সব নিশ্চুপ হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে সার্চলাইট জ্বালানো হল। দপ করে জ্বলে উঠল বেহেমথের

চোখ জোড়া। তীব্র আলোয় দেখলাম, আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে শুয়ে আছে একশটা হাতি! আলো জ্বলে উঠতেই শুঁড় তুলে দাঁত উঁচিয়ে চাপা গর্জন করল। সেকী ডাক! রক্ত হিম হয়ে গেল আমাদের।

এখন উপায়? এরা তো ঘেরাও করে শুয়ে রইল সারারাত। সকাল বেলা বেরোবো কি করে? বেহেমথের নাক দিয়ে ফোঁস আওয়াজ আর গলগলে কালো ধোঁয়া দেখলে তো ক্ষেপে যাবে ওরা!

আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। তখন তো বুঝিনি ওরা সারারাত আগলে রাখল আমাদের পাছে পালিয়ে যাই এই ভয়ে!

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হল যাত্রার তোড়জোড়। ব্যাঙ্কস হুকুম দিলে—"কপালে যা থাকে থাকুক, সামনে এগোবো! নইলে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে মরতে হবে। কালোথ, কাঠ দাও চুল্লীতে।"

স্টীম বানিয়ে চলল কালোথ। তারপর প্রচণ্ড শব্দে বাঁশি বাজিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে কালো ধোঁযা ছেড়ে সামনে এগোলো বেহেমথ। কয়েকটা হাতি পথ ছেড়ে দিল। ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা।

কিন্তু হাতিব পাল লেগে রইল পেছনে। শোভাযাত্রা করে আসতে লাগল পেছন পেছন। তাড়াহুড়ো কবল না। ছুটেও এল না। হাঁকডাকও কবল না।

আমরা চলেছি লেক পুটুরিয়ার দিকে। ন-দশ মাইল পথ কোনো মতে পেরিয়ে যেতে পারলেই লেকে ভেসে পড়ব। হাতিরাও জলে ভাসবে। ভাসুক। জলে অতটা সুবিধে করতে পাববে না।

লেক যখন আর মাত্র মাইল দু এক দূরে চরম বিপদ ঘনিয়ে এল তখনই। বেলা এগারোটার সময়ে রাস্তাটা হঠাৎ সরু হয়ে এল। দুপাশে ঢালু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ি উপত্যকা। পেছনে হাতির পাল। সামনে যাওয়া ছাড়া আর পথ নেই।

আচমকা প্রমাণ পেলাম হাতিদের ধারালো বুদ্ধির। এতক্ষণ মার্চ করে আসছিল পেছন পেছন। যেন এই সংকীর্ণ জায়গাটিতেই আমাদের কোন-ঠাসা করবে বলে তাড়িয়ে আনছিল। এবার হঠাৎ দুভাগ হয়ে একটা দল আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

বেকায়দায় পড়লাম। সামনে হাতি। পেছনেও হাতি।

হেঁকে উঠল ব্যাঙ্কস—"চালাও সামনে।"

ঠিক এই সময়ে একটা একদন্ত হাতি রুখে দাঁড়াল সামনে থেকে। ভীষণ চেহারা তার। একটা দাঁত নেই।

কালাগনি চেঁচিয়ে উঠল—"গণেশ! গণেশ!"

'একদন্ত'দের গণেশ বলা হয় এদেশে। গুণ্ডা হাতি বলতে যা বোঝায়, তাই। ভীষণ মারকুটে।

পুরোদমে স্টীম ঠেসে ইস্পাতের দাঁত উঁচিয়ে তেড়ে গেল বেহেমথ। তেড়ে এল একদন্ত-ও। ইস্পাতের চাদরে লেগে মটাং করে ভেঙে উড়ে গেল তার দাঁতটা। থরথর করে কেঁপে উঠলেও বেহেমথ দাঁড়াল না। ইস্পাতের গজালের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করে দিল সামনে যে পড়ল তাকে।

প্রলয়ংকর সেই যুদ্ধকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ওরা তেড়ে আসছে দলে দলে। বেহেমথ ছুটছে সামনে। বয়লার ফেটে যাবে মনে হচ্ছে—তবুও থামছে না। গুলি চালাচ্ছি আমরা পেছনে। হুড বলে দিয়েছে দুচোখের মাঝে মারতে হবে। নইলে হাতি মরবে না। আমরা সেই ভাবেই টিপ করছি। কয়েকটা হাতি পেছনে লুটিয়ে পড়ল। সামনে পড়লে বেহেমথকেও দাঁড়াতে হত। তাহলে আর প্রাণে বাঁচতাম না।

হাতির বৃংহিত গর্জন, বন্দুকের নির্ঘোষ, বেহেমথের হুইস্‌ল্‌ আর ফোঁস-ফোঁসানি—সব মিলিয়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড চলতে লাগল সঙ্কীর্ণ সেই উপত্যকায়। কে বলে হাতির বুদ্ধি নেই?

লেকের জল চোখে পড়ছে। আচমকা সোর গোল উঠল পেছনের বাড়ী থেকে। কয়েকটা ক্ষ্যাপা হাতি পাহাড়ের গায়ে বাড়ীটাকে চেপে ধরে গুঁড়ো করতে চাইছে।

ধ্যাঙ্কস হুকুম দিলে, ও বাড়ী ছেড়ে সামনের বাড়ীতে চলে আসতে। সবাই এল। এল না কেবল পারাজার্ড। রান্নাঘর ছেড়ে নড়তে রাজী নয় সে। গৌমি গিয়ে তাকে কাঁধে ফেলে লাফিয়ে এল মাঝের বাড়ীতে।

সঙ্গে সঙ্গে শেকল খুলে পেছনের বাড়ী ফেলে রেখে এগোলাম আমরা। পাগলা হাতিগুলো চক্ষের নিমেষে বাড়ীটাকে পাহাড়ের গায়ে উল্টে ফেলে লাথি মেরে পিণ্ডি পাকিয়ে ছাড়ল।

আচমকা একটা শুঁড় জীবন্ত ফাঁসের মত বারান্দা থেকে তুলে নিতে গেল কর্ণেলকে। সাবাস কালাগনিকে! বাঘের মত লাফিয়ে এল কুঠার হাতে। কেউ কিছু বোঝবার আগেই এবং কর্ণেল বারান্দা থেকে এক ঝটকায় উধাও হওয়ার আগেই ঘ্যাচ্যাং করে দারুণ জোরে কোপ মারল শুঁড়টার ওপর। এক কোপেই দুখানা হয়ে গেল শুঁড়। বেঁচে গেলেন কর্ণেল।

ভীষণ বেগে ছুটছে বেহেমথ। আর মাত্র কয়েক গজ দূরে লেক পুটুরিয়া। হাতিদের পায়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই

-মনে হচ্ছে, এই বুঝি উল্টে গেল, ঠিকরে গেল! কিন্তু স্রেফ কপাল জোরে প্রতিবারেই পড়তে পড়তেও সিধে হয়ে যাচ্ছে বাড়ী আর বেহেমথ!

তারপরেই ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। কয়েকটা হাতিও রক্ত মাখা দেহে লাফ দিল জলে। কিন্তু খান কয়েক গুলি খেযেই তিড়বিড়িয়ে উঠে পড়ল ডাঙায়!

ব্যাঙ্কস-কে স্বীকার করতে হল—হাতিদের বুদ্ধি আছে। হুডকেও মানতে হল—হাতিদের মন খুব একটা নরম নয। পাখি মারতেও চায় না—এ কথা ঠিক নয়!

লেক পুটুরিয়া আকারে ডিমের মত। লম্বায় মাইল সাত আট। চওড়ায় মাইল তিন চারের বেশী নয়। ওপারে পৌছোলে জব্বলপুর যাওয়া যাবে সহজেই। কিন্তু ওপার পযন্ত বেহেমথ যেতে পারবে কী?

হাতিদের হাতে মার খেযে আমাদেব অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। তিনটে সমস্যার সম্মুখীন হযেছি। প্রথম, পেছনেব কামরায় আমাদের রান্নাঘর ছিল অসভ্য হাতিগুলো সে কামরার কিছু বাখোনি। খাবার দাবার সমেত গোটা রান্নাঘবটাই ধ্বংস করেছে। ক্ষিদের জ্বালায নাড়ি ভূঁড়ি পযন্ত হজম হতে বসেছিল। অথচ খাবার নেই। পারাজার্ড অবশ্য বলেছিল হাতির জিভ দিয়ে ভাল চপ হয়, আর পা দিযে ঝোল। কিন্তু হাতি আনতে হলে ফের ডাঙায উঠতে রাজী নয় কেউ।

তাছাড়া, গুলি কোথায়? এই হল আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা। পেছনের বাড়ীতে গুলিবারুদও ছিল। সব গেছে। এখন আছে মাত্র বারোটি কার্তুজ। জব্বলপুর না পৌছোনো পযন্ত গুলি বা খাবাব কোনোটাই মিলবে না।

কিন্তু ওপারে পৌছোলে তো জব্বলপুর যাবো? আমাদের তিন নম্বর সমস্যা—বেহেমথের কাঠের গুদোমও বেং খালি। কাঠ কুটো কুড়িয়ে নিযে চুল্লীতে ঠেসে স্টীম প্রেসার তুলতে হয়। হাতিদের তাড়া খেয়ে সে সব কিছুই করা হযনি। কাঠের অভাবে আগুন নিভে আসছে। স্টীম প্রেসার কমে আসছে। একটু পরেই তো বেহেমথ দাঁড়িয়ে যাবে। তখন?

হলও তাই। তখন সন্ধ্যে বেশ চেপে বসেছে। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেছে। সাড়ে সাতটা নাগাদ ফোঁস-ফোঁসানি কমে এল বেহেমথের পা-নাড়াও থেমে এল। ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হল ইঞ্জিন। পাল-মাস্তুল হীন বজরার মত অসহায় ভাবে ভাসতে লাগল আমাদের উভচর ট্রেন।

মহা ফাঁপড়ে পড়লাম। বেহেমথ এখন সত্যিই অসহায়। কাল সারারাত

ঘুমোইনি হাতি পরিবৃত হয়ে। আজ সারাদিন খাইনি। গুলি নেই, আগুন নেই। এ-অবস্থায় ডাকাত পড়লে তো গেছি!

ঝপাঝপ করে নিভিয়ে দেওয়া হল বেহেমথের বাইরের আলো। ডাইনিং-রুমে একটি মিটমিটে আলো জ্বেলে শলা পরামর্শ করতে বসলাম আমরা। আলো দেখে কেউ যেন আমাদের গতিবিধি টের না পায় তাই এত সাবধানতা! বুন্দেলখণ্ডের সব চাইতে খারাপ জায়গা এটা। বিপদ এখানে পদে পদে।

কালাগনিকে ডেকে আনল ব্যাঙ্কস। জিজ্ঞেস করল—"ডাঙা এখান থেকে কদ্দুর?"

"মাইল দেড়েক তো বটেই।"

"তাহলে জব্বলপুর খুব কাছেই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"জানি না কিভাবে কবে ডাঙায় পৌঁছোবো। খাবার দাবারও নেই।"

"হুজুর যদি হুকুম করেন তো আজ রাতেই ডাঙায় যেতে পারি সাঁতার কেটে।"

"এই কুয়াশায় দেড় মাইল সাঁতার কাটবে?" অবাক হল ব্যাঙ্কস। প্রাণ কি এতই সস্তা?"

"প্রাণের ভয়ে সাঁতার কাটব না?"

কেন জানি না, কালাগানির কথাবার্তা অকপট মনে হল না।

কর্ণেল মুনরো একদৃষ্টে চেয়েছিলেন কালাগনির পানে। এখন শুধোলেন —"সত্যিই সাঁতার কাটবে? পারবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পারবো।"

"গৌমি," হাঁক দিলেন মুনরো। দৌড়ে এল গৌমি। "তুমি তো জলের পোকা। ভাল সাঁতারু। কালাগনির সঙ্গে দেড় মাইল সাঁতরাতে পারবে?"

"কেন পারব না?"

"তাহলে এখুনি যাও। জায়গাটা ভাল নয়। দুজন থাকলে মনে সাহস থাকবে।" পরে গৌমিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কি যেন বললেন কর্ণেল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে মাথায় পোঁটলা বেঁধে দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। দেখতে দেখতে ঝপাঝপ শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে।

এবার কর্ণেলকে চেপে ধরলাম আমি—"কালাগনিকে আপনি একা ছাড়তে চাইলেন না কেন?"

"মনে হল ও সত্যি বলছে না, তাই", বললেন কর্ণেল।

ব্যাঙ্কস ক্ষুব্ধ হয়ে বললে—"সেকী কথা! যে দু'দুবার আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছে। হুডকেও বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়েছে—তাকে অবিশ্বাস?"

কর্ণেল তখন বললেন—"ছ্যাখো ব্যাঙ্কস, মানুষের মুখের রঙ দেখে বলা যায় কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যে বলছে। কালো ভারতীয়রা মিথ্যে বললে আরো একটু কালো হয়ে যায়। উল্টো হয় গোরাদের ক্ষেত্রে। তারা আরো একটু রাঙা হয়। আমি সেপাইদের মিথ্যে ধরতাম এইভাবে—কখনো ভুল করিনি। কালাগনির শেষ কথাটাও বিশ্বাস করতে পারলাম না ঐ কারণেই। ওর মুখের রঙ পালটে গিয়েছিল। এতরাতে এত কষ্ট করে ডাঙায় যাওয়ার নিশ্চয় একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে। তা যখন জানি না, একটু হুঁশিয়ার থাকা ভাল নয় কী?"

কর্ণেলের কথায় যুক্তি ছিল। তবুও মন মানতে চাইল না। খালি পেটে ঘুমও এল না প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে। রাত বেড়েই চলল। চারিদিক নিথর নিস্তব্ধ। কালোজলে কুয়াশার মধ্যে ভাসছে জল দানব—বেহেমথ।

আচমকা বাঘ ডেকে উঠল পাড়ে। হেঁকে হেঁকে যেন কথা বলছে বাঘেরা। হুডের হাত নিশপিশ করতে লাগল পঞ্চাশ নম্বর বাঘটা কোতল করার জন্যে। কিন্তু আওয়াজ শোনাই সার হল।

ভোর চারটের সময় আচমকা হাঁকডাক থেমে গেল বাঘেদের। অদ্ভুত! সত্যিই অদ্ভুত! ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বাঘেদের উচিত ছিল চেঁচাতে চেঁচাতে আস্তানায় ফিরে যাওয়া। সেক্ষেত্রে, হাঁকি ডাকগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত অনেক দূরে। কিন্তু তার বদলে আচমকা যেন পালিয়ে গেল বাঘের দল। ডাকতেও ভুলে গেল! কেন? কাদের ভয়ে?

অসীম উদ্বেগে গেল আরো একটি ঘণ্টা। পাঁচটা বাজল। ডাঙা দেখা যাচ্ছে। প্রায় দুশগজ দূরে ভাসছে বেহেমথ।

ছটা নাগাদ ভোরের হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ভাসতে ডাঙার আরো কাছে চলে এল বেহেমথ। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে বাইরে। হুড মাহুতের মত ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে বেহেমথের মাথায়।

আর দেরী করা যায় না। ডাঙায় প্রচুর শুকনো কাঠ ছড়ানো রয়েছে। কুড়িয়ে নিয়ে চুল্লী জ্বালিয়ে স্টিম বানাতে হবে এখুনি।

হেঁকে উঠল ব্যাঙ্কস—"নামো?

লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম আমরা। স্টিম প্রেসার না উঠলে বেহেমথ জল ছেড়ে ঢালু পাড় বেয়ে উঠবে কি করে গোদা গোদা পা ফেলে?

দেখতে দেখতে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বাললাম। কালোঁথ সমানে স্টিম প্রেসার তুলতে লাগল। তারপর স্টর গিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে বেহেমথকে তুলে নিয়ে এল ডাঙায়।

অমনি একটা ভীষণ হুংকার শুনলাম গাছগাছালির মধ্যে। প্রায় দেড়শজন ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র হাতে দৌড়ে এসে চক্ষের নিমেষে আমাদের শক্ত হাতে চেপে ধরল। আমাদের চোখের সামনেই কুঠার চালিয়ে টুকরো টুকরো করে আগুন জ্বালিয়ে দিল মন্দির-বাড়ীকে। কুঠার চলল বেহেমথের ওপরেও। কিন্তু ওর লোহার চামড়ায় আঁচড়ও পড়লনা। কিচ্ছু ক্ষতি করা গেল না।

হুড সমানে চেঁচাচ্ছিল দস্যুদের দস্তিপনা দেখে। কামরা যখন পুড়ছে, তখন মুণ্ডপাত করেছে। বেহেমথের গায়ে কুঠার যখন ভোঁতা হয়েছে, তখন হো-হো করে হেসেছে।

আচমকা বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল দুজন লোক। প্রথমজনের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দস্যুরা। নিশ্চয় দলপতি। দ্বিতীয়জনকে দেখেই দস্যু-রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল নিমেষ মধ্যে।

কালাগনি। নির্বিকার নির্লজ্জভাবে এগিয়ে এল কর্ণেল মুনরোর দিকে। নিরুত্তাপকণ্ঠে আঙুল তুলে বললে—"এই সেই লোক।"

চোখের পলক ফেলার আগেই একশজন ডাকাত কর্ণেল মুনরোকে হিড়হিড় টেনে নিয়ে উধাও হল বনের মধ্যে। বাকী পঞ্চাশজন জোর করে ধরে রাখল আমাদের। মিনিটপনেরো পরে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে দিয়ে বায়ুবেগে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

কিন্তু কর্ণেলের ওপর এত আক্রোশ কেন কালাগনির? নানাসাহেবের হুকুমে নয় তো?

মসিয়ে মক্লের-এর ডাইরী এইখানেই শেষ হয়েছে। এর পরের ঘটনা তিনি আর দেখেননি। কিন্তু সব ঘটনা জানার পর এক জায়গায় জড়ো করে দেখা গেল উত্তর ভারত ভ্রমণের উপসংহার হিসেবে বাকী অংশটুকু না বললেই নয়।

ভারতবর্ষের ঠগীদের মত নৃশংস ডাকাত আর দুনিয়ায় নেই। এরা অবশ্য কালীসাধক। মা ভবানীর নামে পাঁঠাবলি দেওয়ার মত মানুষ মারত গলায় ফাঁস লাগিয়ে।

কর্ণেল মুনরো যাদের হাতে ধরা পড়ল, তারা ঠগীদের উত্তরসূরী হলেও ঠগী নয়। স্রেফ ডাকাত। কালাগনির হুকুমে ওঠবোস করে।

কালাগনি কি তাহলে গোড়া থেকেই চাতুরী খেলে এসেছে?

তাতে কোনো সন্দেহই নেই। পাঠকপাঠিকার মনে আছে নিশ্চয়

ভূপালের মহরম শোভাযাত্রায় দাঁড়িয়ে নানাসাহেব হুকুম দিয়েছিলেন কালাগনিকে— যেভাবেই হোক মুনরোর দলে ভিড়ে যেতে হবে।

কালাগনি অক্ষরে অক্ষরে সে হুকুম তামিল করেছে। কানপুর থেকেই পেছন ধরেছে স্টীম হাউস ট্রেনের। হিমালয়ের জঙ্গলে কর্ণেল দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেই চাকরী নিয়েছে ম্যাথিয়াসের ক্রাল-য়ে। তারপর নিজের জীবন বিপন্ন করেও প্রাণ বাঁচিয়েছে কর্ণেলের তাঁর আস্থাভাজন হওয়ার জন্যে।

তারপর থেকে যা ঘটেছে, সব তার প্ল্যান মাফিক। যেন একটা সাজানো নাটক। কর্ণেল মুনরো বন্ধুবান্ধব নিয়ে তাঁদের ভূমিকাটুকু অভিনয় করে গেছেন সেই নাটকে—তার বেশী কিছু নয়।

কালাগনি চেয়েছিল যেমন করেই হোক স্টীমহাউসের পথ প্রদর্শক হতে হবে। নইলে নিজের খপ্পরে এনে ফেলবে কি করে? তাই চালাকি করে চাঁদনি রাতে ক্রাল-য়ের দরজায় হুড়কো আঁটেনি। উদ্দেশ্য? বাঘের পাল এসে যেন মোষগুলোকে মেরে যায়। তাহলেই জানোয়ার ভর্তি খাঁচাগুলোকে স্টেশন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে স্টীম হাউসের সাহায্য চাইবে ম্যাথিয়াস। ফলে, স্টীম হাউসের বাসিন্দাদের মন কেড়ে নেওয়া যাবে আরও অনেক ছলচুতো করে।

রক্তঝরা সেই দৃশ্যের পর ম্যাথিয়াস সত্যিই ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল কর্ণেলের কাছে। স্টীম হাউস তার খাঁচাগুলোকে পৌঁছে দিলে এটবা স্টেশনে, চাকরী গেল কালাগনির। তার শুকনো মুখ দেখে ব্যাঙ্কস-এর মন গলে গেল। চাকরী দিল স্টিম হাউসে।

তারপর থেকেই দারুণ অভিনয় করে গেছে কালাগনি। একবার ছাড়া। নানাসাহেবের মৃত্যু সংবাদ ব্যাঙ্কস-এর মুখে শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ধোঁকা লাগিয়েছিল মক্লের-কে।

কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি কালাগনি। তাই মাড়োয়ারী বেনিয়াদের মধ্যে গিয়ে দেখা করেছিল একজন পুরোনো দোস্তের সঙ্গে। দেখা হওয়াটাও অকস্মাৎ নয়—প্ল্যানমাফিক। কি খবর শুনেছিল তার মুখে ঈশ্বর জানেন। কিন্তু পরিকল্পনা পালটায়নি। পথ দেখিয়ে স্টিম হাউসকে নিয়ে এল পুটুরিয়ার জলে।

তারপর গৌমিকে নিয়ে লেক সাঁতরে ডাঙায় এসে উঠল কালাগনি। নিঃসীম অন্ধকার। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। গৌমি কিন্তু হুঁশিয়ার। বেচাল দেখলেই কালাগনির কোমর থেকে ছুরীটা খসিয়ে আনার জন্যে তৈরী।

কিন্তু সে সময় পাওয়া গেল না। আচমকা একটা মোড় ঘুরতেই কে যেন হেঁকে উঠল—"কালাগনি নাকি?"

"হ্যাঁ, নাসিম, আমি এসেছি," জবাব দিল কালাগনি।

পরক্ষণেই বাঁদিকের জঙ্গল থেকে ভেসে এল রক্তজমানো ভীষণ চীৎকার। ডাকাতে হুংকার।

এ চীৎকার চেনে গৌমি। গোণ্ডানার জঙ্গলে এ-ডাকের মানে—ছুটে এস দোস্তরা! শিকার জালে পড়েছে!

এ-অবস্থায় কালাগনিকে চোট দিতে গেলে নিজেকে মরতে হয়। তাতে কর্নেল বাঁচবেন না। সুতরাং চক্ষের নিমেষে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল গৌমি।

দেড়শ ডাকাত জড়ো হল দেখতে দেখতে। নাসিম তাদের দলপতি। নানাসাহেবের বিশ্বাসী অনুচর। জঙ্গল তোলপাড় করা হল গৌমির জন্যে। কিন্তু যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সে।

তারপর কি ঘটেছে আমরা জানি। ছটার সময়ে ডাকাতদের হাতে ধরা পড়লেন কর্নেল। শুধু তাকে নিয়েই ঝটিতি রওনা হল নাসিম। সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছোলো রায়পুর দুর্গে।

এ দুর্গ সাতপুরা পাহাড় থেকে দুশ মাইল দূরে—বিন্ধ্য পর্বতের কিনারায়। দুর্ভেদ্য দুর্গ। পাহাড় কেটে তৈরী। ভেতরে ঢুকতে হলে পাকদণ্ডী ছাড়া আর পথ নেই।

এখন ভাঙন ধরেছে রায়পুর দুর্গে। বুরুজ ভেঙে পড়ছে। সেনানিবাসের প্রকাণ্ড আস্তানাও আর আস্ত নেই।

এককালে অনেক কামান ছিল রায়পুর দুর্গে। এখন আছে একটাই। কিন্তু কামানের মত কামান। এত ভারী কামান যে সরানো সম্ভব হয় নি। তাই পড়ে আছে। মর্চে ধরেছে। লম্বায় প্রায় আঠারো ফুট। গর্তটা এত বড় যে মানুষ ঢুকে যায়। কেল্লার সামনে চ্যাটালো প্রান্তরে বসানো এ-কামান নাকি ভিলসার বিখ্যাত ব্রোঞ্জ কামানের চেয়েও বড়। জাহাঙ্গীরের আমলে ঢালাই করা। বিজাপুরের কামানকেও টেক্কা মারতে পারে।

ফাঁকা চত্বরটার এ-প্রান্তে এসে পৌঁছোতেই ও-প্রান্তে হাজির হল একটা ক্ষুদে দল। কালাগনি দৌড়ে গিয়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো দলপতিকে।

এই তাহলে কালাগনির প্রভু? এরই হুকুমে এত কাণ্ড করেছে কালাগনি? কিন্তু লোকটার পরনে এত সাদাসিদে পোশাক কেন? নানাসাহেব তো মারা গেছেন। এ কে?

এগিয়ে এল দলপতি। রাগে থমথমে মুখ। দু চোখে আগুন।

যেন বনের বাঘ এগিয়ে আসছে শিকারের পানে। সংযত পদক্ষেপ। কিন্তু গনগনে চোখে আতীব্র রক্ততৃষা!

কর্ণেল মুনরো দু হাত বুকে রেখে সটান চেয়ে রইলেন দলপতির পানে। কাছাকাছি আসতেই চিনতে পারলেন।

বললেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে—"যাচ্চলে! এ যে বালাও রাও!"

"ভাল করে তাকিয়ে দেখুন!" বজ্র নির্ঘোষে বলল দলপতি।

"নানাসাহেব!" ভীষণ চমকে উঠলেন কর্ণেল। "নানাসাহেব বেঁচে আছে!"

হ্যাঁ। নানাসাহেবই বটে। সাতপুরার পাহাড়ে তাহলে কে মারা গেলেন?

বালাও রাও। তাঁর ভাই। অবিকল এক রকম দেখতে দুজনকে। একই রকম মুখের ছাঁদ, বসন্তের দাগ, এমন কি দুজনেরই আঙুল নেই একই হাতের। তাই লক্ষ্মৌ আর কানপুরের সেনাবাহিনী ভুল করেছে' ভুল করেছে ইংরেজ সরকার। নানাসাহেব সে ভুল ভাঙেন নি। চারমাস লুকিয়ে ছিলেন সাতপুরার পাহাড়ে—কর্ণেলের পথ চেয়ে।

ভয় হয়েছিল পাছে তাঁর মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কালাগনি ভেঙে না পড়ে। তাই নাসিমকে পাঠিয়েছিলেন বেনিয়াদের সঙ্গে স্টীমহাউসের আসার পথে। নাসিমের মুখেই কালাগনি সত্যি খবর পেয়েছিল—নানাসাহেব তার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছেন রায়পুর কেল্লায়!

একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন কর্ণেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল লেডী মুনরোর ছবি। মাথায় রক্ত উঠে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কানপুরের ইংরেজদের ঘাতক নানাসাহেবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাঘের মত।

নানাসাহেব শুধু দুপা পেছিয়ে গেলেন। অনুচরেরা নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্ণেলের ওপর। ছিঁড়েই ফেলত। নানাসাহেবের হুকুমে সরে গেল তফাতে।

ফের মুখোমুখি দাঁড়ালেন দু'জনে।

অনেকক্ষণ পরে মুখ খুললেন নানাসাহেব।

বললেন—"মুনরো, পেশোয়ারে একশ বিশজন কয়েদীকে আপনি তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপরেও বারোশো সিপাইকে যমালয়ে পাঠিয়েছেন ঐ ভাবে। নৃশংসভাবে লাহোরে সিপাই মেরেছিল আপনার লোক। দিল্লী দখল করার পর খুন করেছিল তিনজন প্রিন্স সমেত রাজ পরিবারের উনত্রিশজনকে। লক্ষ্মৌতে মেরেছিলেন ছহাজার ভারতবাসীকে

—পাঞ্জাবে তিনজাহার। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার অপরাধে সব মিলিয়ে একলক্ষ বিশহাজার সিপাই আর দুলক্ষ নিরীহ ভারতবাসীকে কামান, বন্দুক, তরোয়াল, ছোরা, ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছেন আপনারা।"

"রক্তের বদলে রক্ত চাই!" একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডাকাতরা।

ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলেন নানাসাহেব। বললেন—"মুনরো, আমার বান্ধবী ঝাঁসীর রাণীকে খুন করেছিলেন আপনি নিজের হাতে। সে প্রতিশোধও নেওয়া হয়নি।"

মুনরো জবাব দিলেন না।

নানাসাহেব বললেন—"চার মাস আগে আমার ভাই বালাও রাও মারা গেছে ইংরেজের গুলিতে। সে প্রতিশোধ নেওয়া বাকী আছে।"

"রক্তের বদলে রক্ত চাই!" আরো ভয়ংকর শোনালো সমবেত হুংকার! চেঁচিয়ে উঠেই ধেয়ে এল বন্দীর দিকে।

"চোপরাও!" গর্জে উঠলেন নানাসাহেব। চকিতে প্রতিহিংসা পাগল মানুষগুলো পেছিয়ে গেল পেছনে।

আবার বললেন নানাসাহেব—"মুনরো, আপনার পূর্বপুরুষ হেক্টর মুনরো মানুষ মারার একটা অভিনব পথ আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে এইভাবেই সিপাই মারা হয়েছিল ব্যাপকভাবে। মনে পড়ছে? জ্যান্ত মানুষকে কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দিয়েছেন আপনি নিজেও।

আবার ক্ষেপে গেল ডাকাতরা। আবার রক্ত জমানো হুংকার ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে।

নানাসাহেব হাতের ইঙ্গিতে শান্ত করলেন সবাইকে। বললেন ক্রুদ্ধ চাপা স্বরে—"ঠিক ঐ ভাবেই মরবেন আপনিও। কামানটা দেখেছেন? ঐ কামানের গোলায় উড়ে যাবেন সকাল হলেই। বিন্ধ্য পর্বতের দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে কামান গর্জন। লোকে জানবে—প্রতিহিংসা নেওয়া শেষ হয়েছে নানাসাহেবের।"

কর্ণেল একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন নানাসাহেবের পানে। মৃত্যু আসন্ন জেনেও কেঁপে উঠলেন না।

"বেশ, তবে তাই হোক," বলে এগিয়ে গিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন কামানের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু-গহ্বরের মুখে বেশ করে বেঁধে ফেলা হল তাঁকে।

ঐ অবস্থাতেই গালিগালাজ সইতে হল ঘণ্টা খানেক। হত্যা-পাগল লোকগুলো যা মুখে এল তাই বলে গেল সামনে এসে।

রাত হল। কেল্লায় ফিরে গেল ডাকাতরা। আজ তাদের মহোৎসব। খানাপিনার পর ঘুম। ভোর হলেই কামান-নিনাদ ছড়িয়ে পড়বে সারা বিন্ধ্য পাহাড়ে—সেই সঙ্গে কর্ণেল মুনরোর মৃত্যুসংবাদ।

এ কা কামানে-বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন কর্ণেল মুনরো।

পান ভোজনের হট্টগোল আস্তে আস্তে কমে এল। সারাদিনের ধকলের পর পেটে সুরা পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল ডাকাতরা।

একজন টলতে টলতে এসে দাঁড়াল কর্ণেলের সামনে। রাতের রক্ষী। কিন্তু সুরাপানে টলটলায়মান। কামানটায় হাত বুলিয়ে আপনমনে বললে—"দশ পাউণ্ড বারুদ ঠাসা হয়েছে। ভোর হলেই—দুম!" কর্ণেলের বাঁধন ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে একটা হিন্দুস্তানি গান ধরল রক্ষী। কিছুক্ষণ পরেই নাক ডাকতে লাগল সশব্দে।

মৃত্যুর মুহূর্ত গুনতে লাগলেন কর্ণেল। কিন্তু আশ্চর্য মনোবল তাঁর। ভয় পেলেন না একটুও। মনের মধ্যে ভীড় করে এল লেডী মুনরোর স্মৃতি। কানপুরের বিবি-ঘরে চারমাস আগেও তিনি মাথা ঠেকিয়ে চোখের জল ফেলে এসেছেন। দুশ ইংরেজকে নৃশংসভাবে খুন করে পাতকুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। পাশবিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন কানপুরের সেই ভয়ংকর—নানাসাহেব!

যার খোঁজে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছেন। কেল্লার মধ্যেই নিদ্রিত সে। কিন্তু কর্ণেল নড়তে পারছেন না কামানের সামনে থেকে।

স্ত্রী-র স্মৃতি জ্বলজ্বল করতে লাগল মনের পটে। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যেন সময় কেটে গেল। ভোর চারটের সময়ে অকস্মাৎ একটা আলো দেখা গেল দূরে।

আলোটা আলেয়ার আলোর মত কখনো নিভু-নিভু হচ্ছে, কখনো নতুন-তেজে জ্বলে উঠছে। দাঁড়িয়ে নেই—ছুটছে।

কাছে এগিয়ে এল চলন্ত আলো। এই সেই রহস্যময়ী উন্মাদিনী—"ছুটন্ত আগুনের শিখা"। চারমাস আগে সাতপুরার পাহাড়ে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে বিন্ধ্য পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে একনাগাড়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছেছে রায়পুর কেল্লায়। কেউ তাকে বাধা দেয়নি। নানাসাহেবও তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। কেন না, নানাসাহেব জানতেন না এরই পেছন পেছন গোরা সৈন্য গিয়ে হানা দিয়েছিল সাতপুরা পাহাড়ে।

কর্ণেল কখনো নাম শোনেননি 'ছুটন্ত আগুনের শিখা'র। তাই অবাক

হয়ে চেয়ে রইলেন অদ্ভুত মূর্তিটার দিকে। আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা। মশাল হাতে এগিয়ে আসছে·· আসছে·· আসছে!

কামানের সামনে এসে দাঁড়াল 'ছুটন্ত আগুনের শিখা'। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ। শূন্য চোখে চেয়ে আছে কর্ণেলের পানে।

ভীষণ উত্তেজনায় থর-থর করে কেঁপে উঠলেন কর্ণেল।

ঠিক সেই সময়ে মশাল উঁচিয়ে ধরল পাগলি। মুখের ঘোমটা খসে পড়ল। শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল কর্ণেলের পানে।

আর কোনো সন্দেহ রইল না। চোখ দেখেই চিনে ছিলেন—মুখ দেখে আর সংশয় রইল না। ন'বছরের ব্যবধানেও এ মুখ তিনি ভোলেন নি।

চেঁচিয়ে উঠল বুকফাটা কণ্ঠে—"লরা! লরা!"

হ্যাঁ। লরা-ই বটে। কর্ণেল মুনরোর স্ত্রী। কানপুরের বিবি-ঘরে তিনি মরেন নি। চোখের সামনে সবাইকে মরতে দেখেছেন, নিজের মা'কে নিহত হতে দেখেছেন, তারপর নিজে জখম হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন পাতকুয়ো ভর্তি লাশের ওপর।

পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তখন থেকেই।

কর্ণেলকে চিনতে পারলেন না লেডী মুনরো। শূন্য চাহনি মেলে চেয়ে রইলেন। ফের ককিয়ে উঠলেন কর্ণেল—"লরা! লরা!" লেডী মুনরো কিন্তু কিছুই মনে করতে পারলেন না। ডাক শুনেও অর্থ ধরতে পারলেন না। স্বামীকে চিনতে পারলেন না! জ্বলন্ত মশাল হাতে দুপা পেছিয়ে গেলেন চলে যাওয়ার জন্যে। পরক্ষণেই এগিয়ে এলেন সামনে। কামানের গায়ে মশাল বুলিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন! সিপাই বিদ্রোহের কামান গর্জনের কথা মনে পড়েছে বোধ হয়।

শিউরে উঠলেন কর্ণেল। কপালে কি স্ত্রীর হাতেই মৃত্যু লেখা ছিল? একটা ফুলকিও যদি ছিটকে পড়ে, এক্ষুনি পলতে পুড়ে যাবে—গোলা ছিটকে আসবে!

"লরা! লরা!" নানাসাহেবের অনুচররা হয়ত জেগে উঠবে এই চীৎকার শুনে। তবুও ডেকে চললেন কর্ণেল—"লরা! লরা!"

আচমকা কামানের গহ্বর থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে ঠেকল কর্ণেলের পেছনে। নিপুণ হাতে দড়ি কেটে মুক্তি দিল কর্ণেলকে। তারপর হাজ

ধরে কর্ণেল যাকে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন কামানের মৃত্যু-গহ্বর থেকে, সে আর কেউ নয়—গৌমি !

হ্যাঁ, গৌমি। ডাকাতদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে কোথাও যায় নি—ডাকাতদের ওপরেই নজর রেখেছিল। আড়াল থেকে শুনেছিল কর্ণেলকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার প্ল্যান এঁটেছেন নানাসাহেব।

তাই রায়পুরের কেল্লায় এসে লুকিয়েছিল কামানের নলের মধ্যে। যদি বাঁচাতে পারে মুনরোকে, ভালই। না পারলে একই সঙ্গে উড়ে যাবে তোপের মুখে।

রুদ্ধশ্বাসে বললেন মুনরো—"ভোর হতে আর দেরী নেই। লরাকে সঙ্গে নিতে হবে।"

"কোলে তুলে নেব," সংক্ষেপে বলল গৌমি।

কিন্তু আর সময় ছিল না। মশালের আগুন থেকে ফুলকি ছিটকে গিয়ে পড়ল কামানের পলতে-তে। নিমেষ মধ্যে যেন লক্ষ বজ্র গর্জে উঠল প্রকাণ্ড কামানের গর্ভে ! শিউরে উঠল গোটা বিন্ধ্য পর্বত !

আওয়াজের ধাকায় অজ্ঞান হয়ে স্বামীর কোলে ঢলে পড়লেন লেডী মুনরো। চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসেছিল রাতের রক্ষী।• বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে গৌমি ছুরী বসিয়ে দিল তার বুকে। তারপর শুরু হল পাকদণ্ডী বেয়ে নেমে যাওয়ার পালা।

ডাকাতরা উঠে পড়েছিল আওয়াজ শুনে। ছুটে বেরিয়ে এসে দেখল, রক্ষী নিহত। কামনের মুখে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তবে কি আপনা থেকেই বারুদ জ্বলে গিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে কর্ণেলকে ?

কার্নিশ থেকে হেঁট হয়ে নীচের উপত্যকায় তাকাল কালাগনি। হেঁকে উঠল সোল্লাসে—"ঐ তো ! ঐ তো ! পাকড়াও ! পাকড়াও !"

লেডী মুনরোকে কাঁধে ফেলে পাকদণ্ডী বেয়ে নেমে যাচ্ছিলেন কর্ণেল আর গৌমি। রায়পুর রোডে পৌছোতে পারলেই জব্বলপুরের পথ ধরা যাবে। কিন্তু ডাকাতরা যে তেড়ে আসছে পেছনে ?

শুধু কি পেছন থেকে, বিপদ এল সামনে থেকেও। স্বয়ং নানাসাহেব সহসা আবির্ভূত হলেন পথের ওপর। সঙ্গে একজন অনুচর। তিনি নিশাচর মানুষ। রাত হলেই বেরিয়ে পড়েন বিদ্রোহীদের মদত জোগাতে। সে রাতেও বেরিয়েছিলেন। আচমকা অসময়ে কামান গর্জন শুনে ছুটে আসছিলেন কেল্লার দিকে।

পলাতকদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন বাঁজখাই গলায় "মুনরো !"

তারবেশী কিছু বলা হল না। গৌমির ছুরী বসে গেল অনুচরের বুকে। নিমেষ মধ্যে ফের ছুরী উঠল নানাসাহেবকে লক্ষ্য করে। কিন্তু হাতের এক ঝটকায় ছুরী ছিটকে গেল দূরে। গৌমি একটুও দেরী না করে সাঁড়াশীর মত দুহাতে নানাসাহেবকে তুলে নিল শূন্যে এবং এগিয়ে গেল খাদের দিকে। উদ্দেশ্য—ভয় দেখিয়ে ডাকাতদের আটকে রাখা। মনিবকে বললে—"আপনি এগোন। আমার জন্যে দাঁড়াবেন না।"

কিন্তু এগোনোর আগেই মাত্র বিশ হাত দূরে সোল্লাসে কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল—"কর্ণেল মুনরো ! কর্ণেল মুনরো।"

বেহেমথ ! এগিয়ে আসছে হেলেদুলে। হাওদায় বসে স্টর আর কালোঁথ। গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে শুঁড় দিয়ে। সামনেই রায়পুর রোডের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে ব্যাঙ্কস, হুড, মক্লের, ম্যাকনীল, ফক্স, পারাজার্ড।

বেহেমথকে ডাকাতরা পোড়াতে পারে নি, কাটতে পারে নি, ভাঙতে পারে নি। ফেলে পালিয়েছিল। ব্যাঙ্কস বেহেমথকে ফের চালু করেছে। রায়পুর রোড ধরে আসতে আসতে সহসা কামান গর্জন শুনে আঁৎকে উঠেছে। তারপরেই দেখল কর্ণেল মুনরোকে !

তৎক্ষণাৎ সবাই উঠে পড়লেন হাওদার ওপর। নানাসাহেবকে বেঁধে ফেলা হল হাতির মাথায়। একহাতে রিভলবার আর এক হাতে ছুরী উঁচিয়ে পাশে বসে রইল ম্যাকনীল। বেগতিক দেখলেই ছুরী বসিয়ে দেবে নানাসাহেবের বুকে।

বেহেমথ পুরো দমে ছুটতে লাগল জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে। পেছন পেছন ছুটে আসতে লাগল ডাকাতদল।

ভালই ছুটছিল বেহেমথ। এঁকেবেঁকে নেমে এসে সিধে পথ ধরে গতি বাড়িয়ে তুলেছিল। হঠাৎ একটা খাড়াই গিরিপথ পড়ল সামনে। এ-পথে তো জোরে ছোটা যাবে না !

ডাকাতরা বেহেমথের সমস্যা বুঝে চেঁচিয়ে উঠল পেছন থেকে। দেখতে দেখতে এগিয়ে এল কাছে। গুলির পর গুলি চলছে। হাওদা থেকে গুলি চালানো হচ্ছে খুব হিসেব করে। বেশী গুলি তো নেই।

কালাগনি তা জানত। তাই কয়েকজন ডাকাত লুটিয়ে পড়া সত্ত্বেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল। হঠাৎ লাফিয়ে এগিয়ে এল সামনে—সেই হল তার কাল। ক্যাপ্টেনের গুলি কখনো ফসকায় নি। নিমেষে খতম হল কালাগনি।

কিন্তু বেহেমথ যে আর পারছে না। ভক ভক করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, বয়লার থর থর করে কাঁপছে। গিরিপথ ফুরিয়ে এসেছে বটে—কিন্তু বেহেমথের দমও যে ফুরিয়ে এসেছে!

লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন সবাই। ব্যাঙ্কস নামল সবার শেষে। রেগুলেটর ঘুরিয়ে দিয়ে নেমে এসেই দৌড়োলো সামনে। অদূরে ক্যান্টনমেণ্ট। কাছাকাছি যেতে পারলেও নিশ্চিন্ত। লেডী মুনরোর জ্ঞান ফিরেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছেন!

চালকহীন বেহেমথ এলোমেলো ভাবে পা ফেলতে ফেলতে ফেলতে গিরিপথ জুড়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাহাড়ের গায়ে হেলে পড়ল। স্টিম প্রেসার চরমে উঠেছে। গতি স্তব্ধ হওয়ায় তা ফাটিয়ে দিল বয়লারকে। অনেকগুলো বাজ যেন একসঙ্গে গর্জে উঠল গিরিপথে।

বেহেমথ ফেটে যাওয়ার ঠিক আগেই নানাসাহেবকে বাঁধন মুক্ত করার জন্যে চার-পাঁচজন ডাকাত লাফিয়ে উঠেছিল বেহেমথের পিঠে। কল্পনাতীত বিস্ফোরণের পর দেখা গেল কেউ আর বেঁচে নেই।

নিজে মরেও স্রষ্টাদের বাঁচিয়ে গেল বেহেমথ!

বেহেমথ ফেটে উড়ে গেল বটে, কিন্তু ভয়ংকর শব্দে কাঁপিয়ে গেল দিগ্‌বিদিক। পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে সে শব্দ ছুটে গেল দূরে··· বহু দূরে!

আওয়াজ শুনে ক্যান্টনমেণ্ট থেকে দৌড়ে এল পল্টন। পেছনের ডাকাতরা তাদের দেখে আর দাঁড়াল না। বিশেষ করে যার জন্যে এত কাণ্ড, সেই নানাসাহেব যখন নিহত, তখন পালানো ছাড়া আর পথ কী?

জব্বলপুরে ডাক্তার ডাকলেন কর্ণেল। স্ত্রী-কে দেখালেন। ঠিক হল বোম্বাই নিয়ে গিয়ে ভালোভাবে চিকিৎসা করতে হবে।

পরের দিন চৌঠা অক্টোবর। সদলবলে রওনা হলেন কর্ণেল। ট্রেনে চেপে যাবেন বোম্বাই। তার আগে দেখে গেলেন বেহেমথের ধ্বংসাবশেষ। অনেকদূরে পাওয়া গেল প্রকাণ্ড একটা পা। শুঁড়টা দানবিক হাতের মত গেঁথে গেছে পাহাড়ে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে লোহার পাত, স্ক্রু, বল্টু, পিন, পাইপ, ভালভ আর সিলিণ্ডার। বিস্ফোরণের সময়ে বয়লারের স্টিম প্রেসার খুব সম্ভব বায়ুমণ্ডলের চাপের বিশগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

তাই নকল হাতির ভাঙাচোরা কংকাল দেখে আর চেনা যায় না। কে

বলবে বিপুল শক্তিধর এই যন্ত্রযানই কিছু দিন আগে সারা উত্তর ভারতের মানুষের চক্ষুস্থির করে ছেড়েছিল!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল হুড—"বেচারা!"

ব্যাঙ্কস সান্ত্বনা দিয়ে বললে—"দুঃখ কর না। আর একটা বানিয়ে নেব 'খন। আরো বড়, আরো শক্তিমান বেহেমথ তৈরী করব।"

"কিন্তু এই বেহেমথ আর হবে না।" বলে বেহেমথের একটা দাঁত কুড়িয়ে নিল হুড স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চার-পাঁচটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু নানাসাহেবের লাশ দেখা গেল না। আঙুল কাটা হাতটা পর্যন্ত নেই! তবে কি অনুচররা তাঁর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গেছে?

শেষ পর্যন্ত নানাসাহেব সত্যিই মারা গেছেন কিনা, সেরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। মধ্যভারতে তাই দারুণ গুজব ছড়িয়ে পড়ল—নানাসাহেব এখনো বেঁচে আছেন!

ট্রেনে চেপে বোম্বাই পৌঁছোলেন কর্ণেল। একমাস চিকিৎসার পর লেডী মুনরো সেরে উঠলেন। চিনতে পারলেন স্বামীকে। কিন্তু 'ছুটন্ত আগুনের শিখা' রূপে দেশে দেশে ছুটে চলার কোনো কাহিনী মনে করতে পারলেন না।

কলকাতায় ফিরে এসে ঘরসংসারে মন দিলেন স্বামী-স্ত্রী। ক্যাপ্টেন হুড ফিরে গেলেন মাদ্রাজ সেনানিবাসে। যাওয়ার আগে কর্ণেল তাকে খোঁচা মেরে বলেছিলেন—"ওহে হুড, শেষ পর্যন্ত উনপঞ্চাশটার বেশী বাঘ তোমার হাতে মরল না। পঞ্চাশ নম্বরটাকে মেরে গেলে হত না?"

অবাক হয়ে বলল হুড—"সেকী কর্ণেল! পঞ্চাশ নম্বরকে তো আপনার সামনেই মারলাম।"

"সেকী!"

"কালাগনিই সেই পঞ্চাশ নম্বর। মানুষ-বাঘ। ঠিক কিনা?"

[চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত]

আশি দিনে ভূলোক ভ্রমণ

[অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ]

১॥ মনিব ভৃত্যে গাঁট ছড়া

মিস্টার ফিলিয়াস ফগ বার্লিংটন গার্ডেন্সের সাত নম্বর স্যাভিল রো'য়ে থাকতেন ১৮৭২ সালে। একই বাড়ীতে সেরিড্যান মারা গিয়েছিলেন ১৮১৪ সালে।

ফিলিয়াস ফগ রিফর্ম ক্লাব অর্থাৎ সংস্কার সমিতির সভ্য। চোখে পড়ার মত ব্যক্তিত্ব তাঁর, অথচ ফগ নিজে কিন্তু কারো চোখে পড়তে চাইতেন না। মানুষ হিসেবে তিনি যেন একটা জীবন্ত ধাঁধা। ফগ সাহেবের হাঁড়ির খবর রাখা তো দূরের কথা, কোনো খবরই কেউ জানত না। একটা কথাই শুধু জানা ছিল— ভদ্রলোক দারুণ কেতাদুরস্ত ঘষামাজা পুরুষ—সারা দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও এমন পালিশ করা মানুষ খুব অল্পই চোখে পড়ে।

লোকে বলত, ফিলিয়াস ফগের সঙ্গে নাকি বায়রণের দারুণ মিল, নিদেন পক্ষে ভদ্রলোকের করোটি নাকি বায়রণের করোটির ধাঁচে গড়া। কিন্তু সে-বায়রণ ছিলেন শান্তির প্রতিমূর্তি—হাজার বছর গড়িয়ে যাবে, কিন্তু বায়রণ কখনো বুড়ো হবেন না।

ইংরেজ হলে কি হবে, ফিলিয়াস ফগ আদৌ লণ্ডনবাসী ছিলেন কিনা সন্দেহ। শেয়ার মার্কেটে তাঁর ছায়াও দেখা যায় নি কোনদিন, ব্যাঙ্কের ধার কাছ দিয়েও যেতেন না, এমন কোনো জাহাজ কোনোদিন লণ্ডন ডকে পৌঁছোয়নি ফিলিয়াস ফগ যার মালিক, অথচ তিনি চাকরী-বাকরিও করতেন না; লণ্ডনের কোনো আদালতে কোনোদিন তাঁর চড়াগলার ওকালতি শোনা যায় নি, তিনি শিল্পপতি ছিলেন না, সওদাগর ছিলেন না, এমন কি ভদ্রচাষীও ছিলেন না। বৈজ্ঞানিক ও বিদগ্ধ মহলে কেউ তাকে চিনত না। লণ্ডন ইনষ্টিটিউসন, রয়াল ইনষ্টিটিউসন, শ্রমশিল্পী সমিতি অথবা চারু ও বিজ্ঞান মন্দিরেও কোনোদিন তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতা অথবা গলাবাজি কোনটাই শোনা যায় নি। ইংরেজ রাজধানীতে সমিতির তো অভাব নেই, বলতে গেলে ব্যাঙের ছাতার

মত সভাসমিতি গজিয়ে আছে—ঐক্য সমিতি থেকে শুরু করে মারাত্মক পোকামাকড় বধ করার জন্যে কীটবিদ্‌ সমিতি পর্যন্ত—অগণিত সমিতিতে জমজমাট রয়েছে লণ্ডন শহর। অথচ, মিস্টার ফিলিয়াস ফগ কোনোটির সঙ্গেই যুক্ত নন।

উনি শুধু রিফর্ম ক্লাবের সদস্য—ব্যস, তার বেশী কিছু না।

এই বিশেষ ক্লাবের সদস্য হওয়া সোজা নয়। কিন্তু ফগ সাহেব এসেছিলেন সোজা রাস্তায়। এমন একটা প্রতিষ্ঠান ওঁর নাম সুপারিশ করেছিলেন যাঁরা দেখেছিলেন ফিলিয়াস ফগের চেক ব্যাঙ্কে হাজির করলেই টাকা পাওয়া যায়। ওঁর চেক দেখা মাত্র কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট যেন ঝমঝম শব্দে টাকা ঢেলে দেয়। ফগ সাহেবের কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টে টাকা নাকি কখনো ফুরোয় না!

ফিলিয়াস ফগ কি তাহলে ধনকুবের? কোনো সন্দেহই নেই তাতে। কিন্তু তাঁর নাড়ি-নক্ষত্র যাঁরা জানেন, তাঁরাও ভেবে পান না ফগ সাহেব এত টাকা পেলেন কোত্থেকে, মিস্টার ফগকেও কথাটা জিজ্ঞেস করা যায় না। খুব যে খরুচে ছিলেন উনি তা নয়। আবার উল্টো দিক দিয়ে দেখতে গেলে, হাড়কেপ্পনও ছিলেন না। কেন না, টাকার দরকার হলেই নিঃশব্দে—কখনো কখনো বেনামীতে দেদার টাকা ঢালতেন—দরকারটা অবশ্য মহৎ, প্রয়োজনীয় হওয়া চাই—টাকাটা পাঁচ জনের উপকারে লাগা চাই।

ছোট্ট করে বলতে গেলে, পয়লা নম্বরের ঠোঁটটেপা মানুষ ছিলেন ফিলিয়াস ফগ। কথা বলতেন খুব কম। অল্প কথার মানুষ ছিলেন বলেই আরো প্রহেলিকাবৎ মনে হত তাকে। তাঁর রোজকার আচার আচরণ এমনই এক-ঘেয়ে, রুটিন মাফিক, ঘড়ি বাঁধা যে কৌতূহলী পর্যবেক্ষকের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যেত বেশ কিছুক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখার পর।

তবে কি উনি দেশে বিদেশে এন্তার বেড়িয়েছেন? হয়ত তাই, কেননা পৃথিবীটাকে তার চাইতে বেশী কেউ জানতেন বলে মনে হয় নি কোনোদিন। ভূগোলকের হেন জায়গা নেই যা তাঁর নখদর্পণে নেই। নিখোঁজ নিরুদ্দেশ পর্যটকদের অজ্ঞাত ভাগ্যকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার গল্পরচনা হত। উনি অল্প কিন্তু স্পষ্ট কথায় অন্যান্য সদস্যদের ভুলভ্রান্তি শুধরে দিতেন।

যেন দিব্য-চোখে দেখতে পাচ্ছেন নিরুদ্দেশ ভ্রামণিকের পরিণতি—কথা বলতেন এমনি ভাবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পরে এক সময়ে দেখা যেত তাঁর ভবিষ্যদবাণীই সত্যি হয়েছে! সুতরাং নিশ্চয় উনি ভ্রমণ করেছেন বিস্তর—অন্ততঃ মনে মনে তো বটেই!

এটাও ঠিক যে ফিলিয়াস ফগ বহু বছর লণ্ডনের বাইরে যান নি। যাঁরা তাঁর হাঁড়ির খবর রাখে, তাঁরাও বলেন একই কথা—লণ্ডনের বাইরে মিস্টার ফগকে দেখা যায় না কখনো। তাঁর এক মাত্র বাতিক হল খবরের কাগজ পড়া আর তাস নিয়ে হুইস্ট খেলা। খেলায় প্রায় জিততেন উনি। কেননা, মানুষটার মত খেলাটাও খুব চুপচাপ তো—বেশ মিল খেয়েছিল দুটিতে। কিন্তু তাসে বাজি জিতে টাকাটা পকেটে পুরতেন না কস্মিন কালেও—জমা থাকত দাতব্য ভাণ্ডারে। উনি তাস খেলতেন পয়সার জন্যে নয়, জেতবার জন্যেও নয়, স্রেফ খেলবার জন্যে। ওঁর চোখে হুইস্ট খেলা হল একটা দারুণ প্রতিযোগিতা, বাধাকে অতিক্রম করার নিরন্তর লড়াই; অথচ তা দিব্বি অনড় যা কিনা বেশ খাপ খেয়ে যায় তাঁর রুচির সঙ্গে।

ফিলিয়াস ফগের বউ নেই, ছেলেপুলেও নেই—অধিকাংশ সজ্জন ব্যক্তিরই তা থাকেনা। আত্মীয় স্বজন নেই, প্রাণের বন্ধুও নেই—এটা অবশ্য আরো অস্বাভাবিক ব্যাপার। স্যাভিল রো'র বাড়ীতে উনি একা থাকতেন—কেউ সে বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো না। একটি মাত্র গৃহভৃত্য সেবা করত তাকে। উনি খাওয়া দাওয়া ক্লাবেই করতেন—কাঁটায় কাঁটায় রোজ হাজির হতেন ক্লাবের বিশেষ একটি ঘরে, বিশেষ একটি টেবিলে। খাবার টেবিলে অন্য কোনো সভ্যকে থাকতে দিতেন না। সঙ্গে অতিথিকেও আনতেন না। বাড়ী ফিরতেন কাঁটায় কাঁটায় রাত দুপুরে কেবলমাত্র বিছানায় চিৎপটাং হওয়ার জন্যে। মান্যগণ্য সদস্যদের খাতির করা হত আরামদায়ক ক্লাবরুমে, কিন্তু ফিলিয়াস আরামের ধার ধারতেন না, সে ধরনের কোনো ঘরও নিতেন না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টা কাটাচ্ছেন স্যাভিল রো'র সাজঘর, আর বাথরুমে। বেড়ানোর ইচ্ছে হলে হলঘরের মোজেক বাঁধানো মেঝেতে মেপে মেপে পা ফেলে পায়চারী করতেন, নয়তো সার্কুলার গ্যালারীতে ঘুরপাক খেতেন। বিশটা থামের ওপর—গ্যালারী গম্বুজের নীচে নিয়মিত পদক্ষেপে ভ্রমণ করতেন ফগ, নীল রঙ করা জানলার আলোয় আলোকিত হত তাঁর সটান মূর্তি। ক্লাবে প্রাতরাশ বা পেট ভরে খাওয়ার সময়ে এলাহি কাণ্ড আরম্ভ হত খাবার টেবিলে। রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর, মাখনঘর, নানা ঘরের যা কিছু উৎকৃষ্ট, সব আসত তাঁর টেবিলে। খাবার পরিবেশন করত সবচাইতে গম্ভীর মুখো ওয়েটাররা ড্রেসকোট আর রাজহাঁসের চামড়ার শুকতলা দেওয়া জুতোপরে। খাবার খেতেন সবসেরা পোর্সিলেন পাত্রে—টেবিলে পাতা হত অতি মিহি মহার্ঘ বস্ত্র। দুষ্প্রাপ্য ছাঁচের অদ্ভুত সুরা পাত্রে থাকত ওঁর শেরী, পোর্ট আর দারুচিনি সুরভিত

ক্ল্যারেট মস্ত। খোলাম কুচির মত টাকা উড়িয়ে আমেরিকান হ্রদ থেকে আনা হত বরফ তাঁর পানীয় শীতল রাখার জন্যে।

এ-হেন জীবন ধারা দেখে কেউ যদি বলেন ফিলিয়াস ফগের মাথায় ছিট আছে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে ছিটগ্রস্ত হওয়ার ভেতরেও নিশ্চয় অনেক ভাল ব্যাপার আছে।

স্যাভিল রো'র সৌধ জমকালো না হোক, অতীব আরামপ্রদ। গৃহস্বামী একমাত্র গৃহভৃত্যের ওপর দিবারাত্র তম্বি করেন না। তবে ফিলিয়াস ফগ চান তাঁর সেবাদাসটি যেন অতিমানবিক ভাবে ক্ষিপ্র হয় এবং ঘড়িবাঁধা হিসেবে কাজকর্ম সারে। যে-দিনের ঘটনা বলছি, সেই দোসরা অক্টোবর তিনি এক কথায় বরখাস্ত করেছেন জেমস ফর্স্টারকে পান থেকে চূণ খসার অপরাধে। বেচারা ফর্স্টার দাড়ি কামানোর জন্যে যে-গরম জল দিয়েছিল তার তাপমাত্রা ছিয়াশি ডিগ্রী ফারেনহাইটের বদলে চুরাশি ডিগ্রী ফারেনহাইট হয়েছিল। ফিলিয়াস ফগ তাই পথ চেয়ে বসে আছেন নতুন গৃহভৃত্যের। তার আসবার কথা এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে।

বেশ মৌজ করে হাতলওলা চেয়ারে বসেছিলেন ফিলিয়াস ফগ। দুই পা যুক্ত—কুচকাওয়াজ করার সময়ে গ্রেনেড নিক্ষেপকারী পদাতিক সৈন্যর পা যেরকম জোড়া থাকে—অবিকল সেই রকম। হাতদুটি রাখা হাঁটুর ওপর। দেহ সিধে। মাথাও তাই। পলকহীন চোখে উনি তাকিয়ে আছেন বিশেষ একটি ঘড়ির দিকে। ঘড়িটি সূক্ষ্ম জটিল যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। এ ঘড়িতে মিনিট, সেকেণ্ড, ঘণ্টা, দিনের হিসেব থেকে শুরু করে মাস, বছরের হিসেব পযন্ত পাওয়া যায় নিখুঁত ভাবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঠায় বসে আছেন ফিলিয়াস ফগ। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটার সময়ে রোজকার অভ্যেস মত উনি স্যাভিল রো থেকে রওনা হবেন রিফর্ম অভিমুখে।

ঠিক এই মুহূর্তে দরজায় টোকা পড়ল। ফিলিয়াস ফগের নিরিবিলি ঘরে ঢুকল সদ্য চাকরী যাওয়া গৃহভৃত্য জেমস ফর্স্টার।

"নতুন চাকর এসেছে," বলল ফর্স্টার।

বছর তিরিশ বয়সের এক যুবাপুরুষ এগিয়ে এসে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করল ফিলিয়াস ফগকে।

ফগ বললেন—"তুমি দেখছি ফরাসী। তোমার নামই না জন?"

"জঁা", জবাব দিল নবাগত জঁা পাস্‌পার্তু। "যেহেতু আমি ক্রমাগত কাজ বদলাই, তাই লোকে আমাকে ব্যঙ্গ করে পাস্‌পার্তু নাম দিয়েছে।

আমি কিন্তু সৎ। তবে অনেক ঘাটের জল খেয়েছি। পথে পথে গান গেয়ে বেড়িয়েছি, কিছুদিন একটা সার্কাসের দলে ঘোড়ার পিঠেও খেলা দেখিয়েছি। সেখানে লিওটার্ডের মত ডিগবাজী খেতাম, ব্লনডিনের মত দড়ির ওপর নাচতাম। তারপর কিছুদিন আমার প্রতিভাকে আরো ভাল-ভাবে কাজে লাগানোর জন্যে জিমন্যাস্টিক প্রফেসর হই। এরপর প্যারিসের দমকল বাহিনীতে নাম লিখিয়ে বহু বড়বড় আগুন নিভিয়েছি। প্যারিস ছেড়েছি বছর পাঁচেক আগে। ঘরোয়া জীবনের আরাম পাওয়ার জন্যে সংসার দেখাশুনোব কাজ নিয়েছিলাম ইংলণ্ডে একজনের বাড়ীতে। সে চাকরী গিয়েছে। বেকার বসেছিলাম। এমন সময়ে শুনলাম সারা বৃটেনে আমার যোগ্য মনিব হতে পারেন কেবল একজনই—মঁসিয়ে ফিলিয়াস ফগ। ঘড়ি ধরে চলেন উনি, হিসেব করে ওঠেন বসেন। তাই এসেছি আপনার কাছে। মঁসিয়ে যদি দয়া করে জায়গা দেন তো বাকী জীবনটা শান্তিতে কাটাই এবং পাস্‌পার্তু অপবাদটাও যেন ভুলে যেতে পারি।"

"পাস্‌পার্তুকে আমিও চাই" বললেন ফগ। "তোমার সৎ-স্বভাবের সুপারিশ আগেই কানে এসেছে। তোমার সম্বন্ধে অনেক ভালো খবরও পেয়েছি। চাকরীর সর্তগুলো জানা আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, এখন কটা বেজেছে?"

"এগারোটা বেজে বাইশ মিনিট," পকেট গহ্বর থেকে একটা প্রকাণ্ড রূপোর ঘড়ি বার করে বলল পাসপার্তু।

"তোমার ঘড়ি ঢিমেতালে চলছে।"

"মাপ করবেন—এ অসম্ভব!'

"তোমার ঘড়ি চার মিনিট স্লো আছে। যাকগে, ভুলটা ধরিয়ে দিলাম, এই যথেষ্ট। তুমি আমার চাকরীতে বহাল হলে এই মুহূর্ত থেকে, মানে, দোসরা অক্টোবর বুধবার সকাল ১১টা ১৯ মিনিট থেকে।"

উঠে দাঁড়ালেন ফিলিয়াস ফগ। বাঁ হাতে টুপী নিয়ে মাথায় দিলেন অবিকল কলের পুতুলের মত এবং আর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে গেলেন বাড়ী থেকে।

পাস্‌পার্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল দড়াম করে বন্ধ হল রাস্তার দরজা—নয়া মনিব বেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ হল আরেকবার—প্রাক্তন গৃহভৃত্য জেমস ফর্সস্টার বিদায় নিল। স্যাভিল রো'র বাড়ীতে একলা দাঁড়িয়ে রইল পাস্‌পার্তু।

২॥ ভৃত্য পেল আদর্শ মনিব

"চমৎকার!" সহর্ষে বলল পাস্‌পার্তু—"নতুন মনিবের মত এমন খাসা লোক কেবল ম্যাডাম তুসোদের কাছেই দেখেছি।"

ম্যাডাম তুসোদের 'লোকজন' অবশ্য সবই মোমের পুতুল! সারা লণ্ডন উচ্ছ্বসিত তাঁর পুতুল শিল্পকলায়। পুতুলগুলো যদি কথা বলতে পারত, তাহলে পুতুল বলে আর চেনাই যেত না।

ফিলিয়াস ফগের সঙ্গে ছোটখাট ইণ্টারভিউ দিয়ে পাসেপার্তু যা দেখবার তা দেখে নিয়েছিল। নতুন মনিবের বয়স বছর চল্লিশ। দিব্যকান্তি সুপুরুষ। চোখ মুখ নিখুঁত। ঢ্যাঙা পেটাই চেহারা। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন মেপে তৈরী। চুল পাতলা, ঝুলপীও পাতলা। বলিরেখাবহুল ছোট্ট কপাল। মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর। দাঁত তো নয়, যেন মুক্তার সারি। মুখাবয়ব দেখে যারা চরিত্র নির্ণয় করেন, তাঁরা ফিলিয়াস ফগের মুখ দেখে বলবেন, ধীর স্থির শান্ত সংযত মানুষ তিনি। এ-ধরনের লোকরা বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে কাজ করাটা বেশী পছন্দ করেন। মিষ্টার ফগের টলটলে পরিষ্কার চোখ দেখে অ্যানজেলিকা কফম্যানের আঁকা খাঁটি ইংরেজের চোখের কথা মনে পড়বে। তাঁর সারাদিনের চলাফেরা ওঠাবসা খাওয়া দাওয়া দেখে একটা কথাই ঘুরেফিরে আসবে মনের মধ্যে—মানুষটার মধ্যে বেতাল বলে কিছুই নেই। সব মাপা জোপা হিসেব করা বিখ্যাত লেরয় ক্রোনোমিটারের মত।

ভদ্রলোকের সব কিছু এত সঠিক যে কোনো ব্যাপারেই ওঁর তাড়াহুড়ো নেই। অযথা পদক্ষেপ বা হস্ত সঞ্চালন করে শক্তিব্যয় করতে উনি নারাজ। উনি কোথাও যেতে হলে সর্টকাট রাস্তা ধরে যান। অযথা হাত-পা ছোঁড়া বা উত্তেজিত হওয়া ওঁর কুষ্ঠীতে লেখেনি। ধড়ফড় না করেও গন্তব্যস্থানে পৌঁছোন কিন্তু কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে।

উনি থাকেন একলা—সমাজের নাগালের বাইরে। পথ চলার সময়ে গা বাঁচিয়ে চলেন পাছে কারও সঙ্গে ধাক্কা লেগে দেরী হয়ে যায়। ঘর্ষণ মানেই তো শক্তির অপচয়। সুতরাং খামোকা গা-ঘষাঘষি করতে উনি নারাজ।

পাসেপার্তু নিজে কিন্তু খাঁটি প্যারিস বাসিন্দা। ইংলণ্ডের বাড়ী বাড়ী কাজ করেছে সে, কিন্তু মনের মনিব পায়নি কোথাও। লোকটা ভেতরে বাইরে নির্জলা খাঁটি। ভাল মানুষের মত মুখ—দেখলে অপছন্দ হয় না। অধরোষ্ঠ ঈষৎ বাইরে বার করা। কথাবার্তা মধুর– সেবা করার জন্যে সদাই

উন্মুখ। করোটি নিটোল গোলাকার। চোখ নীল, মুখ লাল। চেহারা মজবুত, মাংসপেশীবহুল। ছেলেবেলায় নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে অসুরের মত জোর গায়ে। প্রাচীন ভাস্কররা নাকি মিনার্ভার চুলের গোছা আঠারো রকম ভাবে সাজাতে পারতেন। কিন্তু পাসেপার্তু জানে কেবল একটি পন্থা। দাড়াচিরুণী দিয়ে গুণে গুণে তিনবার চুল আঁচড়েই শেষ হয় তার সাজগোজ। এই কারণেই সব সময়ে পাসেপার্তুর চুল অগোছালো অবস্থায় দেখা যায়।

তার মত সজীব মানুষ ফিলিয়াস ফগের মত যন্ত্রবৎ মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে তো? পাস্পার্তু মনিবের মত মানুষ-ঘড়ি হতে পারবে কিনা সেটা এখন থেকেই ভবিষ্যদবাণী করা সম্ভব নয়। তবে বেচারী প্রথম জীবনে বিস্তর দামালিপণা করার পর ইংলণ্ডে এসেছিল ঘরসংসারের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে থাকবার জন্যে। কিন্তু টিঁকতে পারেনি কোথাও। সর্বশেষ মনিব লর্ড লঙফেরি ছিলেন পার্লামেন্টের মেম্বার। শেষরাতে তাঁর মত লোককে পুলিশ ভাটিখানা থেকে তুলে এনে পৌছে দিয়ে যেত বাড়ীতে। এই নিয়ে একটু জ্ঞান দিতে গিয়েছিল বেচারী পাসেপার্তু। কিন্তু অযাচিত উপদেশের কদর না পাওয়ায় চাকরীতে ইস্তফা দিল সে। তার পরেই শুনল, ফিলিয়াস ফগের একজন গৃহভৃত্য দরকার। ভদ্রলোক দারুণ সংযত, রুটিন মাফিক। কখনো রাত কাটান না বাইরে। ভ্রমণের বাতিক নেই। শুনেই লাফিয়ে উঠল পাসেপার্তু। এতদিনে বোধহয় পাওয়া গেল মনের মত মনিব।

হলও তাই। প্রথম দর্শনেই মনে ধরল দুজনের দুজনকে।

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময়ে স্যাভিল রো'র বাড়ীতে একলা দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবল পাস্পার্তু। দেরী না করে তক্ষুনি দেখে নিল সারা বাড়ীটা। পাতাল কুঠরী থেকে আরম্ভ করে চিলে কোঠা পর্যন্ত—সর্বত্র ছবির মত গুছোনো। দেখে বড় খুশী হল সে। অগোছালো শব্দটা যেন এ-গৃহে অজ্ঞাত। দোতলায় উঠে এক নজরেই চিনতে পারল নিজের ঘর। ঘর পছন্দ হল পাস্পার্তুর। দেখল ঘরময় অনেক রকম কথা বলার চোঙা আর ইলেকট্রিক ঘণ্টা—মনিবের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। দেওয়ালে একটা ইলেকট্রিক ঘড়ি। মনিবের শোবার ঘরের ইলেকট্রিক ঘড়ির সঙ্গে তার সেকেণ্ড পর্যন্ত মিলোনো। মনিব-ভৃত্য একই কাঁটায় বাঁধা।

হঠাৎ চোখ পড়ল ঘড়ির ওপর দিকে। একটা কার্ড গোঁজা সেখানে। কার্ডে লেখা দৈনিক কার্য তালিকা। কাজ শুরু হয়েছে সকাল আটটা থেকে—তখন ফিলিয়াস ফগের নিদ্রাভঙ্গ হয়। উনি চা টোস্ট খাবেন ঠিক আটটা

তেইশ মিনিটে, নটা সাঁইত্রিশ মিনিটে চাইবেন দাড়ি কামানোর জল, নটা পঞ্চাশ মিনিটে যাবেন কলতলায়। এই ভাবে চলেছে রাত বারোটা পর্যন্ত— যখন কলের মানুষ ফিলিয়াস ফগ শুতে যাবেন।

মনিবের জামাকাপড়ের আলমারীতে প্রতিটি পোশাকে লেবেল সাঁটা। তাতে লেখা বছরের কোন সময়ে, কবে কখন কি পোশাক পরবেন। জুতোর বেলাও সেই নিয়ম। ভাবলেও অবাক লাগে এইরকম সুবিন্যস্ত একটা বাড়ীতে এককালে দারুণ অগোছালো ভাবে জীবন কাটিয়ে গেছেন বাগ্মী সেরিড্যান।

ফিলিয়াস ফগের লাইব্রেরী নেই। দরকার হয় না। কারণ ক্লাবেই দুটো লাইব্রেরী আছে। একটা সাহিত্যের, আরেকটা আইন আর রাজনীতির।

শোবার ঘরে একটা মাঝারি সাইজের সিন্দুক। আগুন বা চোরের সাধ্য নেই তাতে আঁচড় কাটে। বাড়ীতে বন্দুক বা কোনো হাতিয়ারের বালাই নেই। দরকার হয় না। ফিলিয়াস ফগ শান্তিপ্রিয় মানুষ।

দেখে শুনে কান এঁটো করা হাসি হেসে নিজের মনেই বলল পাসেপার্তু— "ঠিক এই রকমটিই চেয়েছিলাম আমি! দিব্বি থাকব দুজনে! সত্যিই, কি অপূর্ব হিসেবী মানুষ—ঠিক যেন মেশিন! মেশিনের সেবা করতেই তো আমি চাই!"

৩॥ খোলাম কুচির মত টাকা উড়বে ফিলিয়াস ফগের

বেলা ঠিক সাড়ে এগারোটার সময়ে সদর দরজা বন্ধ করলেন ফিলিয়াস ফগ। তারপর ডান পা বাঁ-পায়ের আগে ৫৭৫ বার আর বাঁ পা ডানপায়ের আগে ৫৭৬ বার ফেলে পৌঁছে গেলেন ক্লাবে।

রিফর্ম ক্লাব পলমল-এ। বিরাট অট্টালিকা, তিরিশ লক্ষ পাউণ্ডের কম নয় বাড়ীটার দাম।

ফিলিয়াস ফগ সোজা গেলেন খাবার ঘরে। বসলেন নিজের টেবিলে। টেবিলে কাপড় পেতে ব্রেক ফাষ্ট সাজিয়ে রেখেছিল ওয়েটার। ভোজন কক্ষের নটা জানলা দিয়ে শরৎকালের সোনালী রোদে ধোওয়া সুন্দর বাগান দেখতে দেখতে কাঁটা চামচ তুলে নিলেন মিস্টার ফগ।

রিফর্ম ক্লাবের চায়ের বেজায় নামডাক। সেই চা বেশ কয়েক কাপ খেলেন মিস্টার ফগ। সেই সঙ্গে উদরে চালান করলেন একটা সস মাখানো মাছ ভাজা, লালচে রঙের সেঁকা মাংস, কিছু শাক আর চীজ!

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ১টা বাজতে ১৩ মিনিটের সময়ে। বড় হল

ঘরের দিকে পা চালালেন। এ-ঘরের দেওয়াল জোড়া কেবল অয়েল পেন্টিং। দামী ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো সে-সব চিত্র বাস্তবিকই দেখবার মত। একজন ভৃত্য হাতে তুলে দিল একটা টাইমস্ কাগজ। অভ্যস্ত হাতে কাগজের পাতা কেটে পড়তে শুরু করলেন ফগ। পৌনে চারটাব সময়ে হাতে এল স্ট্যান্ডার্ড কাগজ। এটি পড়া শেষ হল ডিনার খাওয়ার সময় উপস্থিত হলে।

নৈশ ভোজ সমাপ্ত হল ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার রীতিতেই। ৬টা বাজতে যখন ২০ মিনিট, ফিলিয়াস ফগ ফের এলেন পড়ার ঘরে।

আধ ঘণ্টাব মধ্যেই এসে পড়লেন ওঁর তাস খেলার সঙ্গীরা। ইঞ্জিনীয়ার অ্যানড্রু স্টুয়ার্ট, ব্যাঙ্কাব জন স্থলিভান আর স্যামুয়েল ফ্যালেনটিন, মদ প্রস্তুত-কারক টমাস ফ্লানাগান, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের ডিরেক্টর গাথিয়াব র‍্যালফ। এঁরা প্রত্যেকেই রীতিমত ধনবান এবং মান্যগণ্য ব্যক্তি।

আগুনের চুল্লীর চারধারে বসলেন এঁরা। টমাস ফ্লানাগান জিজ্ঞেস করলেন--"র‍্যালফ, ডাকাতির কিছু কিনারা হল?"

"কিস্সু হয় নি। ব্যাঙ্কের টাকাটা জলে গেল।"

"আমার তা মনে হয় না," বললেন র‍্যালফ। "চোর ধরা পড়বেই। ইউরোপ আমেরিকার প্রধান বন্দরগুলোয় নজর রেখেছে ঝানু গোয়েন্দারা। এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো সোজা নয়।"

"চোরকে দেখতে কেমন, তা জানেন?" স্টুয়ার্টের প্রশ্ন।

"টাকা যে নিয়েছে, সে কিন্তু চোব নয়," দৃঢ় কণ্ঠ র‍্যালফের।

"বলেন কী। পঞ্চান্ন হাজাব পাউণ্ড নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল, অথচ সে চোব নয়?"

"না।"

"তবে কি শিল্পপতি?"

"ডেলী টেলিগ্রাফ লিখছে, লোকটা বেশ ভদ্রলোক।"

শেষ মন্তব্যটা কাগজের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে ছুঁড়ে দিলেন ফিলিয়াস ফগ।

আলোচনার বিষয়বস্তু এক দিনের আলোয রাহাজানি। তিন দিন আগে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডে এক প্যাকেট নোট চুরি গেছে। পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ডের নোট ছিল প্যাকেটে। খাজাঞ্চি মশায় তখন সাড়ে তিন শিলিংয়ের রসিদ লিখতে ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। চারদিকে কাঁহাতক আর চোখ রাখা যায়? তাছাড়া ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড বিশ্বাস করে সবাইকে। ব্যাঙ্কে যারা টাকা নিতে বা দিতে আসে, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাদের প্রত্যেককেই সাধুসজ্জন বলে ধরে নেয়।

তাই সোনারূপো নোট পাহারা দেওয়ার জন্যে প্রহরী বা খাঁচা—কোনোটারই ব্যবস্থা নেই। যে-কেউ সোনারূপো টাকাকড়ি নিয়ে ঘাঁটতে পারে, এমন কি বগলদাবা করে সটকান দিতেও পারে—কেউ বাধা দেবেনা! একবার একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। এক ভদ্রলোক একটা সাত আট পাউণ্ড ওজনের সোনার বাট হাতে নিয়ে দেখছিলেন নিছক কৌতূহলবশে। তাই দেখে বাটটা হাতে নিল পাশের লোকটি। এইভাবে হাতে হাতে সোনার বাট বেরিয়ে গেল ফটক দিয়ে রাস্তায়—আধঘণ্টা পরে অবশ্য ফের ফিরে এল যথাস্থানে। কিন্তু আগাগোড়া মাথা তোলবার সময়ও পেল না ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক।

এক্ষেত্রে কিন্তু উল্টো ব্যাপার ঘটেছে। পাঁচটার সময়ে ধরা পড়ল টাকা উধাও। সঙ্গে সঙ্গে লাভ-লোকসানের খাতায় যথারীতি টাকার হিসেবটা বসিয়ে সতর্ক করা হল বাঘা-বাঘা গোয়েন্দাদের। পুরস্কার ঘোষণা করা নগদ দুই হাজার পাউণ্ড এবং যত টাকা উদ্ধার পাবে, তার শতকরা পাঁচ ভাগ। দেখতে দেখতে গোয়েন্দারা ছড়িয়ে পড়ল লিভারপুল, গ্লাসগো, সুয়েজ, ব্রিন্দাস, নিউইয়র্কে।

ডেলী টেলিগ্রাফ লিখেছে, চোর মহাপ্রভুকে নাকি দেখতে দিব্বি ভদ্রলোকের মত। যে-ঘরে টাকাটা খোয়া গেছে, সেই ঘরেই মার্জিত চেহারার সুবেশ সুদেহী সেই ভদ্রলোককে ঘুর-ঘুর করতে দেখা গেছে অনেকক্ষণ থেকে। লোকটার চেহারার বর্ণনা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গোয়েন্দাদের কাছে। এই সবের জন্যেই র‍্যালফের বিশ্বাস চোর ধরা পড়বেই।

খবরটা চাঞ্চল্য জাগিয়েছে সারা দেশে—বিশেষ করে রিফর্ম ক্লাবে। কেননা এ-ক্লাবের বেশ কয়েকজন সদস্য হোমরা-চোমরা ব্যাঙ্ক অফিসার।

র‍্যালফের বিশ্বাস, মোটা পুরস্কার হাঁকা হয়েছে যখন, গোয়েন্দারা আদাজল খেয়ে লাগবে। তস্কর শিরোমণিকেও পাকড়াও করবে। স্টুয়ার্টের ধারণা অবশ্য অন্যরকম। হুইস্ট খেলতে খেলতে এই নিয়েই চলল জোর আলোচনা।

স্টুয়ার্ট বললেন—"চোর অতিশয় ধড়িবাজ। পরিস্থিতিও তার অনুকূলে। সুতরাং সে চম্পট দেবেই।"

"পালিয়ে সে যাবে কোথায়? কোনো দেশই এখন নিরাপদ নয় তার কাছে।" বললেন র‍্যালফ।

"ফুঃ!"

"কোথায় যাবে তা তো বললেন না?"

"পৃথিবীটা ছোট্ট তো নয়—পালানোর আবার জায়গার অভাব।"

খাটো গলায় এই সময়ে বললেন ফিলিয়াস ফগ—"পৃথিবীটা এককালে বড়

ছিল, এখন নয়," এই বলে টমাস ফ্লানাগানকে তাস বাড়িয়ে দিলেন ফগ—"তাস কাটুন।"

বাজী শেষ না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত রইল। তারপর ফের স্টুয়ার্ট বললেন—"পৃথিবীটা এককালে বড় ছিল, কথাটার মানে বুঝলাম না। পৃথিবী কি এখন ছোট হয়ে গেছে?"

"গেছে বই কি," বললেন র‍্যালফ। "পৃথিবী ঘুরে আসতে এখন যে সময় লাগে, একশ বছর আগে লাগত তার দশ গুণ সময়। সেই কারণেই বললাম, চোর—যত ঘুঘুই হোক না কেন, ধরা পড়বেই।"

"একই কারণে কিন্তু চোরের পিঠটান দেওয়ার সম্ভাবনাটাও খুব বেশী।"

"মিস্টার স্টুয়ার্ট," বললেন ফিলিয়াস ফগ—"এবার আপনার পালা।"

কিন্তু স্টুয়ার্টের মাথার মধ্যে তখন অবিশ্বাস খোঁচা মারছে, খেলার দিকে মন নেই। হাতের তাস ফুরোতেই শুধোলেন সাগ্রহে—"র‍্যালফ, পৃথিবী ছোট্ট হয়ে গেছে, এ-কথা তুমি বলছ অদ্ভুত একটা যুক্তিব ভিত্তিতে। যেহেতু তিন মাসে ভূলোক ভ্রমণ সম্ভব—"

"আশি দিনে—" মাঝখান থেকে বলে উঠলেন ফিলিয়াস ফগ।

"কথাটা ঠিক," বললেন জন সুলিভান।" রোটাস আর এলাহাবাদের মধ্যে রেলপথ খুলেছে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে। "সুতরাং ভূলোক ভ্রমণ এখন ৮০ দিনেই সম্ভব। এইতো হিসেব দিয়েছে ডেলী টেলিগ্রাফ:

লণ্ডন থেকে সুয়েজ (মণ্টসেনিস আর ব্রিন্দিসিব ওপর দিয়ে রেল আর স্টীমারে)	...	৭ দিন
সুয়েজ থেকে বোম্বাই (স্টীমারে)	...	১৩ "
বোম্বাই থেকে কলকাতা (রেলে)	...	৩ "
কলকাতা থেকে হংকং (স্টীমারে)	...	১৩ "
হংকং থেকে জাপানের ইয়োকোহামা (স্টীমারে)	...	৬ "
ইয়োকোহামা থেকে সানফ্রান্সিসকো (স্টীমারে)	...	২২ "
সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউইয়র্ক (রেলে)	...	৭ "
নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন (স্টীমার আর রেলে)	...	৯ "
		মোট ৮০ দিন

"আশি দিন!" উত্তেজিত হয়ে ভুল তাস ফেলে বললেন স্টুয়ার্ট। "কিন্তু হিসেবের মধ্যে ঝড়-বাদলা, প্রতিকূল হাওয়া, জাহাজডুবি, রেল অ্যাকসিডেন্ট এবং আরও অনেক বিপদআপদ কি ধরা হয়েছে?"

"সব ধরা হয়েছে।" খেলায় তন্ময় হয়ে থেকেই টুক করে মন্তব্য করলেন ফিলিয়াস ফগ।

"কিন্তু ধরুন ভারতবর্ষ বা আমেরিকায় কেউ যদি ট্রেন থামিয়ে লুঠপাট করে?" বললেন স্টুয়ার্ট।

"সব ধরা হয়েছে," তাস নিক্ষেপ করে প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন ফগ—"দুখানা রঙ আমার হাতে। বাজী আমার।"

তাস কুড়িয়ে নিলেন স্টুয়ার্ট। বললেন—"মিস্টার ফগ, অংকের হিসেবে আপনি সঠিক হতে পারেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাবে বিলকুল বেঠিক।"

"বাস্তবক্ষেত্রেও সঠিক, মিস্টার স্টুয়ার্ট।"

"তাহলে দেখা যাক কিভাবে ৮০ দিনে ভূলোক ভ্রমণ করে আসুন।"

"সেটা নির্ভর করছে আপনার ওপর। কখন বেরোবেন বলুন?"

"আমি বেরোবো? রক্ষে করুন মশায়! তবে চার হাজার পাউণ্ড বাজী ধরতে রাজী আছি—৮০ দিনের অদ্ভুত পর্যটন একেবারেই অসম্ভব।"

"খুবই সম্ভব," মিস্টার ফগের ছোট্ট জবাব।

"বেশ তো, প্রমাণ করুন হাতেকলমে!

"৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ?"

"তাইতো বলছি!"

"খাসা প্রস্তাব—আমি রাজী।"

"কখন বেরোচ্ছেন?

"এখুনি। খরচটা কিন্তু আপনার।"

"যত্তোসব উদ্ভট ব্যাপার!" চেঁচিয়ে উঠলেন স্টুয়ার্ট। বন্ধুবরের একগুঁয়ে কথাবার্তায় মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল তাঁর।

"আসুন, আসুন, খেলায় মন দিন।"

"আপনি দিন," বললেন ফগ—"একটু আগেই ভুল তাস ফেলেছেন।"

কাঁপা আঙুলে তাসের প্যাকেট তুলে নিলেন স্টুয়ার্ট, পরক্ষণেই নামিয়ে রেখে বললেন—"মিস্টার ফগ, তাহলে ঐ কথাই রইল। চারহাজার পাউণ্ড বাজী ধরছি আমি।"

"ভায়া স্টুয়ার্ট," বিস্মিত কণ্ঠে বললেন সুলিভান। "মাথাটা ঠাণ্ডা করুন। ঠাট্টাতামাসার উপর কেউ বাজে ধরে না।"

"বাজী যখন ধরেছি, তখন আর পেছোচ্ছি না।"

"বেশ তো" ধীর গলায় বললেন ফগ। "বারিংয়ের গদীতে আমার নামে বিশহাজর পাউণ্ড জমা আছে। আমি তা বাজী রাখছি।"

"বিশহাজার পাউণ্ড!" হতভম্ব হয়ে গেলেন স্থলিভান। "সামান্য বিপত্তি দেখা দিলেই বিশহাজার পাউণ্ড হারাবেন আপনি!"

"হিসেবের বাইরে কিছুই ঘটতে পারে না," শান্তস্বরে জবাব দিলেন ফগ।

"কিন্তু ৮০ দিন তো খাতাকলমের সবচাইতে কম হিসেব।"

"কম হিসেবকেই যথাভাবে কাজে লাগলে কার্যসিদ্ধি সম্ভব বইকি।"

"কিন্তু অংকের হিসেবে ট্রেন থেকে স্টীমার, আর স্টীমার থেকে ট্রেনে যাতায়াতের সময় ধরা হয়নি। আপনি চক্ষের পলকে লাফ দিয়ে পৌছোবেন ট্রেন থেকে স্টীমারে?"

"হ্যাঁ, অংকের হিসেবে লাফ দিয়ে পৌঁছোবো।"

"আপনি তামাসা করছেন।"

"বাজীর মত সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে খাঁটি ইংরেজ কখনো তামাসা করেন না।" বিনীত স্বরে জবাব দিলেন ফগ। "৮০ দিন কি, তারও কমদিনে অথবা উনিশশো কুড়ি ঘণ্টায় অথবা এক লক্ষ পনেরো হাজার দুশ মিনিটে আমি পৃথ্বী-পর্যটন করে আসব। যদি কেউ বাজী ধরতে চান তো এগিয়ে আস্থন। আমার বাজীর পরিমাণ বিশহাজার পাউণ্ড। রাজী?"

"রাজী" নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিয়ে বললেন বন্ধুরা।

"ডোভার থেকে ট্রেন ছাড়ছে পৌনে নটায়," বললো ফগ। "আমি রওনা হচ্ছি ঐ ট্রেনে।"

"আজই?" শুধোলেন স্টুয়ার্ট।

"হ্যাঁ, আজই," পকেট থেকে পুঁচকে পাঁজি বার করলেন ফগ। পাতা উল্টে বললেন—"আজ বুধবার দোসরা অক্টোবর। এই ঘরে আমাকে ফের দেখবেন একুশে ডিসেম্বর শনিবার রাত পৌনে নটায়। যদি না পারি, বারিং গদীর বিশহাজার পাউণ্ড আপনাদের ভোগে লাগবে। এই নিন চেক।"

তৎক্ষণাৎ সর্তাবলী লিখে কাগজপত্রে সই করলেন ছজনে। পাকাপোক্ত হল বাজী ধরা। যতক্ষণ না তা শেষ হল, অবিচল মূর্তিতে বসে রইলেন ফিলিয়াস ফগ। অথচ এই একটি বাজীর পেছনে উনি ওঁর সর্বস্ব পণ ধরলেন। বিশ হাজার পাউণ্ড তো বারিং এর গদীতে আছে। ব্যাঙ্কে আছে আরও বিশ হাজার—সে টাকা যাবে পথ খরচায়। যদি হারেন, উনি পথে বসবেন। কিন্তু কী কঠিন ধাত ভদ্রলোকের—চোখের পাতা একটুও কাঁপল না সর্বস্ব দিয়ে একটা হিসেবকে সত্যি প্রমাণ করার জন্যে। বাজী জেতার ওঁর আগ্রহ ছিল না—উনি চাই ছিলেন ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ যে সম্ভব তা দেখিয়ে দেবেন শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও।

ঘড়িতে সাতটা বাজল। বন্ধুরা খেলা বন্ধ করতে চাইলেন। ফগকে বিদেশ যাত্রার জন্যে তৈরী হতে হবে তো!

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু নির্বিকার। প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন—"আমি তৈরীই আছি। রুইতন তুরুপ রইল, মন দিয়ে খেলুন মশাইরা!"

৪ ॥ পাস্‌পার্তুর আক্কেল গুড়ুম হল

তাসের জুয়োয় বিশ গিনি জিতলেন ফিলিয়াস ফগ। টাকাটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালেন সাতটা পঁচিশ মিনিটে। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়।

দৈনিক কাযতালিকা বার বার পড়ে মুখস্ত করে ফেলেছিল পাস্‌পার্তু। তাই অসময়ে মনিবকে বাড়ী ফিরতে দেখে বিলক্ষণ হকচকিয়ে গেল। রাত বারোটার আগে তো ফেরার কথা নয়?

শোবার ঘরে ডাক দিলেন ফিলিয়াস ফগ—"পাস্‌পার্তু!"

পাস্‌পার্তু সাড়া দিল না। কেন দেবে? এ সময়ে তো তাকে ডাকবার কথা নয়? নিশ্চয় অন্য কাউকে ডাকা হয়েছে।

"পাস্‌পার্তু!", ফের ডাকলেন ফগ—গলা না চড়িয়ে।

ঘরে ঢুকল পাস্‌পার্তু।

"দুবার ডাকতে হয়েছে তোমায়।" বললেন ফগ।

'কিন্তু এখন তো রাত দুপুর নয়!" ঘড়ি দেখে বলল পাস্‌পার্তু।

"জানি। তোমার দোষ নেই। দশ মিনিটের মধ্যে ডোভার আর ক্যালেইস রওনা হচ্ছি আমরা।"

ভড়কে গিয়ে বোকার মত হাসল পাস্‌পার্তু। নতুন মনিবকে চিনতে ভুল হয়েছে দেখছি!

"মঁসিয়ে কি বাড়ী ছেড়ে বেরোবেন?"

"হ্যাঁ। ভূ-প্রদক্ষিণ করতে বেরোবো।"

চোখ বড় করে, ভুরু তুলে এমন কাঠ হয়ে দাঁড়াল বেচারী পাস্‌পার্তু যেন এখুনি ভিরমি যাবে। আক্কেল গুড়ুম আর কাকে বলে!

"ভূ-প্রদক্ষিণ!"

"৮০ দিনে। তাই আর সময় নেই।"

"কিন্তু ট্রাঙ্ক......"

"দরকার নেই। শুধু একটা কার্পেট ব্যাগ হলেই চলবে। সঙ্গে নেবে

আমার জন্যে দুটো শার্ট, তিনজোড়া মোজা—তোমার জন্যেও তাই। দরকার মত জিনিস রাস্তায় কিনে নেব। আমার বর্ষাতি আর ট্র্যাভেল-কোট নেবে। যদিও বেশী হাঁটব না, মজবুত জুতো কয়েক জোড়া নেবে। জলদি!”

জবাব দিতে গিয়েও পারল না পাসপার্তু। তড়বড় করে নিজের ঘরে ফিরে ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারে। যাচ্চলে! কপালে শেষে এই ছিল? শান্তির সন্ধানে এসে একী ঝামেলা?

কলের পুতুলের মত যাত্রার যোগাড় যন্ত্রর করে চলল পাসপার্তু। আশি দিনে ভূলোক ভ্রমণ! মনিব কি পাগল? না। তামাসা? ডোভার বা ক্যালেইস যেতে তো আপত্তি নেই পাঁচ বছর পর কে না দেশে ফিরতে চায়— পাসপার্তু তাতে রাজী। তারপর হয়ত প্যারিসটাও আর একবার দুচোখ ভরে দেখে নেওয়া যাবে। কিন্তু প্যারিসে কি ইনি থামবেন? মনে তো হয় না!

আটটার সময়ে কার্পেট ব্যাগে জামাকাপড় পুরে নেমে এল পাসপার্তু। এসে দেখল, মিস্টার ফগ ফিটফাট তৈরী। বগলে ব্র্যাডশ'র টাইম টেবল— স্টীমার আর রেলের যাত্রা এবং আগমনের সময় লেখা তাতে। কার্পেট ব্যাগ খুলে বেশ কয়েক তাড়া নোট ঠেসে দিলেন তার মধ্যে।

“কিচ্ছু ভুল হয় নি?” শুধোলেন ফগ।

“আজ্ঞে না।”

“আমার বর্ষাতি আর ট্র্যাভেল-কোট?”

“এই তো রয়েছে।”

“ভাল। কার্পেট ব্যাগটা তোমার কাছে রাখো। সাবধানে রাখবে। এতে বিশ হাজার পাউণ্ড আছে।”

ব্যাগটা আর একটু হলে হাত থেকে পড়ে যেত। বিশ হাজার পাউণ্ডকে নিরেট সোনার তালের মতই ভারী মনে হল পাসপার্তুর কাছে।

নীচে নেমে এল মনিব এবং ভৃত্য। দুটো তালা লাগানো হল সদর দরজায়। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে পৌঁছোলেন রেলস্টেশনে। তখন আটটা কুড়ি। ভাড়া মিটোচ্ছেন ফগ, এমন সময়ে একজন ভিখারি মেয়ে কোলে একটি বাচ্চা নিয়ে হাত পাতল সামনে।

ফিলিয়াস ফগ পকেট থেকে জুয়োয় জেতা কুড়ি গিনি বার করে তুলে দিলেন ভিখারিণীর হাতে।

বললেন—“নাও। সুখী হও।” বলে, এগিয়ে গেলেন সামনে।

তাজ্জব হয়ে গেল পাসপার্তু। এত দরাজ মন মনিবের?

ঝট করে কেনা হল প্যারিসের দুটো ফার্স্ট ক্লাশ টিকিট। ট্রেনের দিকে এগোতে গিয়ে পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে চোখোচোখি হল ফগের।

উনি বললেন—"দেখতেই পাচ্ছেন আমি রওনা হচ্ছি। ফিরে আসার পর পাশপোর্টগুলো যাচাই করলেই বুঝবেন আমি কোথায়-কোথায় গিয়েছি।"

"তার দরকার হবে না, মিস্টার ফগ।" নরম গলায় বললেন র‍্যালফ। "আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট।"

"লণ্ডনে ফিরতে হবে কবে মনে আছে তো?" স্টুয়ার্ট শুধোলেন।

"আশি দিন পরে। ১৮৭২ সালের একুশে ডিসেম্বর শনিবার রাত পৌনে নটায়। বিদায়, বন্ধু!"

আটটা চল্লিশে ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় আসন গ্রহণ করলেন ফগ এবং তাঁর ভৃত্য। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে বাঁশি বাজিয়ে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল ট্রেন।

রাত হয়েছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। এককোনে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন ফগ। হতভম্ব অবস্থাটা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি পাস্‌পার্তু। তাই যন্ত্রচালিতের মত কুবের সম্পদ সমেত কার্পেটব্যাগ আঁকড়ে বসে আছে পুতুলের মত।

আচম্বিতে "এই যাঃ" বলে ভীষণ চেচিয়ে উঠল সে।

"কি হল?" শুধোলেন ফগ।

"তাড়াতাড়ি আমার ঘরে গ্যাসের চাবি ঘুরোতে ভুলে গেছি। গ্যাস বাতিটা জ্বলছে!"

"জ্বলুক," ঠাণ্ডা গলা ফগ সাহেবের। "ফিরে গিয়ে গ্যাসের টাকা তুমি মিটোবে।"

৫॥ শেয়ার মার্কেটে নতুন চাঞ্চল্য

একটা জিনিস ঠিকই আঁচ করেছিলেন ফিলিয়াস ফগ। উনি জানতেন লণ্ডন থেকে ওঁর হঠাৎ বেরিয়ে পড়া নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ পড়বে দেশ জুড়ে।

হলও তাই। বাজী ধরার বৃত্তান্ত দাবানলের মত ছড়িয়ে গেল সারা রিফর্ম ক্লাবে। সদস্যরা ভীষণ উত্তেজিত হলেন ফিলিয়াস ফগের বুকের পাটা দেখে। খবরটা ক্লাব থেকে পৌছোলো খবরের কাগজে। সারা ইংলণ্ড জানল দাম্ভিক ধনকুবেরের বাজী ধরার আশ্চর্য কাহিনী। পৃথিবী প্রদক্ষিণ আদৌ সম্ভব কিনা, এই নিয়ে বাদানুবাদের ঝড় বয়ে গেল দেশ জুড়ে। তার্কিকরা

রাশিরাশি যুক্তি প্রমাণ হাজির করে প্রমাণ করতে চাইল ৮০ দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কোন মতেই সম্ভব না। কিছু লোক সমর্থন করল ফিলিয়াস ফগকে। খবরের কাগজগুলো দুভাগ হয়ে গেল। ফিলিয়াস ফগ বাজী হারবেন—এই কথা বলল টাইমস, স্ট্যানডাড, মনিং পোস্ট, আর ডেলী নিউজ। তাদের মতে ফগ নাকি ডাহা পাগল। শুধু ডেলী টেলীগ্রাফ আমতা আমতা করে বললে, না, না, এ বাজী জেতা সম্ভব। জনগণ কিন্তু ফগকে উন্মাদ বলেই ধরে নিল এবং বিফর্ম ক্লাবের পিণ্ডি চটকাতে লাগল পাগলেব পাগলামির সুযোগ নিয়ে তাঁকে পথে বসানোব চক্রান্ত করার জন্যে।

যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ ছাডাও প্রকাশ পেল গাদা গাদা আবেগবহুল নিবন্ধ। ভূগোল শাস্ত্রটা ইংবেজদের বড প্রিয়। সুতবাং ভূ গোলক-ভ্রমণ নিয়ে সরস প্রবন্ধগুলো গোগ্রাসে গিলতে লাগল পাঠকবা। প্রথমে পডল মেয়েরা। তাবপর সচিত্র লণ্ডন নিউজে ফিলিযাস ফগেব ছবি ছাপবাব পব কেউ আব তা পডতে বাকী বাখল না।

তারপর একটা বুলেটিন বাব কবল বযাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি। সাতুই অক্টোবরে প্রকাশিত সেই জরুবী ইস্তাহাব পডবাব পব আব কোনো সন্দেহই বইল না যে ফিলিয়াস ফগ একটা অসম্ভবেব পেছনে দৌডেছেন এবং বাজীব টাকা তিনি হাববেন। নেহাত উজবুক ছাডা এ অভিযানে কেউ বেবোয় ?

বুলেটিনে বলা হল, ৮০ দিনে ভূ প্রদক্ষিণেব পথে অন্তবায হবে যুগপৎ মানুষ এবং প্রকৃতি। নির্দিষ্ট সময়ে অমুক জায়গায় পৌছোনো এবং নির্দিষ্ট সময়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পডা দৈব সহায না হলে সম্ভব নয়। ইউবোপে ঠিক সময়ে ট্রেন ধরা সম্ভব, কেননা সেখানে এক জায়গা থেকে আবেক জাযগার দূবত্ব এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ আব আমেবিকাব মত বিবাট দেশ দুটি যথাক্রমে তিন দিনে এবং সাত দিনে পেরোনো কি সম্ভব ? মেশিন বিগডোতে পাবে, ট্রেন লাইনচ্যুত হতে পাবে, ট্রেনে-ট্রেনে ধাক্কা লাগতে পারে, ঝডবাদলায় যাত্রা ভণ্ডুল হতে পাবে, ববফ পডে রাস্তা বন্ধ হতে পারে। শীতকালে স্টীমারে চডলে হাওয়াব দাপট আব কুয়াশাব বিপদ এডাতে পারবেন কি ফিলিয়াস ফগ ? সমুদ্রগামী সেরা কলের জাহাজও দু তিন দিন দেরীতে পৌছোয় গন্তব্যস্থানে—সেক্ষেত্রে যদি একদিনও দেরী হয়, পুরো প্রোগ্রামটাই তো বানচাল হয়ে যাবে। একঘণ্টা দেরীতে পৌছোলেও স্টীমার ছেড়ে যাবে জাহাজঘাটা থেকে, মিস্টার ফগের বাজী জেতার স্বপ্নও আকাশ-কুসুমে পর্যবসিত হবে

প্রবন্ধটা দারুণ সোরগোলের সৃষ্টি করল দেশময়। ফিলিয়াস ফগের সমর্থকদের বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল। মুখ শুকিয়ে গেল তাঁদের। প্রবন্ধের নকল প্রকাশ পেল অন্যান্য কাগজে।

ইংলণ্ড দেশটা বাজীধরায় ওস্তাদ। এ-রকম একটা কি হয়-কি হয় ব্যাপার নিয়ে তাই মোটা মোটা বাজীধরা শুরু হল প্রথমে রিকর্মক্লাবের সভ্যদের মধ্যে। তারপর জনসাধারণের মধ্যেও বাজীধরার হিড়িক উঠল। ফিলিয়াস ফগ যেন একটা রেসের ঘোড়া। তিনি হারবেন কি জিতবেন—এই নিয়ে দু পক্ষে পড়ল মোটা পণের বাজী। শেষকালে এমন হল যে শেয়ার মার্কেটে আমদানী হল নতুন ধরনের এক জাতের শেয়ার। 'ফিলিয়াস ফগ শেয়ার'—এই নামের কোম্পানীর কাগজ চড়া দামে বিকোতে লাগল শেয়ার মার্কেটে। চূড়ান্ত ফাটকা বাজি শুরু হয়ে গেল ফিলিয়াস ফগের বাজীর পণ নিয়ে।

কিন্তু রয়াল ভৌগোলিক সমিতির সারগর্ভ নিবন্ধ প্রকাশ পাওয়ার পাঁচদিন পর থেকে মন্দা দেখা দিল ফাটকাবাজিতে। দর পড়তে লাগল ফিলিয়াস ফগ শেয়ারের উচ্চপণে বাজীধরার সাহসও আর রইল না কারু।

লর্ড অ্যালবিমারলির বয়স হয়েছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় চেয়ারবন্দী হয়েও তিনি ফিলিয়াস ফগকে মদৎ জুগিয়েছিলেন। ভৌগোলিক সমিতির বুলেটিন বেরোবার পর ফগ সাহেবের সমর্থক রইলেন কেবল তিনিই। চেয়ারবন্দী থাকার জন্যে উনি ওঁর সর্বস্বর বিনিময়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। ৮০ দিন কেন, দশ বছর লাগলেও ক্ষতি ছিল না। ফিলিয়াস ফগের সমর্থনে তাই উনি বাজী ধরে ছিলেন পাঁচ হাজার পাউণ্ড। কিন্তু যখন শুনলেন ফগ মশায় দারুণ ঝুঁকি নিয়েছেন, তখন তিনি বললেন—"হারলেই বা, জানবো এ রকম একটা অসম্ভব অভিযানের প্রথম অভিযাত্রী হয়েছিলেন একজন ইংরেজ। সেটাই বা কম কী?"

এ-হেন পরিস্থিতিতে, ফগের সমর্থক সংখ্যা যখন নেই বললেই চলে, তখন একদিন রাত নটায় পুলিশ কমিশনারের হাতে এসে পৌঁছোলো নীচের টেলিগ্রামটা:

সুয়েজ থেকে লণ্ডন

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ কমিশনারের মিস্টার রোয়ানের উদ্দেশে:

"ব্যাঙ্ক-চোর ফিলিয়াস ফগের সন্ধান পেয়েছি। অবিলম্বে তাকে গ্রেফতারের পরোয়ানা বোম্বাইতে পাঠান।"

গোয়েন্দা "ফিক্স"

খবরটা যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্ত মধ্যে মার্জিতবেশ নির্জলা খাঁটি

মানুষটিকে সবাই জানল ভণ্ড চোর হিসেবে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! রিফর্ম ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ফিলিয়াস ফগের ছবিও শোভা পেত ক্লাবের দেওয়ালে। লোকে উৎসুক হয়ে সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখল পুলিশের দেওয়া চোরের বর্ণনা। সর্বনাশ! এ যে একই মানুষ! চোখ মুখ নাক কান—সবই তো মিলে যাচ্ছে! তখন সবার মনে পড়ল ফিলিয়াস ফগের রহস্যজনক জীবনধারা। ত্রি-সংসারে কারো সঙ্গে তাঁর মেলামেশা নেই। তারপর ভূগোল ভ্রমণের হুজুগ তুলে সটকান দেওয়া! উফ! কি ভয়ানক লোক! একটা অছিলা তুলে ব্যাঙ্কের টাকাটা নিয়ে গোয়েন্দাদের লবডঙ্কা দেখিয়ে গা-ঢাকা দিল লোকটা!

৬॥ অধীর হলেন গোয়েন্দা ফিক্স

ফিলিয়াস ফগ সম্পর্কিত টেলিগ্রাম পাঠানোর মূলে যে ঘটনা, এবার তা বলা যাক।

মঙ্গোলিয়া একটা কলের জাহাজ। পেনিনসুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েণ্টাল কোম্পানীর যে কটা জাহাজ আছে, তার মধ্যে সব চাইতে বেগবান। জাহাজটা লোহায় তৈরী। ওজন দু হাজার আটশ টন। ইঞ্জিনের শক্তি পাঁচশ হর্স-পাওয়ার। নউই অক্টোবর বুধবার সকাল এগারোটায় সুয়েজ বন্দরে পৌঁছোবে মঙ্গোলিয়া। সুয়েজখাল দিয়ে ব্রিন্দিসি আর বোম্বাইয়ের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করতে হয় জাহাজটিকে। গতিবেগ—ব্রিন্দিসি আর বোম্বাইয়ের মধ্যে ঘণ্টায় দশ নট, সুয়েজ আর বোম্বাইয়ের মধ্যে ঘণ্টায় সাড়ে নয় নট।

জেটির ওপর লোকে লোকারণ্য। এক সময়ে যা গাঁ ছিল, মঁসিয়ে লেসেপ্সের দৌলতে এখন তা বড় রকমের শহর হতে চলেছে। সুতরাং জাহাজঘাটায় পাঁচ মিশেলী লোকের ভীড় তো হবেই।

জেটির ওপর পায়চারী করছেন দুজন ইংরেজ। এঁদের একজন সুয়েজের বৃটিশ কনসাল। অপরজন বেঁটে খাটো রোগাটে। চোখের মধ্যে বুদ্ধির ধার আছে। নার্ভাস। ঘন ঘন ভুরু কাঁপছে স্নায়বিক উত্তেজনার জন্যে। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। ভদ্রলোক ভেতরে ভেতরে এত অধীর যে এক সেকেণ্ডও চুপ করে দাঁড়াতে পারছেন না কোথাও।

ইনিই গোয়েন্দা ফিক্স। ইংলণ্ড থেকে এসেছেন নোট-চোরকে পাকড়াও করতে। এঁর কাজ হল পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাওয়া চোরের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুয়েজে আবির্ভূত প্রত্যেকের চেহারা মিলিয়ে দেখা। ব্যাঙ্ক

কর্তৃপক্ষ ঘোষিত মোটা অংকের পুরস্কারের লোভে এত উৎসাহিত হয়েছেন ফিক্স। কলের জাহাজ মঙ্গোলিয়ার পথ চেয়ে তাই তিনি অধীরভাবে পায়চারী করছেন জেটিতে।

এই নিয়ে বিংশতিবার একই প্রশ্ন বর্ষণ করলেন ফিক্স বৃটিশ কনসালের উদ্দেশে—"আপনি তাহলে বলছেন মঙ্গোলিয়া কখনো দেরীতে আসে না?"

"না, মশাই না," জবাব দিলেন কনসাল। "মঙ্গোলিয়া সৈয়দ বন্দর ছেড়েছে গতকাল। বাকী পথটুকু তার কাছে কিছুই নয়। কোম্পানীর হিসেব মত যে সময়ে আসার কথা, মঙ্গোলিয়া প্রতিবারই তার আগে পৌছোয়। বাড়তি স্পীডের জন্যে পুরস্কারও পেয়েছে।"

"ব্রিন্দিসি থেকে সোজা আসছে না কি?"

"হ্যাঁ। ভারতবর্ষের ডাক ব্রিন্দিসিতে জাহাজে ওঠে। জাহাজ ছেড়েছে শনিবার বিকাল পাঁচটায়। ধৈর্য ধরুন, মিস্টার ফিক্স, মঙ্গোলিয়া এই এল বলে। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না, এত লোকের মধ্যে থেকে শুধু চেহারা মিলিয়ে ব্যাঙ্ক-চোরকে ধরবেন কি করে।"

"সব সময়ে কি আর চেহারা দেখে মানুষ চেনা যায়? ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে চিনতে হয়। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলে যেমন চেনা যায়, এও তেমনি। কতজনকে ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়লাম এই ভাবে। মূর্তিমান যদি জাহাজে থাকে, তাহলে জানবেন আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না।"

"না দিলেই ভাল। এত বড় একটা চুরির কিনারা না হলে ঢি-ঢি পড়ে যাবে যে!"

"চুরির মত চুরী বলুন! জমকালো চুরি! এরকম জাঁদরেল চোর আজকাল দেখাই যায় না। ছিঁচকে চোর ছাড়া বরাতে কিছু জোটেও না। এক মুঠো শিলিং সাফাইয়ের জন্যে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতেও রাজী বেটারা!"

"আপনার কথা শুনে খুশী হলাম মিস্টার ফিক্স। আরো খুশী হব আপনি চোরকে গ্রেপ্তার করতে পারলে। কিন্তু কি জানেন, খুব একটা ভরসা পাচ্ছি না আমি। আপনার কাছে চোরের যে বর্ণনা দেখছি, এতো মশায় সাধুসজ্জনের বর্ণনা!"

"ডাকসাইটে চোরেরা সাধুর ছদ্মবেশেই থাকে, নইলে পদে পদে ধরা পড়তে হত। সাধুর মুখোশধারী শয়তানের মুখোশ খসানোই হল সত্যিকারের আর্ট। কাজটা কঠিন কনসাল, কিন্তু উঁচুদরের শিল্প।"

জেটির ওপর ক্রমশঃ ভীড় বাড়ছে। কথার মধ্যেও কাজে ফাঁকি নেই ফিক্সের। নতুন পথচারী দেখলেই তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছেন তার মুখাবয়ব।

দূরে নগর মধ্যস্থ গম্বুজের চূড়া ঝকঝক করছে চড়া রোদে। জেলেদের নৌকো ভাসছে লোহিত সাগরে। ঘড়িতে তখন বাজে সাড়ে দশটা।

"জাহাজ আর এল না বোধহয়!" অস্থির কণ্ঠ ফিক্সের।

"জাহাজ আর বেশী দূরে নেই," বললেন কনসাল।

"সুয়েজে দাঁড়ায় কতক্ষণ?"

"চার ঘণ্টা। কয়লা নেবার পক্ষে চার ঘণ্টাই যথেষ্ট। সুয়েজ থেকে এডেন বন্দর ১৩১০ মাইল। তাই কয়লার দরকার হয়।"

"সুয়েজ থেকে বরাবর বোম্বাই যাবে?"

"হ্যাঁ। কোথাও আর দাঁড়াবে না।"

"তাহলে, মঙ্গোলিয়ায় যদি চোর মহাপ্রভু থাকে, তাহলে সে সুয়েজেই নেমে পড়বে। এখান থেকেই ফরাসী কি ওলন্দাজদের কোনো উপনিবেশে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করবে। কেননা সে জানে, ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজত্বে একঘণ্টাও নিরাপদে থাকতে পারবে না।"

কনসাল বললেন—"ইংরেজ অপরাধীরা কিন্তু লণ্ডনেই ভাল ঘাপটি মারতে পারে—বাইরে বেরোনো তাদের পক্ষে বিপজ্জনক—নয় কি?"

কথাটা প্রণিধানযোগ্য। মহাচিন্তায় পড়লেন ফিক্স। সেই ফাঁকে অফিসে ফিরে গেলেন কনসাল। অফিস জাহাজ ঘাটায় কাছেই—জানলায় বসেই জাহাজ আনাগোনা দেখা যায়।

ফিক্সের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল অকস্মাৎ ঘন ঘন বংশী ধ্বনিতে। মঙ্গোলিয়া আসছে।

কুলিরা তৎক্ষণাৎ দৌড়োলো জেটির দিকে। ডজন খানেক নৌকো রওনা হল জাহাজের দিকে। ঠিক এগারোটার সময়ে ঘর্ঘর শব্দে নোঙর ফেলল মঙ্গোলিয়া।

জাহাজ ভর্তি যাত্রীদের কিছু লোক নৌকোয় চেপে জেটি এলেন। অনেকে ডেকে দাঁড়িয়ে চারদিকের নয়ন মনোহর দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

ফিক্স হুঁশিয়ার হলেন। জেটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মুখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। এই সময়ে একজন যাত্রী গায়ের জোরে ভীড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। বিনীত ভাবে ফিক্সকে জিজ্ঞেস করল ইংরেজ কনসাল কোথায় থাকেন। কথা বলতে বলতে একটা পাশ পোর্ট দেখাল লোকটা— ভিসা করতে হবে। অর্থাৎ ছাড় পত্রে কনসালকে দিয়ে সই করিয়ে নেবে।

পাশ পোর্ট হাতে নিলেন ফিক্স। যাঁর নামে পাশ পোর্ট, তাঁর চেহারার বর্ণনায় চোখ বুলিয়ে নিলেন দ্রুত। বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল চুল থেকে পায়ের

নখ পর্যন্ত। কেননা, বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড প্রেরিত চোরের বর্ণনার সঙ্গে।

"পাশপোর্টটা তোমার?" শুধোলেন ফিক্স।

"না, আমার মনিবের।"

"কে তোমার মনিব?"

"ডেকে রয়েছেন।"

"কিন্তু কনসালের কাছে উনি নিজে না গেলে কনসাল তাঁকে সনাক্ত করবেন কি করে?"

"যাওয়ার কি দরকার আছে?"

"না গেলে ভিসা হবে না। পাশ পোর্টে দস্তখৎ পড়বে না।"

"কনসাল কোথায় বসেন?"

"ঐ মোড়ের বাড়ীতে।"

"তাহলে যাই, কর্তাকে ডেকে আনি গে। আসবার নাম শুনলে উনি ব্যাজার হবেন যদিও, কিন্তু কি আর করা যায়।"

ফিক্সকে অভিবাদন জানিয়ে আগন্তুক জাহাজে ফিরে গেল।

৭॥ পাশপোর্ট পেলে গোয়েন্দাদের সুবিধে

জেটি থেকে জ্যামুক্ত তীরের বেগে উধাও হলেন ফিক্স। পাঁই পাঁই করে হাজির হলেন কনসালের সামনে তাঁর অফিস কক্ষে।

গৌরচন্দ্রিকার ধার দিয়েও গেলেন না ফিক্স। ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন—"কনসাল, মঙ্গোলিয়া জাহাজে ব্যাঙ্ক-চোর রয়েছে।" বলে এইমাত্র পাশপোর্ট নিয়ে যা ঘটল, তা নিবেদন করলেন তাঁকে।

কনসাল বললেন—"রাস্কেলের মুখ দেখতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু লোকটা যদি সত্যিই ব্যাঙ্ক-চোর হয়, তাহলে সে এখানে আসবে না। চোর-ডাকাতরা চম্পট দেওয়ার সময়ে নিশানা রেখে যায় না যাওয়ার পথে। তাছাড়া, পাশপোর্টে আমার সই না হলেও তার আটকাবে না।"

"কনসাল, যদি সে সত্যিই ধুরন্ধর হয়, তাহলে আসবেই।"

"ছাড় পত্রে আমার সই নেওয়ার জন্যে?"

"হ্যাঁ। কেননা, ছাড়পত্র জিনিসটা চিরকাল সজ্জনদের মেজাজ খিঁচড়ে দেয়, কিন্তু অসাধু বদমাসদের উধাও হওয়ার পথ পরিষ্কার করে দেয়। সুতরাং পথ নিষ্কণ্টক করার জন্যেই সে আসবে। আশা করি, পাশপোর্টে আপনি সই দেবেন না।"

"কেন দেব না? পাশপোর্ট নকল না হলে সই না দেওয়ার কোনো অধিকার নেই আমার।"

"না থাকলেও ওকে আমি এখানে আটকে রাখতে চাই লণ্ডন থেকে গ্রেপ্তারের শমন না পাওয়া পর্যন্ত।"

"সেটা আপনার ব্যাপার। আমি—"

কনসাল কথাটা শেষ করতে পারলেন না। দরজায় টোকা পড়ল। ঘরে ঢুকলেন দুজন আগন্তুক। একজনকে ফিক্স জেটিতে দেখেছেন। অপর জন তার মনিব। শেষোক্ত ভদ্রলোক পাশপোর্ট এগিয়ে দিলেন। কনসালকে অনুরোধ করলেন দয়া করে ছাড়পত্রে তাঁর সই দিতে। কনসাল পাশপোর্টের আদ্যপান্ত মন দিয়ে পড়লেন। আর সেই সময়ে গোয়েন্দা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে যেন দুচোখ দিয়ে গিলে খেতে লাগলেন আগন্তুককে।

"আপনিই মিস্টার ফিলিয়াস ফগ?" পাশপোর্ট পড়া শেষ হলে শুধোলেন কনসাল।

"হ্যাঁ।"

"এই লোকটি আপনার ভৃত্য?"

"হ্যাঁ। ফরাসী। নাম, পাসপার্তু।"

"আপনি লণ্ডন থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"যাচ্ছেন—"

"বোম্বাই।"

"বেশ, বেশ। আপনি তো জানেন ভিসার দরকার নেই, পাশপোর্টও নিষ্প্রয়োজন?"

"জানি। কিন্তু আপনার ভিসা দিয়ে প্রমাণ করতে চাই যে আমি সুয়েজের ভেতর দিয়ে গিয়েছি।"

"বেশ, বেশ।"

পাশপোর্টে সই করে, তারিখ দিয়ে শীলমোহর বসিয়ে দিলেন কনসাল। রীতিমাফিক পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিলেন মিস্টার ফগ। মাথা হেলিয়ে নীরস অভিবাদন জানালেন এবং চাকরকে পেছনে নিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

"কি বুঝলেন?" গোয়েন্দা প্রশ্ন করলেন।

"বুঝলাম যে ভদ্রলোক ষোল আনা খাঁটি।"

"হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন তো সেটা নয়। চোরের যে বর্ণনা আমার

হাতে এসেছে, তার প্রতিটি অক্ষরের সঙ্গে এই ব্যক্তির চেহারা মিলে যাচ্ছে। নিশ্চয় তা লক্ষ্য করেছেন?"

"করেছি। কিন্তু সব চেহারাই-"

"সেটা যাচাই করব সহজেই। চাকরটা মনিবের মত অত রহস্যজনক মনে হল না। তাছাড়া জাতে ফরাসী যখন, পেট আলগা হবেই। কনসাল, তাহলে চললাম।"

পাসেপার্তুর খোঁজে নিমেষে উধাও হলেন ফিক্স।

ফিলিয়াস ফগ ততক্ষণে মঙ্গোলিয়ায় নিজের কেবিনে ফিরে এসেছেন। রোজনামচা বার করে দিনের হিসেব মিলোচ্ছেন:

"লণ্ডন ত্যাগ, বুধবার, দোসরা অক্টোবর, রাত পৌণে নটা।

"প্যারিস আগমন, বেস্পতিবার, তেসরা অক্টোবর, সকাল ৭টা ২০ মিনিট।"

"প্যারিস ত্যাগ, বেস্পতিবার, সকাল ৮টা ৪০ মিনিট।

"তুরীন্ আগমন (মণ্টে সিনেইয়ের পথে), শুক্রবার চৌঠা অক্টোবর, ভোর ৬টা ৩৫ মিনিট।

"তুরীন্ ত্যাগ, শুক্রবার, সকাল ৭টা ২০ মিনিট।

"ব্রিন্দিসি আগমন, শনিবার, পাঁচুই অক্টোবর, বিকেল ৪টা।

"মঙ্গোলিয়া জাহাজে জলযাত্রা, শনিবার, বিকেল ৫টা।

"সুয়েজ আগমন, বুধবার, নউই অক্টোবর, বেলা এগারোটা।

"মোট ১৫৮½ ঘণ্টা; অথবা সাড়ে ছদিন।"

তারিখগুলো বসানো হয়েছে দু'স্তম্ভে সাজানো মোট যাত্রাসূচীর পাশে। যাত্রাসূচীতে খুঁটিয়ে লেখা আছে কোন মাসের কত তারিখে ঠিক কোন সময়ে প্রধান-প্রধান স্থান, যথা, প্যারিস, ব্রিন্দিসি, সুয়েজ, বোম্বাই, কলকাতা সিঙ্গাপুর, হংকং, ইয়োকোহামা, সানফ্রানসিসকো, নিউইয়র্ক, লণ্ডন পৌছোতে হবে দোসরা অক্টোবর থেকে একুশে ডিসেম্বরের মধ্যে। যাত্রা পথে দুর্ঘট উপস্থিত হলে যদি দেরী হয়, অথবা ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে যদি আগে পৌছোনো যায়, তাহলে সময়ের সেই লাভ লোকসানের হিসেব লেখারও জায়গা আছে প্রতিটি শহরের পাশে। চুলচেরা হিসেব রাখার ফলে ফিলিয়াস ফগ প্রতি মুহূর্তে জানছেন তিনি নির্দিষ্ট সময়ের আগে চলেছেন কি পেছিয়ে গেছেন। সেইদিন, অর্থাৎ বুধবার নউই অক্টোবর, সুয়েজ আগমনের সময়টা রোজনামচায় লিখে নিয়ে উনি মিলিয়ে দেখলেন তখনো পর্যন্ত একটা মিনিটও আগে পিছে যাচ্ছেন না। সুতরাং কেবিনে বসে প্রশান্ত চিত্তে উনি প্রাতরাশ খেতে শুরু করলেন। অন্যান্য ইংরেজদের মত নতুন জায়গা দেখবার জন্যে শহরে ছুটলেন না।

৮॥ পাস্‌পাতু বেশী কথা বলে ফেলল

মনিব শহর দেখতে লালায়িত নয় বলে ভৃত্য দেখবে না, এমন তো হতে পারে না। সুতরাং পাসপার্তু জেটিতে দাঁড়িয়েছিল। অবাক চোখে দেখছিল নতুন জায়গার দৃশ্য।

এমন সময়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন গোয়েন্দা ফিক্স—"কি খবর, পাসপোর্টে সই হল?"

"মঁসিয়ে, আপনি? অনেক ধন্যবাদ। ছাড়পত্র ঠিক আছে।"

"আশপাশের শোভা দেখছ মনে হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আমরা এত বেগে দেশে দেশে ঘুরছি যেন গোটা ব্যাপারটাই স্বপ্ন ঠেকছে। এরই নাম তাহলে সুয়েজ?"

"হ্যাঁ।"

"মিশরে?"

"মিশরে তো বটেই।"

"আফ্রিকার মধ্যে?"

"হ্যাঁ হে হ্যাঁ, আফ্রিকা।"

"আফ্রিকা!" পাস্‌পার্তু কাকাতুয়ার মত আউড়ে গেল নামটা। "কি কাণ্ড দেখুন। আমি তো ভেবেছিলাম প্যারিস পর্যন্ত দৌড় হবে আমাদের। কিন্তু প্যারিসে যা কিছু দেখলাম সাতটা বিশ থেকে নটা বাজতে বিশ মিনিটের মধ্যে তাও এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশন যাওয়ার সময়ে বাদলা দিনে চলন্ত গাড়ীর জানলা দিয়ে!"

"খুব তাড়া আছে মনে হচ্ছে তোমাদের?"

"আমার নেই—যত তাড়া আমার মনিবের। ভাল কথা, আমার কিছু সার্ট আর জুতো কিনতে হবে। তাড়াহুড়োতে ট্রাঙ্ক নেবারও সময় পাইনি। শুধু একটা কার্পেট ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।"

"আমার সঙ্গে চলো, ভালো দোকান দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"আপনার অসীম দয়া।"

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দুজনে। পাস্‌পার্তুর মুখে যেন কথার খই ফুটতে লাগল।

বলল—"দেখবেন, জাহাজটা যেন ধরতে পারি।"

"অনেক সময় আছে। এখন তো সবে বারোটা।"

প্রকাণ্ড ঘড়িটা বার করল পাস্‌পার্তু।

"বারোটা! কি যে বলেন। দশটা বাজতে এখনো আট মিনিট বাকী।"

"তোমার ঘড়ি স্লো চলছে।"

আমার ঘড়ি স্লো! মঁসিয়ে এ-ঘড়ি আমরা বংশপরম্পরায় ব্যবহার করে আসছি সেই ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার আমল থেকে। বছরে পাঁচ মিনিটও ভুল সময় দেয়নি আজ পর্যন্ত। খাঁটি ক্রোনোমিটার বলতে পারেন।"

ফিক্স বললেন -"ব্যাপার তা নয়। তোমার ঘড়িতে লণ্ডনের সময় চলছে। সুয়েজ থেকে লণ্ডন সময় দুঘণ্টা পেছিয়ে থাকে সব সময়ে। নতুন নতুন দেশে পৌছেই বেলা বারোটার সময়ে তোমার কাঁটা ঘুরিয়ে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া উচিত।"

"কাঁটা ঘোরাবো? জীবনেও না!"

"তাহলে তো সূর্যের সঙ্গে ঘড়ি মিলবে না।"

"না মিলুক। সূর্যই ভুল চলবে তখন!"

বলে, যেন সূর্যকেও ট্যাঁকে গুঁজে রাখি, এইরকম একটা ভাব দেখিয়ে ঘড়িটা ট্যাঁকে গুঁজল, মানে, পকেটে রাখল পাস্‌পার্তু।

মিনিট কয়েক চুপচাপ। তারপর শুধোলেন ফিক্স:

"লণ্ডন থেকে খুব তাড়াতাড়ি বেরোতে হয়েছে বুঝি?"

"তাড়াতাড়ি বলে তাড়াতাড়ি! গত বুধবার রাত আটটায় ধাঁ করে ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরলেন মঁসিয়ে ফগ। তার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে দরজায় তালা ঝুলিয়ে রওনা হলাম আমরা।

"কোথায় চলেছেন তোমার মনিব?"

"নাকের সিধে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছেন উনি।"

"পৃথিবী প্রদক্ষিণ?" চেঁচিয়ে উঠলেন ফিক্স।

"তাও মাত্র ৮০ দিনে! বাজী ধরে বেরিয়েছেন নাকি। কিন্তু শুধু আপনাকেই বলে রাখি, একবর্ণও বিশ্বাস করি না আমি। সাধারণ বুদ্ধি যার আছে, এতটা আহাম্মুকি সে করবে না। আমার বিশ্বাস ওঁর পেটে অন্য ফন্দী ঘুরছে।"

"বলো কি হে! তোমার মনিবটি তাহলে সৃষ্টি ছাড়া মানুষ, তাই কিনা?"

"সৃষ্টি ছাড়া বলে সৃষ্টি ছাড়া।"

"খুব বড়লোক বুঝি?"

"তা আর বলতে। সঙ্গে স্তূপাকার আনকোরা নতুন ব্যাঙ্ক নোট নিয়ে

বেরিয়েছেন। টাকাও ওড়াচ্ছেন খোলাম কুচির মত। মঙ্গোলিয়ার ইঞ্জিনীয়ারকেই মোটা বখশিস দিয়েছেন নির্দিষ্ট সময়ের আগে বোম্বাই পৌঁছোনোর জন্যে।"

"মনিবের সঙ্গে নিশ্চয় ঘর করছো বহুদিন ?"

"আজ্ঞে না। আমি চাকরী নিলাম, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উনিও লণ্ডন ছাড়লেন।"

সন্দেহের বীজ যার মনের ভেতর আগে থেকেই শেকড় চালিয়ে বসেছিল, এই সব আলটপকা কথার পর তার উত্তেজনা সহজেই অনুমেয়। নোটচুরীর অব্যবহিত পরেই তড়ি ঘড়ি লণ্ডন ত্যাগ ; বিপুল অর্থ নিয়ে মিস্টার ফগের দেশ ভ্রমণ, দূর দেশে যাওয়ার আগ্রহ; নিরেট বোকার মত একটা বাজী ধরার অছিলা—সব কটা ব্যাপারই দৃঢ় করল ফিক্সের সন্দেহকে।

কাজেই কায়দা করে পাসপার্তুর পেট থেকে আরো কথা বার করে নিলেন ফিক্স। জানা গেল, মনিব সম্বন্ধে ভৃত্য বেচারী নিতান্ত অজ্ঞ, তবে মনিব মহোদয় নাকি টাকার কুমীর, সে-টাকা কোত্থেকে আসে তা কেউ জানেনা ; ত্রি সংসারে কারো সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই, তাঁর ধরন-ধারণ আচার-আচরণ সবই প্রহেলিকাবৎ !

ফিক্স বেশ বুঝলেন, সুয়েজে নামবার কোনো সদিচ্ছাই নেই ফিলিয়াস ফগের। ভদ্রলোক সোজা বোম্বাই যাবেন।

"বোম্বাই কি এখান থেকে অনেক দূর ?" শুধোলো পাসপার্তু।

"অনেক দূর। সমুদ্র পথে দশ দিন।"

"বোম্বাই কোন দেশের শহর ?"

"ভারতবর্ষের।"

"এশিয়ায় ?"

"আরে হ্যাঁ।"

"আরে গেল যা ! একটা ব্যাপার নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি। আমার বাতিটা—"

"কিসের বাতি ?"

"গ্যাস বাতি। নিভিয়ে আসতে ভুলে গেছি। এখনও তা জ্বলছে—আমার খরচে। হিসেব করে দেখেছি এক এক দিনে দু শিলিং জলে যাচ্ছে আমার। অর্থাৎ যা রোজগার—তার ছপেন্স বেশী খরচ হচ্ছে। তাহলেই দেখুন, যাত্রাপথ যত লম্বা, ততই—"

কিন্তু পাসপার্তুর গ্যাস নিয়ে ফিক্সের খুব মাথাব্যথা ছিল কী ? মোটেই

না। ফিক্সের কানেই ঢুকছিল না পাস্‌পার্তুর নাকে কাঁদুনি। মনে মনে ফিক্স তখন ফন্দী আঁটছেন। দোকান থেকে পাস্‌পার্তুকে জামা জুতো কিনিয়ে দিয়ে তিনি ঝটিতি ফিরে এলেন কনসালের কাছে।

বললেন—"কনসাল! আর সন্দেহ নেই। যার জন্যে ধর্ণা দেওয়া, তাকে পাওয়া গেছে। লোকটা ধাপ্পা মেরে বেড়াচ্ছে—সে নাকি ৮০ দিনে ভূলোক ভ্রমণ করতে বেরিয়েছে।"

"ভারী ধূর্ত লোক দেখছি," বললেন কনসাল। "দু'দুটো মহাদেশের পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে সে লণ্ডন ফিরতে চায়।"

"দেখা যাক কি করে ফেরে।"

"ভুল হয়নি তো আপনার?"

"না।"

"সুয়েজ দিয়ে যেতে হয়েছে—এ কথা চোর প্রমাণ করতে চায় কেন?"

"জানি না। ও নিয়ে ভাবিনি আমি। শুনুন—"

বলে পাস্‌পার্তুর মুখে শোনা দরকারী কথাগুলো বললেন ফিক্স।

"লোকটার চেহারার সঙ্গে কাজের কোনো সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে না," বললেন কনসাল। "এখন কি মতলব?"

"গ্রেপ্তারী পরোয়ানা চেয়ে লণ্ডনে টেলিগ্রাম পাঠাবো—বোম্বাইতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন পাকড়াও করা যায়। মঙ্গোলিয়ার ডেকে যাত্রী হব। ইংরেজ রাজত্বে পা দিয়ে এক হাতে ওয়ারেণ্ট, আরেক হাতে চোরের ঘাড় ধরব।"

ধীর স্থির ভাবে কথা ক'টি বলে বিদায় নিলেন ফিক্স। টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে তারবার্তা পাঠালেন লণ্ডনে। তার পনেরো মিনিট পরে ছোট্ট ব্যাগ হাতে উঠলেন মঙ্গোলিয়ার ডেকে।

একটু পরেই গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে লোহিত সমুদ্রের বুক চিরে এগোলো জাহাজ।

৯॥ ফিলিয়াস ফগের অনুকূলে এল লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগর

সুয়েজ থেকে এডেনের দূরত্ব ঠিক ১৩১০ মাইল। নিয়ম অনুযায়ী কোম্পানীর সব জাহাজকেই ১৩৮ ঘণ্টায় পথটুকু পাড়ি দিতে হয়। ইঞ্জিনীয়ারের নৈপুণ্যে মঙ্গোলিয়া বেশ জোরেই ছোটে এবং বরাবর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছোয় গন্তব্যস্থানে।

কিন্তু লোহিত সাগরের খামখেয়ালের অন্ত নেই। দামালিপনারও শেষ নেই। আফ্রিকা আর এশিয়ার উপকূল থেকে হু-হু করে হাওয়া আসতেই মঙ্গোলিয়া দুলতে লাগল বিপজ্জনকভাবে। কিন্তু মঙ্গোলিয়ার মত তেজীয়ান জাহাজের গতিরোধ করা অত সহজ নয়। জল হাওয়ার তেড়িয়া মূর্তিকে তোয়াক্কা না করে নাকের সিধে এগিয়ে চলল বাব-এল-মান্দেবের দিকে।

ফিলিয়াস ফগ তখন কি করছিলেন? নির্বিকার ভাবে লক্ষ্য করছিলেন হাওয়ার দাপট, জলের উচ্ছ্বাস আর জাহাজের দুলুনি। গতিবেগ মন্দীভূত হওয়া মানেই দেরীতে পৌছোনো। উদ্বেগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মুখের ভাবে মনের উদ্বেগ বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাচ্ছিল না।

এখানেও রিফর্ম ক্লাবের সেই অবিচল মূর্তি। সৃষ্টি রসাতলে গেলেও বিস্মিত হতে জানেন না। জাহাজের ক্রোনোমিটারের মত যান্ত্রিক নিয়মে এগিয়ে চলেন—একটুও এদিক-ওদিক হয় না। কৌতূহলবশতঃ ডেকের ওপরেও ওঠেন নি তিনি, কেবিনে বসে উদাসীনভাবে লোহিত সাগরের মনে রাখবার মত রুদ্ররূপ দেখেছেন। চারবেলা তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছেন—জাহাজের দুলুনিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। বরং অক্লান্তভাবে হুইস্ট খেলে গেছেন বাকী সময়টুকু। কপাল ভাল ওঁর। জাহাজেই তাসের সঙ্গী পেয়ে গেছিলেন। প্রথম জন একজন ট্যাক্স কালেক্টর—গোয়ায় যাচ্ছেন। দ্বিতীয় জন রেভারেণ্ড ডেসিমাস স্মিথ—বোম্বাই ফিরছেন। তৃতীয় জন ফৌজী অফিসার—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল—বেনারসে চলেছেন নিজের ব্রিগেডে যোগ দিতে। চারজন মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস পিটেছেন মুখে কুলুপ এঁটে।

পাস্‌পার্তু নিজেও সমুদ্র পীড়ার খপ্পর এড়িয়ে গিয়েছিল। বমি-টমি করে নি। ফলে, উদর-সেবা চালিয়ে যাচ্ছিল সামনের কেবিনে। সমুদ্র যাত্রায় সে বিলক্ষণ খুশী। সুয়েজ থেকে বেরোনোর পরের দিন ডেকে পায়চারী করতে করতে ফের দেখা হল ফিক্সের সঙ্গে।

গায়ে পড়ে কথা বলল পাস্‌পার্তু—"আপনার সঙ্গেই সুয়েজের জেটিতে আলাপ হয়েছিল না?"

"আরে, তাই তো বটে! তুমিই না সেই অদ্ভুত ইংরেজ ভদ্রলোকের চাকর—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার নাম?"

"ফিক্স।"

"মঁসিয়ে ফিক্স, জাহাজে আপনার দেখা পেয়ে পুলকিত হলাম। চলেছেন, কোথায়?"

"তোমরা যেখানে যাচ্ছো— বোম্বাই।"

"বাঃ, চমৎকার! এর আগেও গিয়েছেন?"

"বহুবার। পেনিনসুলার কোম্পানীর আমি এজেণ্ট কিনা— তাই।"

"তাহলে তো ভারতবর্ষ আপনার জানা জায়গা?"

"তা—হ্যাঁ," একটু হুঁশিয়ার হলেন ফিক্স।

"অদ্ভুত দেশ, তাই না?"

"খুবই অদ্ভুত। মসজিদ, মিনার, মন্দির, ফকির, প্যাগোডা, বাঘ, হাতী দেখতে দেখতে তাক লেগে যাবে। দেখে দেখে আশ মিটবে না। তবে হাতে সময় নিয়ে যেও বাপু।"

"ইচ্ছে তো আছে। মাথা খারাপ না থাকলে জাহাজ থেকে রেল, আর রেল থেকে জাহাজে লাফিয়ে লাফিয়ে কেউ বেড়ায়? ৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণের নামে সারা জীবনটা এইভাবে কাটাবো নাকি? আমার তো মনে হয় বোম্বাই পৌঁছেই আমাদের দম ফুরোবে।"

'মিস্টার ফগ ভালো আছেন তো?' যেন গেজুড়ে আলাপ করছেন, এমনি সহজ সুরে বললেন ফিক্স।

"বহাল তবিয়তে আছেন। আমিও বেশ দুভিক্ষের খাওয়া খাচ্ছি। সমুদ্রের হাওয়ায় পেটে আগুন জ্বলছে যেন।

"কিন্তু তোমার কর্তাকে কখনো ডেকে দেখলাম না তো?"

"কস্মিনকালেও দেখবেন না। ডেকে ওঠার কোনো তাগিদ নেই ওঁর মনের মধ্যে।"

"দেখো পাসপার্তু, তোমার কি কখনো খটকা লাগেনি ৮০ দিনের ভূ-প্রদক্ষিণের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে? ভূ প্রদক্ষিণটা আসলে ভাঁওতা। নিশ্চয় কোনো রাজনৈতিক কারণ আছে এর মধ্যে।

"বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে ফিক্স, কর্তার মতিগতির কিসসু আমি জানি না। জানার ইচ্ছেও নেই।'

এরপর থেকেই প্রায় দেখা হত দুজনে। পাসপার্তুকে হাত করার জন্যে মাঝে মাঝে তাকে জাহাজের মদশালায় নিয়ে গিয়ে গেলাস খানেক হুইস্কি গিলিয়ে দিতেন ফিক্স। মনে বড় বরলেই পাসপার্তু ভাবত, ফিক্সের মত এমন খাসা মানুষ দুনিয়ায় বুঝি আর নেই।

পনেরো তারিখে কয়লা নেওয়ার জন্যে এডেন বন্দরের উত্তর পশ্চিমে স্টীমার পয়েণ্টে দাঁড়াল মঙ্গোলিয়া।

এখনো ১৬৫০ মাইল গেলে তবে বোম্বাই। স্টীমার পয়েণ্টে থাবে চার ঘণ্টা

কয়লা তোলার জন্যে। কিন্তু এ-টুকু দেরী হিসেবের মধ্যে ছিল বলে ফগের প্রোগ্রাম ভণ্ডুল হল না। তাছাড়া, এডেন বন্দরে মঙ্গোলিয়া পৌঁছেছে নির্দিষ্ট সময়ের আগে—পনেরোই সকালের বদলে চোদ্দই সন্ধ্যায়—পাক্কা পনেরো ঘণ্টা আগে!

আবার এডেনে নামলেন ফগ। সঙ্গে অনুগত ভৃত্য। পাশপোর্টে সই করিয়ে নিলেন। পেছনে ছায়ার মত লেগে রইলেন ফিক্স।

বাইশ তারিখের দুদিন আগে বিশ তারিখে বোম্বাই পৌঁছোলো মঙ্গোলিয়া। রোজনামচায় দুদিন বাড়তি সময়ের হিসেব লিখে রাখলেন ফগ।

১০ ॥ জুতো ফেলে পালিয়ে বাঁচল পাসপার্তু

সে এক কাল ছিল যখন ভাবত ভ্রমণ করতে হত হয় পায়ে হেঁটে, নয় ঘোড়ায় চড়ে, নযতো পাল্কী চেপে। কিন্তু এখন দুরন্তবেগে স্টীমার ছোটে সিন্ধু আর গঙ্গায়। হু হু করে ট্রেন ধেয়ে যায় বোম্বাই থেকে কলকাতায় মাত্র তিন দিনে। বোম্বাই থেকে কলকাতা আকাশ পথে নাকের সিধে গেলে যদিও এক হাজার কি বড জোর এগারোশ মাইল, কিন্তু রেলের লাইন গেছে এঁকে বেঁকে পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা ছুঁয়ে, বুন্দেলখণ্ড, এলাহাবাদ, বেনারস, বর্ধমানের গা দিয়ে।

বিকেল ঠিক সাড়ে চারটের সময়ে জেটিতে নামল মঙ্গোলিয়ার যাত্রীরা। কলকাতার ট্রেন ছাড়বে কাঁটায় কাঁটায় আটটায়।

তাসের সঙ্গীদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তীরে নামলেন ফিলিয়াস ফগ। ভৃত্যের ওপর কিছু কাজ চাপিয়ে শহরে পাঠালেন। নিজে সেকেণ্ডের কাঁটার মত মেপে মেপে পা ফেলে পৌঁছোলেন পাশপোর্ট অফিসে।

এদিকে ফিক্স রওনা হয়েছেন নিজের ধান্দায়। জাহাজ থেকে নেমেই সোজা গেছেন বোম্বাই পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে। আত্মপরিচয় দিয়ে জানতে চেয়েছেন লণ্ডন থেকে কোনো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এসেছে কিনা।

জবাব শুনে দমে গেছেন লণ্ডন ডিটেকটিভ। পরোয়ানা এখনো আসেনি আসবার সময়ও আর নেই। তখন বায়না ধরেছেন পুলিশ কমিশনারের কাছে—ছলছুতো করে যেন ফিলিয়াস ফগকে আটকে রাখা হয়। পুলিশ কমিশনার সবিনয়ে সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের কাজে মন দিয়েছেন। কাকে কান নিয়ে গেছে খবর পেয়ে কাকের পেছনে দৌড়োনো তাঁকে মানায় না।

পাসপার্তু মনিবের হুকুম শুনেই বুঝেছিল, প্যারিস আর সুয়েজ থেকে যে-ভাবে ঝটিকা বেগে বেরিয়ে পড়েছিলেন ফগ, বোম্বাই থেকেও বেরোবেন সেইভাবে। তখন বেচারী মনকে প্রবোধ দিল, হয়ত কলকাতা গিয়ে সুমতি ফিরতে পারে মনিবের। সেই সঙ্গে মনটাও খচখচ করতে লাগল বাজীর প্রসঙ্গ ভেবে। সত্যিই কি তাহলে বাজী ধরেছেন ফগ? ঘরকুনো পাসপার্তুর বরাতে কি ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণই শেষকালে লেখা ছিল?

সার্ট আর জুতো কিনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগল পাসেপার্তু। ছত্রিশ জাতের লোক ঘুরছে পথে ঘাটে। ভীড়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ইউরোপীয়, পার্শি, আর্মেনিয় এবং আরও কত শত মানুষ। সেদিন আবার পার্শিদের কি-এক ধর্মীয় উৎসব লেগেছে শহরে। ভারতবাসীদের মধ্যে সূর্যোপাসক পার্শিরা বিশেষ স্থান নিয়েছে ওদের বুদ্ধিমত্তা এবং নানাবিধ গুণপণার জন্যে। বোম্বাই ব্যবসায়ীদের মধ্যে বড় বড় কারবারী বলতে এরাই।

পার্শিদের চলমান ধর্মমেলার জাঁকজমক দেখে তাজ্জব হয়ে গেল পাসপার্তু। দিশি বাজনা বাজছে, গোলাপী ঘাগরা পরে সোনারূপোর গয়না গায়ে মেয়েরা নাচছে—নাচের ঢঙে অশালীনতার ছিটে ফোঁটা নেই, শোভাযাত্রা চলেছে; প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। দেখে শুনে পাসপার্তুর চোখজোড়া শামুকের চোখের মত ঠেলে বেরিয়ে এল।

ধর্মমেলা আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। পায়ে পায়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছিল পাসপার্তু এবার ফিরল স্টেশনের দিকে। কিছুদূর এসেই চোখে পড়ল মালাবার হিলের ওপর একটা ভারী সুন্দর দেউল।

দেখেই ভেতর দেখবার লোভ হল পাসপার্তুর। অজ্ঞতার দরুন সে জানত না, হিন্দুদের দেব দেউলে খ্রীস্টান বা অন্য ধর্মীয়দের প্রবেশ নিষেধ। বৃটিশ সরকার কড়া আইন বানিয়ে রেখেছেন যাতে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না লাগে।

গোঁড়া হিন্দুরা বাইরে জুতো খুলে খালি পায়ে ভেতরে ঢোকে।

পাসপার্তুর অতশত জানবার কথা নয়। গট গট করে জুতো পরেই ভেতরে ঢুকে সপ্রশংস চোখে তারিফ করছে মন্দির গাত্রের বিস্ময়কর কারু কাজ। এমন সময়ে প্রচণ্ড রদ্দা খেয়ে বেচারী চিৎপটাং হল মেঝের ওপর। দেখল তিন-তিনজন অগ্নিমূর্তি ব্রাহ্মণ পুরুষ ঘিরে ধরেছে তাকে। একজন হ্যাঁচকা টানে ওর জুতো খুলে নিক্ষেপ করল বাইরে। তারপর তিনজনে মিলে চোরের মার মারতে লাগল তাকে। এত বড় স্পর্ধা! বিধর্মী এসেছে মন্দির অপবিত্র করতে! মার...মার...মার! প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল পাসপার্তু।

পরক্ষণেই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। ব্যায়ামবীর ফরাসীর দুই ঘুসিতে দুদিকে, ঠিকরে গেল দুজন পুরুৎ। তৃতীয় জনকে পদাঘাতে দূরে সরিয়ে ছিটকে এল বাইরে এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে মিশে গেল ভীড়ের মধ্যে।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময়ে টুপীহীন, জুতোহীন পাসপার্তু কামারের হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল স্টেশনে। ঝামেলার ঠেলায় বেচারীর নতুন কামিজ আর জুতোর প্যাকেটটাও গেছে হারিয়ে।

ফিলিয়াস ফগের পেছন পেছন গোয়েন্দা ফিক্স ফিরে এসেছিলেন স্টেশনে। মনে মনে তিনি সংকল্প করেছেন, কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করবেন ব্যাঙ্ক চোর ফগকে।

এমন সময়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন ঝড়োকাকের মত ছুটতে ছুটতে এল পাসপার্তু। এক নিঃশ্বাসে বর্ণনা করল মন্দির-দর্শনের অ্যাডভেঞ্চার।

ট্রেনে উঠতে উঠতে নির্বিকার ভাবে শুধু বললেন ফগ।—"আর যেন এমন না হয়।"

মুখ কালো করে পেছন পেছন উঠে পড়ল পাসপার্তু। পাশের কামরায় ফিক্স উঠতে গিয়েও দাড়িয়ে পড়লেন।

নতুন ফন্দী এসেছে মাথায়! ভারতবর্ষের মাটিতে অপকর্ম করেছে পাসপার্তু! এই তো স্বর্ণ সুযোগ! এখন তো ফিক্সের যাওয়া হতে পারে না।

সিটি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে গেল স্টেশন থেকে। ফিক্স সহর্ষে হাত ঘষতে লাগল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

১১॥ অগ্নিমূল্যে আশ্চর্য বাহন কিনলেন ফিলিয়াস ফগ

কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময়ে যাত্রা শুরু করল ট্রেন। যাত্রীদের মধ্যে ছিল অফিসার, সরকারী চাকুরে, আফিং আর নীলের কারবারী। মনিবের সঙ্গে এক কামরাতেই ভ্রমণ করছে পাসপার্তু। কামরার তৃতীয় আরোহী বসেছেন ওঁদের সামনের আসনে। এঁর নাম স্যার ফ্রান্সিস ক্রোমার্টি; মঙ্গোলিয়া জাহাজে মিস্টার ফগের হুইস্ট খেলার পার্টনার। বেনারসে ওঁর ফৌজে ফিরে যাচ্ছেন স্যার ক্রোমার্টি। ভদ্রলোক দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, বছর পঞ্চাশ বয়স। গত সিপাই বিদ্রোহের সময়ে এঁর শৌর্যবীর্য সেনাবাহিনীতে ওঁকে বিশেষস্থান দিয়েছে। ভারতবর্ষকেই ইনি বাসস্থান বানিয়েছেন। ইংলণ্ডে

যান মাঝেসাঝে। ভারতবর্ষের রীতিনীতি, আদবকায়দা, দেশীয় অধিবাসীদের চালচলন, আচার আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা সব তাঁর নখদর্পণে। এককথায়, ভারতবর্ষ আর ভারতবাসীদের চরিত্র যেন ওঁর অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছে।

কিন্তু ফিলিয়াস ফগ তো ঠিক পর্যটন করছেন না, ওঁর উদ্দেশ্য হল ভূপৃষ্ঠকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসা, পথিমধ্যে কি আছে না আছে, তা নিয়ে ওঁর মাথা ব্যথা নেই। উনি চলেছেন অনেকটা যন্ত্রবিদ্যার যুক্তিতে পৃথিবী নামক গ্রহটিকে একটি বেড় দিয়ে আসতে।

সেই মুহূর্তে উনি মনে মনে হিসেব করছিলেন লণ্ডন থেকে রওনা হওয়ার পর মোট ক'ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। হৃষ্ট চিত্তের নিদর্শন স্বরূপ দুহাত ঘষা ওঁর কাছে শক্তির অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়—নইলে এই চিন্তার পর পরম সন্তোষে উনি হাত না ঘষে না পারতেন না।

ভ্রমণ-সঙ্গীর অস্বাভাবিক আচরণ স্যার ফ্রান্সিস ক্রোমার্টির নজর এড়োয়নি। মঙ্গোলিয়ায় তাসপেটার ফাঁকে মিস্টার ফগকে তিনি নিরীক্ষণ করেছেন। অবাক হয়ে ভেবেছেন, ফগের নির্বিকার নিরুত্তেজ নিশ্চুপ বাহ্য আবরণের ভেতরে সত্যিই হৃদপিণ্ড নামক দেহযন্ত্রটা ধুকপুক করে চলছে কিনা এবং নিসর্গ দৃশ্য উপলব্ধি করার বাস্তবিকই কোনো অনুভূতি ভদ্রলোকের আছে কিনা। জীবনে অনেক বাতিকগ্রস্ত ছিটগস্ত উদ্ভট চরিত্রের মানুষ দেখেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কিন্তু এমনটি দেখেন নি।

স্যার ফ্রান্সিসের কাছে কিছুই গোপন করেননি ফিলিয়াস ফগ। কি পরিস্থিতিতে বাজী ধরার প্রসঙ্গ উঠেছিল এবং কিভাবে উনি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে চলেছেন, সব বলেছিলেন। শুনে স্যার ফ্রান্সিসের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল ফিলিয়াস ফগের মাথায় নির্ঘাৎ ছিট আছে। নইলে ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণের মত অর্থহীন ব্যাপার নিয়ে কেউ এত কষ্ট করে? যার মাথায় এতটুকু উপস্থিত বুদ্ধি আছে, এ নিয়ে সে বাজী ধরবে না। সব চেয়ে বড় কথা, এতবড় একটা কাণ্ড করার পর নিজের বা দেশের কারু কোনো উপকার হচ্ছে না যখন, তখন খামোকা এত ঝামেলা কাঁধে নেয় তারাই যাদের মাথায় গোল মাল আছে।

কল্যাণ পৌছোলো ট্রেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। এখান থেকে দুদিকে গিয়েছে রেল লাইন। একটা লাইন গেছে দক্ষিণ-পূব দিকে পুণা অভিমুখে। কলকাতাগামী ট্রেন চলল সোজা এলাহাবাদের দিকে। অরণ্য-সবুজ ধূসর পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলেছে ঢুকুর-ঢুকুর করে, মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা বলছেন স্যার ফ্রান্সিস, সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছেন ফিলিয়াস ফগ।

কথা প্রসঙ্গে বললেন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল—"কয়েক বছর আগে এলে কিন্তু ঠিক এই জায়গায় আপনার দেরী হয়ে যেত, নির্ঘাৎ বাজী হারতেন।"

"কেন?"

"পাহাড়ের গোড়ায় এসে ট্রেন দাঁড়িয়ে যেত। পাহাড় পেরোতে হত টাট্টু ঘোড়া বা পাল্কী চেপে।"

"তাতেও বাজী হারতাম না।" বললেন ফিলিয়াস ফগ। "রাস্তায় বেরোলে এ ধরনের ব্যাগড়া আসবেই। প্রতি মুহূর্তে তা আঁচ করে সময়ের হিসেব রাখছি আমি।"

"মিস্টার ফগ" বললেন স্যার ফ্রান্সিস। "আপনার গৃহভৃত্যটি কিন্তু আর একটু হলেই তো একটা ঝামেলা বাধিয়ে বসেছিল"—গৃহভৃত্যটি তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মগ্ন। "মালাবার হিলে দেব দেউলে যে অনাসৃষ্টি কাণ্ডটি করেছে সে, বৃটিশ সরকার টের পেলে ঝামেলায় পড়তেন। ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস যাতে অক্ষুন্ন থাকে, সেদিকে কড়া নজর আছে সরকার বাহাদুরের। আপনার চাকরটি ধরা পড়লে—"

"কি আর হত," নির্বিকার জবাব ফিলিয়াস ফগের। "ও সাজা পেত, পরে ইউরোপে ফিরে যেত। তাতে তার মনিবের গায়ে আঁচ লাগতে যাবে কেন বুঝলাম না।"

কথোপকথনের ইতি হল এহেন জবাবের পর। সারারাত ধরে ট্রেন ছুটল পাহাড় পর্বতের কোল ঘেঁসে। নাসিক রইল পেছনে। পরের দিন ট্রেন পৌঁছোলো খান্দেশ অঞ্চলে। দুপাশে সমতলভূমি—শস্য শ্যামল কৃষিক্ষেত্র। ছাড়া ছাড়া পল্লীগ্রাম। মন্দির মসজিদের চূড়া। গোদাবরীর অসংখ্য শাখা প্রশাখায় জলসিঞ্চনে উর্বর জমির সর্বত্র সমৃদ্ধির ছাপ।

সাড়ে বারোটার সময়ে বাহানপুরে ট্রেন দাঁড়াতেই ঝুটো মুক্তো বসানো একজোড়া চটিজুতো কিনল পাসপার্তু। চরণ যুগল চটি দিয়ে ঢেকে বুক ফুলিয়ে সে কি জাঁক তার। চটপট প্রাতঃরাশ খেয়ে নিলেন টুরিস্টরা। ট্রেন গড়িয়ে চলল আসীর গড়ের দিকে তাপ্তী নদীর অববাহিকার ওপর দিয়ে।

এখান থেকে শুরু হল সাতপুরা পর্বতশ্রেণী। পরের দিন পাসপার্তুকে স্যার ফ্রান্সিস ঘড়িতে কটা বাজে জিজ্ঞেস করায় পাসপার্তু তার মান্ধাতা আমলের ঘড়ি দেখে বলল রাত তিনটে। গ্রীনউইচ মধ্যাহ্নের সময় অনুসারে পাসপার্তুর ঘড়িতে তখন রাত তিনটেই বটে। কিন্তু ভারতীয় সময়ের হিসেবে ঘড়ি চার ঘণ্টা পেছিয়ে চলেছে।

স্যার ফ্রান্সিস ভুলটা শুধরে দিলেন। কিন্তু একগুঁয়ে পাসপার্তু কিছুকে

যা বলেছিল, সেই জবাবই শুনিয়ে দিল স্যার ফ্রান্সিসকে। বৃথাই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বোঝালেন যে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘরে রাখা দরকার; কেননা ক্রমাগত পূবমুখো চলার দরুন অর্থাৎ সূর্যের দিকে মুখ রেখে এগোনোর জন্যে, এক-এক ডিগ্রী পথ পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে চার মিনিট করে ছোট হয়ে যাচ্ছে দিনটা। কিন্তু পাসপার্তু প্রাণ গেলেও ঘড়ির কাঁটা ঘোরাবে না লণ্ডন না পৌঁছোনো পর্যন্ত। শেষকালে ওর সরল মনের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কাছে হার মানলেন জাঁদরেল সেনাপতি।

রাত আটটার সময়ে বনের মধ্যে ফাঁকা ঘাসজমির ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। কনডাকটর গার্ড প্রতিটি কামরার কাছে হেঁকে গেল—"নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন!"

প্রশ্নসূচক চোখে স্যার ফ্রান্সিস ক্রোমার্টির পানে তাকালেন ফিলিয়াস ফগ। কিন্তু জেনারেল নিজেও বলতে পারলেন না খেজুর আর বাবলার জঙ্গলে ট্রেন থামানোর কি এমন দরকার পড়ল।

পাসপার্তুও কম অবাক হয়নি। বোঁ করে নেমে গেল সে কামরা থেকে। ফিরে এল একটু পরেই। এসেই এক চীৎকার—"মঁসিয়ে, ট্রেন আর যাবে না!"

"তার মানে?" শুধোলেন স্যার ফ্রান্সিস। "কি বলতে চাও তুমি?"

"বলতে চাই যে ট্রেন আর এগোবে না। এই শেষ।"

তৎক্ষণাৎ নেমে পড়লেন জেনারেল। ফগও নামলেন। দল বেঁধে গেলেন কনডাকটর গার্ডের সামনে।

"আমরা এখন কোথায়?" শুধোলেন স্যার ফ্রান্সিস।

"খোলবি নামে একটা গণ্ডগ্রামে।"

"এখানেই কি যাত্রা শেষ?"

"তাছাড়া আর কি। রেলপথ তৈরী এখনো শেষ হয় নি।"

"শেষ হয় নি!"

"আজ্ঞে না। এখান থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত পঞ্চাশ মাইল রাস্তায় লাইন পাতা এখনো বাকী। এলাহাবাদ থেকে ফের ট্রেন পাবেন।"

"সে কী কথা! কাগজে তো লিখেছে আগাগোড়া রেল লাইন পাতা হয়ে গেছে।"

"ভুল লিখেছে।"

"জেনেশুনেও আপনারা বোম্বাই থেকে কলকাতা পর্যন্ত টিকিটের দাম নিয়েছেন?" আস্তে আস্তে চোখ মুখ লাল হয়ে আসছিল স্যার ফ্রান্সিসের।

"তা নিয়েছি। কিন্তু প্যাসেঞ্জাররা জানে খোলবি থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা তাদের নিজেদের।"

রেগে টং হলেন স্যার ফ্রান্সিস। পাসপার্তুর বড় ইচ্ছে হল কনডাকটর গার্ডকে এক ঘুসি মেরে শুইয়ে দেওয়ার। মনিবের মুখের অবস্থা দেখবার মত সাহসও ছিল না বেচারীর।

"স্যার ফ্রান্সিস," প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন ফিলিয়াস ফগ। "আসুন, এলাহাবাদ যাওয়ার যানবাহন খুঁজে নেওয়া যাক।"

"মিস্টার ফগ, তাতে আপনার দারুণ দেরী হবে।"

"না হবেনা। আগে থেকেই সে পথ আমি মেরে রেখেছি।"

"আপনি জানতেন রেল লাইন আধা খ্যাচড়া হয়ে রয়েছে?"

"না, তা জানতাম না। তবে এটুকু জানতাম পথে নানা রকম ঝামেলা ওৎ পেতে থাকে। তাই আগে থেকেই বাড়তি দুদিন হাতে রেখেছিলাম। সুতরাং দেরী হবে না। কলকাতা থেকে হংকং-য়ের জাহাজ ছাড়বে পঁচিশে দুপুরবেলা। আজ বাইশে। কাজেই, যথাসময়ে কলকাতা পৌঁছে যাবে।"

হিমালয়প্রতিম সেই আত্মবিশ্বাসের সামনে কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না স্যার ফ্রান্সিস।

দেখা গেল, প্যাসেঞ্জাররা জানে ট্রেন আর যাচ্ছে না। তাই গাড়ী থামতেই তারা গাঁ থেকে জুটিয়ে নিয়েছে নানারকম যানবাহন। চারচাকার পাল্কীগাড়ী, ষাঁড়ে টানা গাড়ী, রথের মত গাড়ী, পাল্কী, টাট্টু, ঘোড়া এবং আরো কত কী।

খবরটা জানে না কেবল খবরের কাগজওয়ালারা! রেলপথ যে আধাখ্যাচড়া তা না জেনেই ফলাও করে ছেপে দিয়েছে একটা ভুল খবর!

স্যার ফ্রান্সিস মিস্টার ফগকে সঙ্গে নিয়ে সারা গাঁ ঘুরে এলেন। কোনো গাড়ী পেলেন না। সব গাড়ী ভাড়া হয়ে গিয়েছে।

ফিলিয়াস ফগ বললেন—"আমি হেঁটেই চললাম।"

ইতিমধ্যে ওঁদের দলে ফের ভিড়েছিল পাসপার্তু। হেঁটে যেতে হবে শুনে মুখভঙ্গী করল তার সৌখীন চটি জুতোর পানে তাকিয়ে। তারপর বলল—"মঁসিয়ে, বাহনের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।"

"বাহন! কি বাহন?"

"হাতী! কাছেই একটা হাতী আছে। মালিক একজন ভারতীয়।"

"চলো দেখে আসি," পা বাড়ালেন মিস্টার ফগ।

বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে একটা ঘেরা জায়গায় রাখা ছিল হাতীটা।

পাশের কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল একজন ভারতীয়। ঘেরা জায়গায় তিন সাহেবকে নিয়ে গেল সে। বুঝিয়ে বলল, মাল বওয়ার জন্যে এ হাতী সে পোষেনি। এমনিতেই ঐরাবৎ মহাপ্রভু অর্ধেক পোষ মেনেছে। ইচ্ছে করেই তাকে লড়ুয়ে হাতী তৈরী করা হচ্ছে। সেইজন্যেই নিয়মিত তাকে খুঁচিয়ে মেজাজ তিরিক্ষে করা হয়, তিন মাস অন্তর চিনি আর মাখন গেলানো হয়। হাতীরা গোবেচারা হয় বলেই এত কাণ্ড করে ভয়ংকর করে তুলতে হয় লড়ুয়ে হাতীদের। তবে ততটা ভয়ংকর এখনো হতে পারে নি হস্তীমহাশয়। সুতরাং মিস্টার ফগকে পিঠে নিয়ে অনায়াসে পৌঁছে দিতে পারবে। হাতীটার নাম কিউনি। যে কোনো যানবাহনের চাইতে জোরে ছুটতে পারে সে।

কিউনির গুণপণা শুনে তাকেই ভাড়া নেওয়ার মতলব আঁটলেন মিস্টার ফগ। হাতী জীবটা অবশ্য ভারতবর্ষে সংখ্যায় ক্রমশঃ কমে আসার দরুন একটু মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। মদ্দা হাতীদের দরকার হয় সার্কাস পার্টিতে। মদ্দা হাতীদের আরো অনেক চাহিদা আছে, কিন্তু তাদের পোস মানানো মুস্কিল। এই সব কারণেই কিউনিকে ভাড়া নেওয়ার প্রস্তাব শোনা মাত্র তার মালিক বেঁকে বসল। মিস্টার ফগও জেদ ধরে রইলেন। ঘণ্টায় দশ পাউণ্ড পর্যন্ত দিতে চাইলেন। এলাহাবাদ পৌঁছেই ছুটি পাবে কিউনি। রাজী হল না মালিক। বিশ পাউণ্ড? না। চল্লিশ পাউণ্ড? তখনো না। এক একটা দর শুনেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল পাসপার্তু। কিন্তু টাকার লোভে বশীভূত হবে না—এই রকম একটা পণ করেছিল বোধহয় কিউনির মালিক। তাই মাত্র পনেরো ঘণ্টার মধ্যে দশ পাউণ্ড স্টার্লিং রোজগারের প্রস্তাব শুনেও অবিচল রইল সে।

অবিচল রইলেন ফিলিয়াস ফগও। ভাড়ার প্রস্তাব গ্রাহ্য হল না দেখে সরাসরি কিনতে চাইলেন কিউনিকে। প্রথমেই দিতে চাইলেন হাজার পাউণ্ড। কিন্তু ভারতীয়র গোঁ ভাঙল না।

মিস্টার ফগকে একপাশে টেনে নিয়ে গেলেন স্যার ফ্রান্সিস। আরো দর বাড়ানোর আগে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করলেন। মিস্টার ফগ সে কথার জবাব দিলেন এই ভাবে: ঝোঁকের মাথায় কিছু করা তাঁর স্বভাব নয়, বিশহাজার পাউণ্ড জলে যাবে হাতীটা না গেলে, সুতরাং কিউনিকে তার চাই-ই চাই, সে জন্যে ন্যায্য দামের বিশগুণ দিতেও তিনি প্রস্তুত।

এই বলে তিনি ফিরে এলেন হাতীর মালিকের কাছে। দামের বহর শুনে তার অবস্থাও ততক্ষণে কাহিল হয়ে এসেছে। লোভে চকচক করছে কুৎকুতে তীক্ষ্ণ চোখ দুটো। মিস্টার ফগ বুঝে ফেললেন, লোকটা স্রেফ

দাঁও পেটবার মতলবে আছে। অতএব তিনি ঝপাঝপ দাম চড়িয়ে গেলেন। বারোশ, পনেরোশ, আঠারোশ, দুহাজার। পাসপার্তুর মত লোক, যার মুখকিনা এমনিতেই রাঙা, সে পর্যন্ত সাদা হয়ে গেল নিঃসীম উৎকণ্ঠায়।

হস্তীপতির হস্ত প্রসারিত হল দুহাজার পাউণ্ড হাঁক শুনে!

"একটা হাতীর জন্যে এত টাকা!" যেন একটা খাবি খেল পাসপার্তু।

বাকী রইল একজন পথ প্রদর্শকের। সে সমস্যা সহজেই মিটল। এগিয়ে এল একজন পার্শী ছোকরা। বুদ্ধিদীপ্ত মুখে প্রস্তাব করল হাতীর পিঠে মাহুত হওয়ার জন্যে। রাজী হলেন ফগ। শুধু রাজী হলেন না, মোটা টাকার বখশিস দিতেও চাইলেন। তৎক্ষণাৎ হাতীর পিঠে কাপড় বিছিয়ে চলনসই গোছের হাওদা লাগিয়ে ফেলল পার্শী ছোকরা। দেখা গেল, মাহুতের কাজে বেশ পোক্ত সে।

কার্পেট-ব্যাগের বোঝা কমল—বেশ কিছু নোট গেল হাতীর মালিকের হাতে। মিস্টার ফগ এরপর স্যার ফ্রান্সিসকেও হাতীর পিঠে সঙ্গী হওয়ার অনুরোধ জানালেন। রাজী হলেন জেনারেল। পাহাড় প্রমাণ হাতীর পিঠে একটা মানুষ বাড়লে কি এমন এসে যায়! খোলবি থেকে খাবার কিনে নেওয়া হল। তারপর হাওদা নীচু করে উঠে বসলেন স্যার ফ্রান্সিস আর মিস্টার ফগ। পাসপার্তু বসল ওঁদের মাঝে বিছোনো কাপড়টার ওপর। পার্শী মাহুত বসল হাতীর ঘাড়ে। নটার সময়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে সর্টকাট রাস্তা ধরল কিউনি।

১২॥ ভারতীয় জঙ্গলে প্রবেশ এবং তারপর

বিন্ধ্যপর্বতের বুকের ওপর দিয়ে যেতে হয়েছে বলে রেললাইন অনেক ঘুরে পৌঁচেছিল এলাহাবাদে। মাহুত পথ সংক্ষেপ করার জন্যে ধরল বনের পথ। এ-পথে নাকি বিশ মাইল পথ কমে যাবে। বনের পথ তার নখদর্পণে।

হাতীর দুলুনিতে ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হল পাসপার্তুর। ফগ তাকে বলে দিয়েছিলেন, জিভটা যেন দাঁতের ফাঁকে না রাখা হয়—রাখলেই বিপদ। ঝাঁকুনির চোটে জিভ কেটে দুটুকরো হবে। কিন্তু তাতেও কি প্রাণ বাঁচে? বাসরে বাস! গজেন্দ্রগমণের ঠেলায় প্রাণান্ত হল বেচারী ফরাসীরা! ল্যাজের কাছে বসার দরুন ক্ষণে ক্ষণে সেকী ঝাঁকুনি। কিন্তু তার মধ্যেই মজা করে চলেছে সে। এককালে সার্কাস পার্টিতে থাকার দরুন

শূন্যে ডিগবাজির কায়দা তার জানা ছিল। তাই ঝাঁকুনি এড়ানোর জন্যে ল্যাজের কাছ থেকে ডিগবাজি খেয়ে হাসতে হাসতে পৌঁছেছিল হাতীর ঘাড়ের ওপর। পকেট থেকে চিনির ডেলা বার করে গুঁজে দিচ্ছিল হাতীর মুখে।

স্যার ফ্রান্সিস আর মিস্টার ফগ পাকা ইংরেজের মত মুখ বুঁজে ছিলেন অত কষ্টের মধ্যেও।

দুঘণ্টা ধকল সইবার পর কিউনি থামল। এক ঘণ্টা জিরেন নেবে সে, গাছের পাতা খাবে। সাহেবরাও এই ফাঁকে কিছু খেয়ে নিক—বলল পার্শী মাহুত।

কিউনি শুঁড়ে টেনে গাছের কচি শাখাগুলো মুখে পুরছিল। সপ্রশংস চোখে সেই দিকে তাকিয়ে স্যার ফ্রান্সিস বললেন—"ঠিক যেন একটা লোহার হাতী!"

"পেটাই লোহা" প্রাতরাশ সাজাতে সাজাতে মন্তব্য করল পাসপার্তু।

সেদিন সারা দিন এবং রাত জঙ্গলে কাটিয়ে পরের দিন ফের ভোর বেলা রওনা হল অভিযাত্রীরা! বেলা দুটার সময়ে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করল কিউনি। বেশ কয়েক মাইল পথ ইচ্ছে করেই গাছপালার আড়ালে গা ঢেকে এগিয়ে চলল মাহুত। জায়গাটা নাকি খারাপ। বদলোকের উৎপাত আছে। তাই এত সতর্কতা।

ঠিক চারটের সময়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হাতী।

মাহুতকে জিজ্ঞেস করলেন স্যার ফ্রান্সিস— "থামলে কেন?"

"ঠিক বলতে পারছিনা" সভয়ে বললে পার্শী ছোকরা। "কারা যেন আসছে এদিকে।"

দূর থেকে ভেসে এল অনেকগুলো বাজনার আওয়াজ। সেই সঙ্গে করুণ গান। সব মিলিয়ে একটা অপার্থিব শব্দ লহরী।

গাছের গুঁড়িতে কিউনিকে বেঁধে ঝোপের মধ্যে গা মিলিয়ে এগিয়ে গেল মাহুত। ফিরে এল একটু পরেই।

বিস্ফারিত চোখে বললে—"ব্রাহ্মণদের মিছিল আসছে। পালান… পালান!"

কিউনিকে নিয়ে গহন অরণ্যে ঢুকে পড়ল মাহুত। জঙ্গলের মধ্যে এমন ভাবে লুকিয়ে রইল যেন দরকার হলেই হাতী ছোটাতে পারে। ইতর প্রাণী—বলা যায় না বৃংহিত ধ্বনি করে উঠতে পারে।

খঞ্জনী, করতাল ঢাক ঢোল, মৃদঙ্গ, কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়ে এগিয়ে আসছে শোভাযাত্রা। সেই সঙ্গে মনুষ্যকণ্ঠের নিনাদ। সব মিলিয়ে একটু বেসুরো তাললয়হীন জগঝম্প গোছের ব্যাপার।

শোভাযাত্রার পুরোভাগ দেখা গেল এবার। অদ্ভুত চেহারার পুরুষরা চলেছে দলবেঁধে। মাথায় পাগড়ী, গায়ে আলখাল্লা। তাদের ঘিরে করুণ কণ্ঠে শ্মশান সঙ্গীত গাইতে গাইতে চলেছে ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়িরা। খঞ্জনী আর করতালের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে মধ্যে মধ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছে শ্মশান সঙ্গীত।

পেছনে একটা রথ। রথের বড় বড় চাকার পাখিগুলো সাপের আকারে তৈরী। রথ টানছে চারটে প্রকাণ্ড ষাঁড়। মূল্যবান রশ্মিবলগা দিয়ে সাজানো তাদের সর্বাঙ্গ। রথের অধিষ্ঠাত্রী একজন চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি। অধরোষ্ঠ রক্তরাগে রঞ্জিত। দেবীমূর্তি বিলোলবসনা। আলুলায়িত কুন্তল মালা ছড়িয়ে আছে মেঘের রাশির মত। বক্ষে দুলছে নরমুণ্ডমালা। কটিদেশ ঘিরে ঝুলছে নরহস্ত। রুধির ঝরছে অধরের কোণ দিয়ে। বিরাটকায় এক পুরুষের বুকের ওপর খড়্গহস্তে দাঁড়িয়ে ভীমা ভয়ংকরী করালবদনা।

দেবীমূর্তি দেখেই চিনেছিলেন স্যার ফ্রান্সিস। ফিসফিস করে বললেন—'কালীমূর্তি। প্রেম ও মুক্তির প্রতিমা। কালীপুজোর মূল লক্ষ্য হল জড়ত্বের অবসান ও শক্তি চেতনার উন্মেষ।"

পাসপার্তু বলে উঠল "এতো দেখছি মরণের দেবী—প্রেমের তো নয়!"

মাহুতের ইঙ্গিতে মুখে কুলপ আঁটলেন সবাই।

প্রতিমা ঘিরে উন্মাদ নৃত্যে মেতেছে সন্ন্যাসীরা। ভস্মাচ্ছাদিত দেহে রক্ত ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা। রথের চাকার ওপর আছড়ে স্বেচ্ছায় যন্ত্রণা এবং আঘাত সহ্য করছে শক্তিসাধকরা।

এর পরেই দেখা গেল কয়েকজন ব্রাহ্মণকে। এদের পরনে বেশ চকচকে ঝকঝকে প্রাচ্য পোশাক। একটি মেয়েকে এরা ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। এক এক পা চলছে—পরক্ষণেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে মেয়েটি।

মেয়েটি যুবতী। ইউরোপীয়দের মত গৌরবর্ণ। মূল্যবান জড়োয়া গয়নায় শোভিত সর্বাঙ্গ। পরনে সোনার কাজ করা পরিধেয়। সূক্ষ্ম মসলিনের দেহাবরণ ভেদ করে দেখা যাচ্ছে তার রূপলাবণ্য।

সুন্দরী রমণীর ঠিক পেছনেই একটা শিবিকা কাঁধে আসছে একদল বিকট-বদন রক্ষী। এদের কোমরে খাপহীন তরবারি আর পিস্তল।

শিবিকায় শায়িত একটি শবদেহ। বৃদ্ধের মৃতদেহ। রাজোচিত বেশভূষায় আচ্ছাদিত। মাথায় মুক্তাখচিত উষ্ণীষ। গায়ে সোনা আর রেশমের কাজ করা অঙ্গাবরন। হীরক খচিত কাশ্মিরী শাল বাঁধা কোমরে। পাশে রাখা হিন্দুরাজাদের সুন্দর সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র।

শিবিকার পেছনে বাজিয়েদের দল। সবার পেছনে উন্মত্তের মত তাণ্ডব নৃত্য করছে সাধুর দল। এদের চীৎকারে গানবাজনার আওয়াজও মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছে।

বিমর্ষমুখে শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়েছিলেন স্যার ফ্রান্সিস। এখন মাহুতকে বললেন—"সতী।"

ঘাড় নেড়ে সায় দিল মাহুত। তক্ষুনি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা বলতে মানা করল জেনারেলকে। ধীরে ধীরে গাছের তলা দিয়ে দূরে অপসৃত হল হট্টগোলময় মিছিলের পশ্চাদভাগ। তারও খানিক পরে মিলিয়ে গেল বেসুরো বেতাল গান বাজনা। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল আকাশ ফাটা হুংকার—কিছুক্ষণ পরে তাও গ্রাস করল অরণ্যের স্তব্ধতা।

স্যার ফ্রান্সিসের কথা ফিলিয়াস ফগের কানে গিয়েছিল। মিছিল মিলিয়ে যেতেই শুধোলেন "সতী কী?"

জেনারেল বললেন "সতী হল এক ধরনের নরবলি। কিন্তু বিধবা মেয়েরা আহুতি দেয় নিজেদের মৃত স্বামীদের জলন্ত চিতায়। এই যে সদ্য বিধবা মেয়েটিকে আপনি দেখলেন, একে কাল ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত দাহ করা হবে!"

"একী বদমাসি!" চীৎকার করে উঠল পাসপার্তু।

"মৃতদেহটা কার?" ফগের প্রশ্ন।

"মেয়েটির স্বামী—বুন্দেলখণ্ডের এক স্বাধীন রাজা," জবাব দিল মাহুত।

ফিলিয়াস ফগের গলায় এতটুকু আবেগ বা উচ্ছ্বাস দেখা গেল না। সহজ গলায় বললেন—"বৃটিশরাজত্বে এখনো এই বর্বর প্রথা চালু রয়েছে?"

স্যার ফ্রান্সিস বললেন—"ভারতবর্ষের সবজায়গায় সতীদাহ প্রথা নেই। এ-অঞ্চলে আছে। কেন না, বিন্ধ্যপর্বতের ধারে কাছে এত দুর্দান্ত লোকের আড্ডা, যে বৃটিশ শাসন তাদের এখনো পুরোপুরি শায়েস্তা করতে পারেনি।"

"আহারে! জ্যান্ত পুড়ে মরবে!" আক্ষেপ করল পাসপার্তু।

"না পুড়ে মরলেও তো বিপদ," বললেন জেনারেল। "সমাজে সে একঘরে হবে। মাথা কামিয়ে দেওয়া হবে, দিনান্তে এক মুঠো চাল খেতে দেওয়া হবে, কুত্তার মত এককোণে থেকে অযত্নে মারা পড়বে। সেই ভয়েই হতভাগিনীরা চিতায় ঝাঁপিয়ে সব জ্বালা জুড়োয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে। অনেক ক্ষেত্রে বিধবারা স্বেচ্ছায় সহমরণে যায় পুণ্যের লোভে। সরকার বাধা না দিলে এই কুপ্রথার অবসান অসম্ভব। বছর কয়েক আগে বোম্বাইতে গভর্ণরের অনুমতি চেয়েছিল একজন সদ্য বিধবা। জলন্ত চিতায় উঠতে চায় শুনেই

থেকে বললেন গভর্ণর। মেয়েটি তখন এক স্বাধীন রাজার আশ্রয় নিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিল জলন্ত চিতায়।”

স্যার ফ্রান্সিসের কথা শুনতে শুনতে ঘাড় নাড়ছিল মাহুত। কথা শেষ হতেই বললে—“কিন্তু এই সহমরণ স্বেচ্ছায় হচ্ছে না।”

“তুমি কি করে জানলে?”

“বুন্দেলখণ্ডের সবাই জানে।”

“কিন্তু বিধবা মেয়েটিকে তো বাধা দিতে দেখলাম না।”

“কি করে দেবেন বলুন। ভাঙ আর আফিংয়ের ধোঁয়ায় কি আর নিজের মধ্যে আছেন উনি? নেশায় পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছে পুরুতরা।”

“মেয়েটিকে নিয়ে গেল কোথায়?”

“পিল্লাজীর মন্দিরে—এখান থেকে দুমাইল দূরে। রাত কাটাবে সেইখানে।”

“বলিদানটা হবে কখন?”

“কাল ভোরের আলো ফুটলেই।”

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কিউনি। মুখে শিটি বাজিয়ে মাহুত তাকে সামনে ছোটাতে যাচ্ছে, এমন সময়ে বাধা দিলেন মিস্টার ফগ। স্যার ফ্রান্সিসের দিকে ফিরে বললেন—“মেয়েটিকে বাঁচালে কেমন হয়?”

“বাঁচাবেন?”

“হাতে এখনো বারো ঘণ্টা সময় রয়েছে। হতভাগিনীকে উদ্ধার করার জন্যে সময়টা খরচ করতে পারি।”

“মিস্টার ফগ! আপনারও হৃদয় আছে?”

“আছে।” প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন ফগ। “হাতে সময় থাকলেই থাকে।”

১৩॥ পাসপার্তু প্রমাণ করল ডানপিটেরাই ভাগ্যবান হয়

ব্যাপারটা খুবই গুরুতর, সঙ্কটের কণ্টকে আকীর্ণ। অসম্ভব বললেও চলে। মিস্টার ফগ সব জেনেশুনেও নিজের জীবন বিপন্ন করতে চলেছেন। স্বাধীনতাও হারাতে পারেন—হয়ত যাবজ্জীবন বন্দীদশায় কাটাতে পারে। সবার ওপর আছে তাঁর বাজীজেতার ব্যাপার। কোনো কারণে বিলম্ব ঘটলেই বিশহাজার পাউণ্ড হারবেন।

কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন মানল না। কোনো দ্বিধা আপত্তিকে মনের মধ্যে উঁকি মারতেও দিলেন না। বিশেষ করে সঙ্গে স্যার ফ্রান্সিসের মত ক্ষমতাবান সহযোগী রয়েছে যখন, তখন অত তোয়াক্কা কিসের?

পাসপার্তু? সে তো এক পায়ে খাড়া মনিবকে সেবা করার জন্যে। মনিবের ইচ্ছে মানে তারও ইচ্ছে। আর এক্ষেত্রে মনিবের ইচ্ছেটা এমনই মানবিক যে সে অভিভূত হয়ে পড়েছে। ফিলিয়াস ফগের তুহিনশীতল বাইরেটা দেখে কিছুই বোঝা যায় না। যে ভেতরে একটা মানুষের হৃদয় আছে, পিঞ্জরের অন্তরালে একটা সংবেদনশীল অন্তর আছে। ফিলিয়াস ফগকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করল পাসপার্তু।

বিপদ কেবল গাইডকে নিয়ে। মাহুতের মতিগতিটা আগে জেনে নেওয়া দরকার। সে যদি দেশ ভাইদের দলে যায়, তাহলেই মুস্কিল।

স্যার ফ্রান্সিস খোলাখুলি তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

মাহুত বললে—'সাহেবরা তো জানেন আমি পার্শী। যে ভদ্রমহিলাকে দাহ করা হবে, উনিও পার্শী। সুতরাং যা হুকুম করবেন, তামিল করব।"

"চমৎকার।" বললেন মিস্টার ফগ।

মাহুত তখন বলল "যদি ধরা পড়ি, তাহলে হয় প্রাণে মরতে হবে। নয়তো অকথ্য অত্যাচারের মধ্যে দিন কাটাতে হবে।"

"সেটা আমার হিসেবের মধ্যে আছে," বললেন মিস্টার ফগ। "রাতের অন্ধকার না নামা পর্যন্ত সবুর করা যাক।"

"যা বলেন," বলল মাহুত।

হতভাগিনী বিধবা সম্পর্কে অনেক কথাই এরপর বলল মাহুত। পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়েটির রূপের খ্যাতি ছিল। অমন ডাকসাইটে রূপসী নাকি বড় একটা দেখা যায় না। বোম্বাইয়ের এক ধনকুবের ব্যবসায়ীর মেয়ে তিনি। লেখাপড়া শিখেছেন বোম্বাই শহরেই। শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি, আদবকায়দা এবং সর্বোপরি ওঁর রূপ—সবই ইউরোপীয় মেয়েদের মত। ভারতীয় বলে বোঝা যায় না। মেয়েটির নাম আউদা। ভাগ্যচক্রে বুন্দেলখণ্ডের এক বুড়ো রাজার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় ভদ্রমহিলার। পরিণামটা যে জীবন্ত পুড়ে মরা, তা জেনেই পালানোর চেষ্টা করেছিলেন রাণী আউদা। কিন্তু রাজার আত্মীয়স্বজনেরা ধরে ফেলেন এবং নজরবন্দী রাখেন। রাণী আউদাকে পুড়িয়ে মারলে তাদের সুবিধে অনেক।

মাহুতের কথা শুনে দুই ইংরেজ ভদ্রলোকের উদার সংকল্প আরো দৃঢ় হল। সাহেবদের হুকুমে হাতী নিয়ে পিল্লাজী মন্দিরের পাঁচশ ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়াল মাহুত। ঘন ঝোপ পুরোপুরি ঢেকে রইল ওঁদের। গাছপাতার আড়াল থেকে মধ্যে মধ্যে শোনা গেল শৈব তান্ত্রিকদের উন্মত্ত চীৎকার।

শলাপরামর্শ করে ঠিক হল, রাত হলেই মন্দিরের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে

আনতে হবে রাণী আউদাকে। তখন নিশ্চয় রক্ষী আর তান্ত্রিকরা ঝিমোতে থাকবে। পাহারা শিথিল হবে। মাহুত পিল্লাজী মন্দিরের গলিঘুঁজি চেনে। কোনো অসুবিধে হবে না। তবে ভোর হওয়ার আগেই কাজ সারতে হবে। তারপর আর কোনক্রমেই রক্ষা করা যাবে না তাকে।

সন্ধ্যে ছটায় অন্ধকার হল চারদিক। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের উচ্চনিনাদ নিস্তেজ হয়ে আসছে। খুব সম্ভব সিদ্ধির ঘোরে ঢুলুনি শুরু হয়েছে।

মাহুতের পেছন পেছন চুপিসাড়ে মিনিট দশেকের মধ্যে বনের কিনারায় এল তিনজনে। ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনী। তীরে কাঠের চিতা সাজানো। চিতায় শায়িত বৃদ্ধ রাজার চন্দনচর্চিত মৃতদেহ। ভোর হলেই পাশে শোয়ানো হবে রাণী আউদাকে। দাউ দাউ করে জ্বলবে চিতা।

রজন, ধুলো, কাঠের মশাল জ্বালিয়ে নববালব প্রস্তুতিপট দেখলেন মিস্টার নগ বরফ-ঠাণ্ডা চোখে। দূরে ঘনায়মান অন্ধকারে দেখা গেল পিল্লাজী মন্দিরের চূড়া।

মার্জারের মত নিঃশব্দ চরণে মাহুতের পেছন পেছন রওনা হলেন তিন জনে। বড় বড় ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে দেখলেন অদূরে মন্দিরের সামনে সারি সারি শুয়ে ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ির। সন্ন্যাসীরা সিদ্ধির নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমে অচেতন।

কিন্তু হায়রে পোড়া কপাল। মন্দিরের দরজায় উলঙ্গ-কৃপাণ হাতে দৃঢ় পদক্ষেপে পায়চারী করছে বিকট দর্শন রাজরক্ষীরা। কে জানে, হয়ত মন্দিরের ভেতরে খুনে পুরুৎগুলো জেগে বসে আছে।

না! এ পথে অসম্ভব। আস্তে আস্তে পেছিয়ে এলেন চারজনে।

ফিসফিস করে বললেন পাসপার্তু—"এখন তো মোটে আটটা। আর কিছুক্ষণ পরে পাহারাদারগুলোও ঘুমে নেতিয়ে পড়বে'খন।"

"আশ্চর্য নয়।" বলল পার্শী ছোকরা।

আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ঠায় একটা গাছের তলায় বসে রইলেন দুঃসাহসী চার ব্যক্তি। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে মাহুত দেখে এল রক্ষীদের চোখে ঘুম নেমেছে কিনা দেখতে। প্রতিবারেই ফিরে এসে বললে একই কথা—বীরদর্পে মন্দিরের দরজা পাহারা দিচ্ছে ওরা।

মাঝরাতে ফের শুরু হল শলাপরামর্শ! ভাব-গতিক দেখে মনে হচ্ছে, সারারাত এমনি ভাবে পাহারা দেবে রক্ষীরা। সুতরাং খামোকা সময় নষ্ট না করে মন্দিরের পেছনে গিয়ে সিঁধ কেটে ভেতরে ঢোকা যাক।

মাহুতের পেছন পেছন আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছোনো গেল মন্দিরের পেছনে। এদিকে কোনো পাহারাদার নেই। কোনো গবাক্ষ বা বাতায়নও নেই! নিশ্চিন্ত মনে সিঁধ কাটা যাবে'খন। যন্ত্রের মধ্যে অবশ্য কয়েকটা পকেট-ছুরী। কিন্তু ইঁটের গাথনির একটা ইঁট কোন মতে খসাতে পারলেই বাকী ইঁট সহজেই খুলে আসবে।

শুরু হল সিঁধ কাটা। প্রথম ইঁটটা খসবার পর ঝপাঝপ ইঁট খুলে আসতে লাগল দু'ফুট বড একটা ফোকরের মধ্যে থেকে। কাজ এগিয়েছে অনেকটা। এমন সময়ে একটা চীৎকার শোনা গেল।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল মন্দিরের মধ্যে। চেঁচিয়ে কারা সাড়া দিল মন্দিরের বাইরে থেকে।

কাঠ হয়ে বসে রইলেন চারজনে। কী সর্বনাশ! ওরা টের পেয়েছে নাকি?

ঝটিতি জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিলেন চারজনে। কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন রক্ষী খোলা কৃপাণ হাতে টহল দিতে লাগল মন্দিরের পেছনে।

হয়ে গেল! শেষ আশাটাও নিভে গেল! রানী আউদা'কে উদ্ধার করার আশায় এখন জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। নিষ্ফল আক্রোশে শূন্যে ঘুসি ছুঁড়তে লাগলেন স্যার ফান্সিস। কোনো মতে ধৈর্য ধরে রইল পাসপার্তু,•মাহুত দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল প্রচণ্ড রাগে। প্রশান্ত রইলেন কেবল একজনই—মিস্টার ফগ। আবেগ উচ্ছ্বাস ক্রোধ হতাশার বাষ্পটুকুও দেখা গেল না তাঁর অবিচল মূর্তিতে।

কানে কানে বললেন স্যার ফ্রান্সিস—"আর কী, এবার হাতীর পিঠে ফের চড়া যাক। আমরা হেরে গেছি।"

"এখনো হারিনি।" শান্ত-কণ্ঠ মিস্টার ফগের। "কাল দুপুর নাগাদ এলাহাবাদ পৌঁছোলেই চলবে।"

"কিন্তু আর ক'ঘণ্টা পরেই তো ভোর হবে।"

"শেষ মুহূর্তে একটা না একটা সুযোগ আসবেই।"

কি ফন্দী আঁটছেন ফিলিয়াস ফগ নামক চলন্ত মেশিন? গায়ের জোরে ছিনিয়ে আনবেন রানী আউদাকে? কিন্তু ফিলিয়াস ফগ তো অমন আহাম্মক নন! ভেবে কূল-কিনারা না পেয়ে স্যার ফ্রান্সিস ঠিক করলেন ভয়ংকর নাটকটার শেষ দৃশ্য পর্যন্ত দেখে যাওয়া যাক।

ইতিমধ্যে পাসপার্তুর মাথায় একটা অভিনব মতলব উঁকি দিল। ফন্দীটা বিদ্যুৎচমকের মত মস্তিষ্কের কোষগুলিকে ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। হতবুদ্ধি হয়ে গাছের নীচু ডালে বসে রইল পাসপার্তু।

কি করবে সে? মতলব মাফিক ঝুঁকি নেবে? না নিলেই বা উপায় কি? মনিবের ইচ্ছে যখন রানী আউদাকে উদ্ধার করার। তখন—

মুচকি হেসে নীচু ডাল ডেকে সড়াৎ করে নেমে এল পাসপার্তু মিশে গেল জঙ্গলের অন্ধকারে।

ভোর হল।

অন্ধকার থাকতেই মাহুতের দেখানো পথে চিতাকুণ্ড থেকে অদূরে এসে ঘাপটি মেরে ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস এবং মিস্টার ফগ।

ঊষার প্রথম আলো দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। অন্ধকার আর আলো মিলে মিশে থমথমে রহস্যে আবৃত রেখেছে দিকদিগন্ত। আলো আর আঁধারের এই সন্ধিক্ষণই নারীবলির মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছিল।

ঘুম ভেঙেছে মন্দিরের সামনে শায়িত জনসাধারণের। তাদের চীৎকার, ঢাকঢোল শাঁখ ঘণ্টার আওয়াজ বনভূমিকে কাঁপিয়ে তুলল মিনিট কয়েকের মধ্যে।

সময় হয়েছে। জ্বলন্ত চিতায় অনিচ্ছায় এক সতীকে বলি দেওয়ার সময় হয়েছে।

আচম্বিতে খুলে গেল মন্দিরের দরজা। ভেতরের তীব্র আলো এসে পড়ল বাইরে। দুজন পুরুত দুপাশ থেকে ধরে নিয়ে এল রানী আউদাকে।

গতকালের মত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না মরণপথগামিনী মহিলা। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন। আফিং আর ভাঙের নেশা বোধহয় কেটে এসেছে —তাই পালানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে।

উত্তাল হল স্যার ফ্রান্সিসের হৃদপিণ্ড। বিষম উত্তেজিত হয়ে খামচে ধরলেন ফগের ডান হাত - সে হাতে ধরা একটা খোলা ছুরী।

জনতা এগোচ্ছে। আফিং আর ভাঙের ধোঁয়ায় আবার আচ্ছন্ন হয়ে আসছেন রানী আউদা। তান্ত্রিকরা বিকট চীৎকার করে ঘিরে ধরেছে তাঁকে। এ চীৎকার নিছক হুংকার নয়—দেবীর আবাহন।

মিছিলের পেছনে মিশে গেলেন ফিলিয়াস ফগেরা। দু মিনিট পরেই আসা গেল স্রোতস্বিনীর পাড়ে সাজানো চিতার সামনে। পঞ্চাশ হাত দূরে আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধ রাজা অন্তিম শয্যায় শয়ান। রানী আউদাকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁর পাশে। আগুন লাগানো হল চিতায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফিলিয়াস ফগকে দু পাশ থেকে চেপে ধরলেন স্যার ফ্রান্সিস এবং মাহুত। শান্ত যন্ত্রবৎ মানুষটা নিমেষ মধ্যে উন্মাদ হয়ে গেছেন

মানবিক প্রেরণায়—ছুরী হাতে ধেয়ে যাচ্ছেন প্রজ্জ্বলিত চিতার দিকে। তাঁর দু হাতের ধাক্কায় দু পাশে ছিটকে পড়লেন স্যার ফ্রান্সিস এবং মাহুত।

সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল যেন। মুহূর্ত মধ্যে পট পালটে গেল। আতংক ঘন চীৎকারের পর চীৎকারে শিউরে উঠল আকাশ বাতাস। মিছিলে যারা ছিল তারা প্রত্যেকে নিঃসীম ভয়ে সটান আছড়ে পড়ল মাটির ওপর।

চিতার ওপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছেন বিগতপ্রাণ বৃদ্ধ রাজা। মৃত্যুলোক যেন শরীরী প্রেত হয়ে তিনি ফিরে এলেন। ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে দিয়ে শুধু দেখা গেল একটা মূর্তিমান অপচ্ছায়া সটান দাঁড়িয়ে উঠেছে চিতার ওপর। তার মাথায় রত্নখচিত উষ্ণীষ, পরনে মূল্যবান রাজবেশ এবং দু বাহুর ওপর শায়িত সংজ্ঞাহীনা স্ত্রী—রানী আউদা!

চকিতের মধ্যে সীমাহীন আতংকে সব বীরত্ব উবে গেল নৃত্যশীল তান্ত্রিক এবং কৃপাণহস্ত রক্ষীদের। মাটিতে মুখ লুকিয়ে বসে পড়ল সকলে। শরীরী বিভীষিকার পানে ফিরে তাকানোর সাহস পর্যন্ত রইল না!

এই তো সুযোগ! তিনলাফে চিতা থেকে লাফিয়ে নামল প্রেতমূর্তি। রানীকে বুকে নিয়ে দৌড়ে এল স্যার ফ্রান্সিস এবং মিস্টার ফগের সামনে।

বলল রুদ্ধশ্বাসে—"দৌড়োন! জলদি!"

পাসপার্তু! দানোয় পাওয়া রাজার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে এই মাত্র ফিরে এল সে! ধোঁয়া, আলো আঁধারি আর আগুনের মায়াজালের সুযোগ নিয়ে ছিনিয়ে আনল রানী আউদাকে যমের কবল থেকে! আতংকে অবশ জনতার মাথা টপকে এসে হাজিরা দিয়েছে মনিবের সামনে!

মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলে গা-ঢাকা দিলেন চারজনে—পাসপার্তুর কাঁধের ওপর রানী আউদা। হাতীতে উঠে বসতেই মাটি কাঁপিয়ে ছুটল কিউনি।

আচম্বিতে সোরগোল শোনা গেল পেছনে। ভাওতাবাজি ধরা পড়েছে এতক্ষণে। পিস্তল নির্ঘোষ শোনা গেল। একটা বুলেট ফিলিয়াস ফগের টুপী ফুটো করে বেরিয়ে এল।

সাবাস কিউনি! দুপদাপ করে ঝোপঝাড় ভেঙ্গে ছুটল নক্ষত্রবেগে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আর তীর ছুটে এল পলাতকদের লক্ষ্য করে—কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নাগালের বাইরে চলে গেল কিউনি।

১৪॥ গঙ্গার অববাহিকা বরাবর এলেন ফিলিয়াস ফগ

মস্ত একটা কাজ মিটল। জীবন পণ করে এগুনো সার্থক হল। ঝাড়া একটি ঘণ্টা কেবল হা-হা-হি-হি-হো-হো করে হেসেই গেল পাসপার্তু। স্যার

ফ্রান্সিস তার দু হাত জড়িয়ে ধরেছেন, কর্তামশায়ের মত কম কথার মানুষও বলেছেন—"সাবাস!" আর কী চাই? মজা তো মন্দ হয় নি। কিছুক্ষণের জন্যেও অন্ততঃ পরমা সুন্দরী রানী আউদার পতিদেবতায় পর্যবসিত হয়েছিল জাঁ পাসপার্তু—এককালের মল্লবীর, দমকলের সার্জেন্ট!

রানী আউদা অবশ্য এত কাণ্ডকারখানার কিছুই জানতে পারেন নি। তিনি তখনো মাদক দ্রব্যের ক্রিয়ায় পুরোপুরি বেহুঁস। কম্বল মোড়া অবস্থায় নেতিয়ে পড়ে আছেন হাওদার মধ্যে।

হাতী দিব্বি ছুটেছে ওস্তাদ মাহুতের নির্দেশে। জঙ্গলের মধ্যে তখনো বেশ অন্ধকার। কিন্তু তার মধ্যেই পথ করে নিচ্ছে কিউনি। সাতটা নাগাদ নিরাপদ ব্যবধানে এসে খানিক জিরিয়ে নেওয়া গেল। রানী আউদা তখনো অচৈতন্য। ভাঙের নেশা কি বস্তু, তা জানেন স্যার ফ্রান্সিস। সুতরাং তিনি ঘাবড়ালেন না। তাঁর যত চিন্তা দেখা গেল রূপসী মেয়েটির ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভারতবর্ষের মধ্যে থাকলে রেহাই পাবেন না ভদ্রমহিলা। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ—যেখানেই থাকুন না কেন, ধর্মোন্মাদ কুচক্রীরা ওঁকে টেনে নিয়ে যাবে চিতায় তোলবার জন্যে। বৃটিশ আইন বা পুলিশ তাঁকে বাঁচাতে পারবে না। অতীতে এ রকম কাণ্ড বহুবার ঘটেছে বিরাট এই উপমহাদেশে। পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল ভারতবর্ষের বাইরে পলায়ন।

বিষয়টা নিয়ে পরে ভাবা যাবে 'খন, জানালেন ফগ।

বেলা দশটায় এলাহাবাদ পৌঁছোলো কিউনি। বারোটায় কলকাতার ট্রেন ছাড়ছে। ওয়েটিংরুমে সংজ্ঞাহীনা রূপসীকে রেখে মিস্টার ফগ পাসপার্তুকে হুকুম দিলেন বিধবা রাণীর জন্যে কিছু জামাকাপড়, প্রসাধন সামগ্রী ঝটপট কিনে আনতে। সে বেচারী এলাহাবাদের পথেঘাটে হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ ঘুরল। লণ্ডনের রিজেন্ট স্ট্রীটের মত কোনো বাজার দেখতে না পেয়ে অবশেষে কিছু পুরোনো জিনিস পঁচাত্তর পাউণ্ডের বিনিময়ে কিনে দৌড়োতে দৌড়োতে ফিরল স্টেশনে।

ট্রেন রওনা হতে আর দেরী নেই। গাইডকে চুক্তিমত পাওনা গণ্ডা বুঝিয়ে দিলেন মিস্টার ফগ। তার কানাকড়িও বেশী দিলেন না। দেখে তো পাসপার্তু অবাক। কি রকম মনিব তার? যার জন্যে প্রাণ নিয়ে ফেরা, তাকে কোনো বাড়তি বকশিস দেওয়ার নামগন্ধ নেই?

ফিলিয়াস ফগ বললেন—"মাহুত, এই কদিনে তোমার কাজের পরিচয় পেয়েছি, তোমার আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয়ও পেয়েছি। কাজের দাম দিলাম।

আন্তরিক নিষ্ঠায় ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না। এই হাতীটা তুমি নিলে বড় খুশী হই।"

মাহুত তো অবাক! তারপর অভিভূত কণ্ঠে বললে—"সাহেব আপনি আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিলেন!"

"কিউনি এখন থেকে তোমার!" বললেন ফগ। "তবুও জেনো আমি ঋণ শোধ করতে পারলাম না।"

পাসপার্তু আনন্দে আটখানা হয়ে তখুনি কয়েক ডেলা চিনি খাইয়ে দিল কিউনিকে। কিউনিও আহ্লাদে গদগদ হয়ে শুঁড়ে জড়িয়ে শূন্যে তুলে ফেলল পাসপার্তুকে। তাতে অবশ্য ভয় পেল না ফরাসী মল্লবীর। কিছুক্ষণ পরে তাকে সন্তর্পনে মাটিতে নামিয়ে দিল কিউনি।

চলন্ত কামরায় বসলেন যাত্রীরা—সঙ্গে রাণী আউদা। এতক্ষণে ভদ্রমহিলার হুঁস ফিরেছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছেন না সহৃদয় কয়েকজন ইউরোপীযের সঙ্গে কোথায় চলেছেন তিনি। এই সময়ে তাঁর অবশিষ্ট ঘোর কাটানোর জন্যে এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি পান করানো হল। তারপর লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের বৃত্তান্ত খুলে বললেন স্যার ফ্রান্সিস। ফিলিয়াস ফগ জীবনপণ করে দুঃসাহসী না হলে এবং শেষ মুহূর্তে জ্বলন্ত চিতার মধ্যে থেকে জীবন্ত রাণীকে তুলে আনার উদ্ভট ফন্দী না আঁটলে রাণী আউদা এতক্ষণে পরলোকের পথে রওনা হয়ে যেতেন। আগাগোড়া ফিলিয়াস ফগ একটি কথাও বললেন না। আর পাসপার্তু লাল মুখ আরো লাল করে কেবলি বলতে লাগল—"কি আর এমন করেছি। এ-নিয়ে ফলাও করে বলার কি দরকার!"

রাণী আউদা সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে অবশ্য ক্ষণপরেই ভেসে উঠল নিঃসীম আতংক—ভবিষ্যৎ ভেবে শিহরিত হচ্ছেন রাণী।

ফিলিয়াস ফগ যেন অন্তর্যামী। রাণীকে অভয় দিলেন। বললেন, আপত্তি না থাকলে রাণী তাঁর সঙ্গে হংকং যেতে পারেন। রাজী হলেন রানী। তাঁর এক নিকটাত্মীয় সেখানকার বড় ব্যবসায়ী। তাঁর কাছেই আশ্রয় মিলবে'খন।

সাড়ে বারোটার সময়ে ট্রেন পৌছোলো বেনারসে। স্যার ফ্রান্সিস নেমে গেলেন। যাবার সময়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন ফিলিয়াস ফগকে। পরের বার যেন তিনি এত লোকসান দিয়ে এতখানি অভিনব পথে না আসেন।

পরের দিন সকাল সাতটায় কলকাতা পৌছোলেন মিস্টার। হংকংগামী জাহাজ ছাড়ছে বেলা বারোটায়। রোজনামচায় লিখলেন তিনি, সময় মত এগুনো যাচ্ছে। লণ্ডন থেকে বোম্বাই আসার সময়ে দুটো দিন বাঁচানো

গিয়েছিল। তা ভারতবর্ষ পেরোতেই বাড়তি খরচ হয়েছে। তা হোক। ফিলিয়াস ফগের কোনো আক্ষেপ নেই সে জন্যে।

১৫ ॥ আরো কিছু নোট খসল

প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকতেই কামরা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল পাসপার্তু। ফিলিয়াস ফগ সুন্দরী সঙ্গিনীকে হাত ধরে নামালেন। ওঁর ইচ্ছে স্টেশন থেকে সটান জাহাজ ঘাটায় গিয়ে রাণী আউদার জন্যে হংকংগামী জাহাজে ভাল কেবিনের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া, মাথার ওপর বিপদের খাঁড়া নিয়ে ভারতভূমিতে উনি রাণীকে একলা ছেড়ে দিতেও নারাজ।

স্টেশন থেকে বেরোতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে একজন পুলিশ অফিসার সামনে এসে দাঁড়াল।

"আপনি মিস্টার ফিলিয়াস ফগ?"

"হ্যাঁ।"

"এই কি আপনার চাকর?" পাসপার্তুকে দেখিয়ে শুধোলো অফিসার।

"হ্যাঁ।"

"দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।"

ফিলিয়াস ফগের চোখে মুখে কথায় তিল মাত্র বিস্ময় প্রকাশ পেল না। তিনি ইংরেজ। ইংরেজরা কানুনকে মাথায় রাখে, আইনকে পবিত্রজ্ঞান করে। পাসপার্তু প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল, কিন্তু কাঁধের ওপর পুলিশী-রুলের টোকা পড়তেই চুপ মেরে গেল। তার মনিবও তাকে নিরস্ত করলেন।

মিস্টার ফগ শুধোলেন—এই ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন?"

"অনায়াসে।"

দুঘোড়ায় টানা একটা চার চাকার পাল্কীগাড়ীতে চেপে বসলেন সবাই। ঘিঞ্জি এলাকা ছাড়িয়ে এল গাড়ী। এর পর সাহেবদের পাড়া। দিব্বি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংলোবাড়ী। নারকেল গাছ দিয়ে ঘেরা। অত সকালে উর্দিপরা কোচোয়ানরা গাড়ী হাঁকাচ্ছে রাস্তার ওপর।

একটা সরকারী ভবনের সামনে গাড়ী দাঁড়াল। মোটাসোটা গরাদ দেওয়া জানলাওলা একটা ঘরের মধ্যে মিস্টার ফগদের ঢুকিয়ে দিয়ে অফিসার বললে—"সাড়ে আটটার সময়ে আপনার বিচার হবে।" বলার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হল সশব্দে।

ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল পাসপার্তু—"একী হল! আমরা যে কয়েদ হলাম!"

আঁউদা ধরা গলায় বলল মিস্টার ফগকে—"আমাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিন। আমার জন্যেই আপনাদের এই অবস্থা।"

সংক্ষেপে ফিলিয়াস ফগ জানালেন, তা হয় না। সতীদাহ রোধ করেছেন বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। নিশ্চয় কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তবে যাই হোক না কেন, রাণী আউদাকে হংকং পর্যন্ত উনি নিয়ে যাবেনই।

"কিন্তু জাহাজ তো বারোটায় ছাড়ছে!" ঘাড়ে গিয়ে চাৎকার করে উঠল পাসপার্তু।

"আমরা বারোটার সময়ে জাহাজে উঠব।" নির্বিকার গলায় জবাব দিলেন মিস্টার ফগ।

সাড়ে আটটার সময়ে খুপরির দরজা হাট হল। মিস্টার ফগদের নিয়ে যাওয়া হল আদালত কক্ষে। কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন মিস্টার ফগ, পাশে পাসপার্তু।

বিচারপতি প্রবেশ করলেন আদালত কক্ষে। বহু ইংরেজ আর স্থানীয় বাসিন্দারা বসে আছেন চেয়ারে। বিচারপতি ডাক দিলেন পয়লা মোকদ্দমার।

"আসামী ফিলিয়াস ফগ হাজির?" হাঁক দিল পেশকার।

"হাজির।"

"পাসপার্তু?"

"হ্যাঁ, হাজির।"

বিচারপতি মুখ খুললেন এবার—"আজ দুদিন ধরে আপনাদের পথ চেয়ে আছি।"

"আমাদের অপরাধ?" পাসপার্তু অধৈর্যভাবে শুধোলো।

"এখনই জানা যাবে।"

"ধর্মাবতার" বললেন মিস্টার ফগ। "আমি বৃটিশ প্রজা। আমার অধিকার আছে—"

"আপনার সঙ্গে কেউ দুর্ব্যবহার করেছে কি?"

"না।"

"তবে আর কি। বাদীদের আসতে বলো।"

হাকিমের হুকুম পেতেই তিনজন পুরুৎকে হাজির করা হল বিচারালয়ে।

"আরে গেল যা!" বিড়বিড় করে উঠল পাসপার্তু। "এই বদমাসগুলোই রাণীকে পুড়িয়ে মারতে গিয়েছিল না?"

হাকিমের সামনে আসন গ্রহণ করল তিন পুরোহিত। উচ্চকণ্ঠে অপরাধের বিবরণ পড়ে শোনালো পেশকার। হিন্দুদের পবিত্র মন্দির অপবিত্র করার অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন মিস্টার ফগ এবং তাঁর ভৃত্য।

ফগকে শুধোলেন বিচারক—"আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণ শুনলেন?"

পকেট ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ফগ বললেন—"শুনলাম। অপরাধ স্বীকার করছি।"

"স্বীকার করছেন?"

"করছি বই কি। পিল্লাজীর মন্দিরে এই পুরোহিতরা কি কাণ্ড করেছিল, তা শোনার জন্যেও ব্যস্ত রয়েছি।"

মুখ চাওয়া চাওয়ি করল পুরুৎরা। কিসের কথা বলছেন ফিলিয়াস ফগ?

তেড়ে উঠল পাসপার্তু—"পিল্লাজীর মন্দিরে এরাই তো একজনকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল।"

শুনে তো পুরুৎরা হাঁ হয়ে গেল! কারো মুখে আর কথাটি নেই। বিচারপতি নিজেও কিংকর্তব্যবিমঢ় হয়ে গিয়েছিলেন।

শুধোলেন—"কাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল? বোম্বাইতে?"

"বোম্বাইতে!" এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়ার পালা পাসপার্তুর।

"পিল্লাজীর মন্দিরের কথা এখানে আসছে কেন? আমরা বলছি মালাবার হিলের মন্দিরের কথা।"

পেশকার বলল—"মন্দির যে অপবিত্র করা হয়েছে, তার প্রমাণ হাজির।" বলে এক জোড়া বুট জুতো রাখল টেবিলের ওপর।

"আমার জুতো! আমার জুতো!" দারুণ উত্তেজনায় বেফাঁস চীৎকারে অপরাধ কবুল করে বসল পাসপার্তু।

মনিব আর ভৃত্যের তখনকার মনের অবস্থাটা অনুমান করা কঠিন হবে না। যে অপরাধে তাদের এত নাজেহাল, সে-ঘটনা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিলেন দুজনেই।

গোয়েন্দা ফিক্স ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন। পাসপার্তুর অপকর্ম তার মাথায় নয়া ফন্দী এনে দিয়েছিল। তাই বারো ঘণ্টা পরে বোম্বাই ছেড়ে রওনা হয়ে ছিলেন তিনি। এই বারোঘণ্টার মধ্যে মালাবার হিলের মন্দিরে গিয়ে ক্ষুব্ধ পুরুৎদের জপাতে হয়েছে। মোটা জরিমানা আদায় করে দেবেন, এই

প্রলোভন দেখিয়ে তিনজন পুরোহিতকে পরের ট্রেনেই কলকাতা আনিয়েছেন। এদিকে মাঝরাস্তায় রানী আউদার উদ্ধারকার্য নিয়ে আটকে গিয়েছিলেন ফিলিয়াস ফগ। কাজেই পুরোহিতরা ভারতবর্ষের রাজধানীতে পৌঁছেছে তাঁর আগেই। ম্যাজিস্ট্রেট হুলিয়া বার করেছেন—কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন গ্রেপ্তার করা হয় ফিলিয়াস ফগ এবং তাঁর ভৃত্যকে।

এদিকে পাত্তা নেই আসামী দুজনের। মহা দুশ্চিন্তায় ফিক্সের মাথা খারাপ হবার জোগাড়, নিশ্চয় ভাগলবা হয়েছে দুই ধুরন্ধর আসামী। ঝাড়া চব্বিশটি ঘণ্টা আসামী উৎকণ্ঠা নিয়ে স্টেশনে হাজির থেকেছেন গোয়েন্দা-মশায়। অবশেষে এসেছেন ব্যাঙ্ক চোর এবং তাঁর ভৃত্য। তৎক্ষণাৎ বাইরে থেকে দারোগা ডেকে এনে আসামীদের সঁপে দিয়েছেন তার হাতে। নিজে কিন্তু আড়ালে থেকেছেন আগাগোড়া।

পাসপার্তু ভ্যাবাচাকা না খেয়ে বিচারালয়ের ভেতরে উপবিষ্ট মানুষ-ক'জনকে দেখলে দেখতে পেত এক কোণে নিরীহ চেহারায় বসে আছেন ফিক্স গোয়েন্দা। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না, এমনি ভাবে চুপচাপ বসে বিপুল আগ্রহে দেখছেন তাঁর কারসাজির ফলাফল। লণ্ডন থেকে ওয়ারেণ্ট কলকাতায় আসেনি এখনো, সুতরাং আসামীদের যেন তেন প্রকারেন দেরী করাতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ওবাদিয়া। পাসপার্তুর বিস্ময়োক্তি তাঁর কান এড়োয়নি। অপরাধ কবুল করাতে কাল ঘাম ছুটে যেত যদি না অপরাধী নিজেই স্বীকার করে বসত।

ঝটিতি শুধোলেন ওবাদিয়া—"আসামী অপরাধ স্বীকার করছে তাহলে?"

"হ্যাঁ করছে," নিরুত্তাপকণ্ঠে বললেন মিস্টার ফগ।

ম্যাজিস্ট্রেট তখন বললেন—"ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের সব ধর্মকে সমানভাবে এবং শক্ত হাতে রক্ষা করেন। পাসপার্তু নিজেই যখন স্বীকার করছে গত বিশে অক্টোবর বোম্বাই শহরের মালাবার হিলের পবিত্র হিন্দু মন্দিরকে সে অপবিত্র করেছে ভেতরে ঢুকে, তখন তাকে পনেরোদিন হাজতে রাখতে আদেশ দিচ্ছি। সেই সঙ্গে জরিমানা দিতে হবে তিনশ পাউণ্ড।"

"তি-ন-শ পা-উ-ণ্ড!" পাসপার্তুর মাথা ঘুরে গেল জরিমানার অংক শুনে।

"চুপ-চুপ!" হেঁকে উঠল কনস্টেবল।

বিচারপতি বলে চললেন—"চাকরের সঙ্গে মনিবের যোগসাজসে যে এই অপকর্মটি করা হয়েছে, তা প্রমাণিত না হলেও চাকরের অপরাধে মনিবকে

দায়ী করা হচ্ছে। তাঁকে সাতদিন হাজত বাস করতে হবে এবং দেড়শ পাউণ্ড জরিমানা দিতে হবে।"

গোয়েন্দা ফিক্সের আনন্দ তখন দেখে কে! সাতদিন আটক রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে! ততদিনে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পৌঁছে যাবে কলকাতায়!

আর পাসপার্তু? স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিল। তারই বেয়াকুবির জন্যে মনিবের বিশহাজার পাউণ্ড জলে যেতে বসেছে। কেন মরতে সে মন্দিরে ঢুকেছিল!

ফিলিয়াস ফগ প্রশান্ত চিত্তে দাঁড়িয়েছিলেন। মোকদ্দমার সর্বশেষে রায় যেন তাঁর উদ্দেশে উচ্চারিত হয়নি—এমনি নির্বিকার ভাবে চেয়েছিলেন বিচারপতির দিকে। এমন কি, রায় শুনে ভুরু পর্যন্ত তোলেন নি। যেন কিছুই ঘটেনি, এমনি সহজ স্বরে বলে উঠলেন—"আমি জামিন চাই।"

"নিশ্চয় পাবেন" তৎক্ষণাৎ আবেদন মঞ্জুর করলেন বিচারপতি।

ফিক্সের বুক ধড়ফড় করে উঠল। তারপর অবশ্য আবার উৎফুল্ল হলেন বিচারপতি ঘোষিত জামিনের অংক শুনে। মনিব এবং ভৃত্য দুজনকেই মাথাপিছু হাজার পাউণ্ড জমা রাখতে হবে। এত টাকা কি দিতে চাইবেন ফগ?

"টাকাটা আমি এখুনি দাখিল করতে চাই," বলতে বলতে কার্পেট ব্যাগ খুলে তাড়া-তাড়া নোট বার করলেন ফগ। সাজিয়ে রাখলেন পেশকারের টেবিলে।

"বিচারের দিন এজলাসে হাজির হলে টাকা ফেরৎ পাবেন।" বললেন বিচারপতি। "আপাততঃ আপনারা জামিনে খালাস হলেন।"

"চলে এস," চাকরকে হুকুম দিলেন ফগ।

"আমার জুতোজোড়া দিতে বলুন।" গলাবাজি করে উঠল পাসপার্তু। "এক-একটা পাটির দাম হাজার পাউণ্ড!'

রানী আউদার হাত ধরে গট গট করে বেরিয়ে এলেন ফিলিয়াস ফগ। পেছনে পেছনে মুখ আমসি করে এল পাসপার্তু।

গোয়েন্দা ফিক্সের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছিল অক্লেশে জামিনের টাকা দাখিল করা দেখে। সেই কারণেই ক্ষীণ আশা ছিল মনের মধ্যে। এতগুলো টাকা জলে ফেলে নিশ্চয় কলকাতা ছেড়ে পিঠটান দেবেন না ফগ। তাই ঝটিতি একটা গাড়ী নিয়ে পিছু নিল মিস্টার ফগের। তিনিও সদলবলে উঠে বসে ছিলেন আর একটা ভাড়াটে গাড়ীতে।

দুটো গাড়ীই পৌঁছোলো ডকে। বন্দর থেকে আধমাইল দূরে জলে

ভাসছে রেঙ্গুন জাহাজ। ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজে। একঘণ্টা আগেই পৌঁছে গেছেন মিস্টার ফগ। গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে তিনি দু-পাশে দুজনকে নিয়ে চেপে বসলেন নৌকোয়। নৌকো এগোলো জাহাজের দিকে।

জেটিতে দাঁড়িয়ে নিষ্ফল রাগে মাটিতে পদাঘাত করলেন গোয়েন্দা ফিক্স।

বদমাসটা সত্যি সত্যিই পগার পার হল! কড়কড়ে দুটি হাজার পাউণ্ডের মায়া কাটিয়ে লম্বা দিচ্ছে নাকের ডগা দিয়ে! সেকী রাগ ফিক্সের! ঠিক আছে। ফিক্সও ছাড়বেন না। দরকার হলে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাবেন পেছন-পেছন। কিন্তু যে-হারে টাকা ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে পাজী চোরটা, শেষ পর্যন্ত চোরাই টাকার সবটাই তো ফুট কড়াই হয়ে যাবে!

ফিক্সের আশংকা অমূলক নয়। লণ্ডনের বাইরে পা দেওয়ার পর থেকেই ঘুষ, হাতী কেনা, জামিন, জরিমানা এবং রাহা খরচ বাবদ সেদিন পর্যন্ত মিস্টার ফগ পাঁচ হাজার পাউণ্ডেরও বেশী খরচ করে ফেলেছেন।

ফিক্সের অত দুশ্চিন্তা তো সেই জন্যেই। চোরাই টাকা যদি এই হারে কমতেই থাকে তো সেই টাকার ওপর শতকরা হারে ফিক্সের পুরস্কারের টাকাও তো কমে আসছে হু-হু করে!

১৬॥ ফিক্সের ফিচলেমি

'রেঙ্গুন' পেনিনসুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েণ্টাল কোম্পানীর প্রপেলার চালিত জাহাজ। চীন আর জাপান সমুদ্রে এর যাতায়াত। আগাগোড়া লোহার তৈরী। ওজন প্রায় সতেরশ সত্তর টন। ইঞ্জিনের ক্ষমতা চারশ অশ্বশক্তি।

'রেঙ্গুন' ছোটে ভাল। কিন্তু মঙ্গোলিয়ার মত আরামপ্রদ নয়। কাজেই রানী আউদার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা মনোমত হল ফিলিয়াস ফগের। যাই না হোক, মাত্র সাড়ে তিন হাজার মাইল তো, দিন দশ-বারো লাগবে পেরোতে। সুতরাং রানী আউদা খুব একটা অখুশী হলেন না।

রানী আউদা সম্বন্ধে মাহুত যা-যা বলেছিল, রানী নিজের সম্বন্ধে সেই এক কথাই বলেন। সত্যিই তিনি বোম্বাই-য়ের ধনাঢ্য পার্শী পরিবারের মেয়ে। তুলোর কারবারে টাকার পাহাড় বানিয়েছেন তাঁর পরিবার। স্যার জামেটসি জিজিভয় এই সম্প্রদায়ের অন্যতম শিরোমণি। বৃটিশ সরকার খেতাব দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। ইনি আউদার আত্মীয় এবং এঁর এক খুড়তুতো ভাই, নাম তাঁর জীজী, হংকং-য়ে থাকেন। রানী তাঁর কাছেই যেতে চান।

ফিক্স গোয়েন্দা হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। দেশদেশান্তরে ছায়ার মত

পিছু নিয়ে চলেছেন তিনি ফিলিয়াস ফগের। 'রেঙ্গুন' জাহাজেও জায়গা করে নিয়েছেন। তার আগে অবশ্য ব্যবস্থা করে এসেছেন যেন গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা এলেই হংকং পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জাহাজে উঠে ইচ্ছে করেই প্রথম কদিন পাসপার্তুর সামনে আসেন নি সুচতুর গোয়েন্দা। এলেই তো জবাবদিহি করতে হবে বোম্বাই থেকে রওনা হয়েছেন কেন। পাসপার্তুর ধারণা ফিক্স এখনো বোম্বাইতেই রয়েছেন।

কিন্তু আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হল না শেষপর্যন্ত। দরকারে পড়েই আবার আলাপটা ঝালাই করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ফিক্স।

ফিক্সের আশা-ভরসা জড়ো হয়েছে এখন হংকং-য়ে। কারণ হংকং-য়ের পর থেকে লণ্ডন পর্যন্ত মাঝখানে আর বৃটিশ রাজত্ব নেই। হংকং থেকে সটকান দিলেই চীন, জাপান, আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে কোথায় ঘাপটি মারবেন ফিলিয়াস ফগ তা কে জানে। হংকং-য়ে ওয়ারেণ্ট যদি না আসে, তাহলে এবারেও কলা দেখিয়ে কেটে পড়বেন ফগ—সে ওয়ারেণ্ট চীন, জাপান, আমেরিকায় কোনো কাজে আসবে না।

কেবিনে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন ফিক্স। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা না পৌঁছোনো পর্যন্ত হংকং থেকে কোনোমতেই বেরোতে দেওয়া চলবে না ফিলিয়াস ফগকে। চেষ্টার কসুর করেন নি ফিক্স। কিন্তু বোম্বাইতে মুখে চুণ কালি পড়েছে ফিক্সের, কলকাতাতেও পাখী উড়ে গেল নাকের ডগা দিয়ে। কিন্তু হংকং-য়ে যদি ফের টেক্কা মারেন ফগ, তাহলে ফিক্সের সুনামেও ইতি ঘটবে,—দুর্নামের অবধি থাকবে না।

ভেবেচিন্তে একটা মতলব বার করলেন গোয়েন্দা। পাসপার্তু লোকটা সরল প্রকৃতির। মনিবের কূট অভিসন্ধির কোনো খবর সে রাখে না—মনিবের সাগরেদ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং মনিবের আসল চেহারাটা যদি ওর সামনে ফুটিয়ে তোলা যায়, মনিবটি যে আসলে দুর্ধর্ষ ব্যাঙ্ক চোর—তা যদি পাসপার্তুর মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া যায়—তাহলেই তো পাসপার্তু তাঁর দলে চলে আসবে।

এর উল্টোটাও ঘটতে পারে। রামভক্ত হনুমানের মনিবভক্ত পাসপার্তু যদি ফিক্সের ফিচলেমি ফাঁস করে দেয় মনিবের কাছে, তাহলে অশেষ দুর্গতি দেখা দেবে ফিক্সের বরাতে।

আচম্বিতে আর একটা ফন্দী উঁকি দিল ফিক্সের মগজে। ফগের সঙ্গে একজন রূপসী যুবতী রয়েছে। আহা, ঠিক যেন ডানাকাটা পরী! কিন্তু মেয়েটাকে তো আগে দেখা যায় নি! তবে কি এই স্ত্রী-রত্নের জন্যেই এত

টাকা লুঠ করে লণ্ডন থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত দৌড়ে এসেছেন ফগ? এবার কি গা-ঢাকা দেওয়ার পালা? নিশ্চয় ফুসলে আনা মেয়ে। বিবাহিতা কিনা তাও যে ছাই-বোঝা ভার! ফিক্স অনায়াসেই মেয়ে-চুরি নিয়ে এমন ফাঁদ পাতবেন হংকং-য়ে যে ফিলিয়াস ফগ তাতে জড়িয়ে পড়বেনই।

কিন্তু হংকং পর্যন্ত সবুর করা কি সমীচীন হবে? অতিমানুষের মত ফগ ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে চলেছেন জাহাজ থেকে রেলে, রেল থেকে জাহাজে। হংকং পৌঁছে ফাঁদ পাততে পাততেই হয়তো সোজা ইয়োকোহামা অভিমুখে উধাও হবেন তস্কর সম্রাট।

এইসব ভেবেই সিংগাপুরে জাহাজ পৌঁছোতেই হংকং পুলিশকে তারবার্তা পাঠিয়ে দেওয়া মনস্থ করলেন ফিক্স।

এবার পাসপার্তুকে নিয়ে পড়া যাক।

তিরিশে অক্টোবর কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকে হাওয়া খেতে লাগলেন ফিক্স। পাসপার্তুও ছিল সেখানে। আচমকা দুজনে মুখোমুখি আসতে পাকা অভিনেতার মতই বিস্ময় ধ্বনি করে উঠলেন ফিক্স—"আরে, তুমি এখানে?"

পাসপার্তু তো অবাক 'মঙ্গোলিয়া'র মঁসিয়ে ফিক্সকে 'রেঙ্গুন'-য়ে দেখে। বিস্মিতকণ্ঠে বললে—"আরে, আপনাকে বোম্বাই ফেলে এলাম, আর এখন কিনা আমাদের সঙ্গেই হংকং চলেছেন? আপনিও কি পৃথিবী প্রদক্ষিণে বেরিয়েছেন?"

"না, না। আমি দিনকয়েকের জন্যে হংকং ছেড়ে নড়ছি না।"

"কিন্তু কলকাতা থেকে অ্যাদ্দিন পযন্ত আপনাকে জাহাজে দেখিনি তো?" পাসপার্তু বিলক্ষণ বিস্মিত।

"আর বলো কেন, সমুদ্র পীড়ায় শুয়েছিলাম কেবিনে। ভারত মহাসাগর আর বঙ্গোপসাগর কোনোটাই আমার সহ্য হয় নয়। মিস্টার ফগ আছেন কেমন?"

"ঘড়ির মতই কাঁটায় কাঁটায় চলেছেন—একটা দিনও খোয়া যায়নি ৮০ দিনের হিসেব থেকে। ভালকথা মঁসিয়ে ফিক্স, আমাদের সঙ্গে এ যাত্রায় কিন্তু একজন যুবতী মহিলাও চলেছেন।"

"তাই নাকি?" ফিক্স যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

পাসপার্তু তখন ফলাও করে বর্ণনা করল আউদার ইতিহাস, বোম্বাই মন্দিরের ঘটনা, হাতী কেনা, আউদা উদ্ধার, কলকাতায় গ্রেপ্তার হওয়া এবং জামিনে খালাস। আগাগোড়া ন্যাকা সেজে রইলেন ফিক্স। পাসপার্তুও এমন উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে মুখে তুবড়ি ছোটাল বিরামবিহীন ভাবে।

"মিস্টার ফগ কি ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ইউরোপ চলেছেন?"

"মোটেই না। হংকং-য়ে ওঁর এক বড়লোক আত্মীয় আছেন। তাঁর কাছে সঁপে দিয়ে আমাদের ছুটি।"

"তাহলে তো হংকং-য়ের প্ল্যান কেঁচে গেল," জনান্তিকে স্বগতোক্তি করলেন ফিক্স। পাসপার্তুকে বললেন—"চলো হে, এক গেলাস জিন খাওয়া যাক।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়," এক গাল হেসে বললে পাসপার্তু। "রেঙ্গুন-এর ডেকে চড়ে এক আধ গেলাস মদ্যপান না করলে কি চলে?"

১৭॥ চিন্তার ঘূর্ণিপাকে

এরপর ডেকের ওপর প্রায় মোলাকাৎ হত গোয়েন্দার সঙ্গে ভৃত্যের। কিন্তু মিস্টার ফগের প্রসঙ্গ ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যেতেন ফিক্স। পাসপার্তুর সন্দেহ হতে পারে মনিব সম্বন্ধে অত কৌতূহল দেখালে। মিস্টার ফগ অবশ্য কেবিনেই থাকতেন রানী আউদাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে, নয়তো তাস পিটতেন।

পাসপার্তুর মগজে কিন্তু একটা সন্দেহ ঘুর-ঘুর করতে আরম্ভ করেছিল কদিন ধরে। মঁসিয়ে ফিক্স মানুষটা অমায়িক, হাসিখুশী, ভদ্র। অথচ লোকটার গতিবিধি সন্দেহের উদ্রেক করে। সুয়েজে ফিক্সের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তারপরেই তাকে দেখা গেল মঙ্গোলিয়ার ডেকে। পরে জানা গেল বোম্বাই তার গন্তব্যস্থান। এখন তিনি যেন আকাশ থেকে খসে পড়লেন হংকংগামী জাহাজে। এরপর কি ঘটবে, ফিক্সের মতলব না আঁচ করেও বলতে পারে পাসপার্তু। একই দিনে এ.ই জাহাজে হংকং থেকে মিস্টার ফগের সঙ্গে ইয়োকোহামা পাড়ি দেবেন মঁসিয়ে ফিক্স।

কে এই ফিক্স? কি তার অভিপ্রায়? বেচারা পাসপার্তু! মাথার মধ্যে দুরমুশ দিয়ে পিটলেও ফিক্সের প্রকৃত অভিসন্ধি জানা সম্ভব নয় তার পক্ষে। ফিক্স যে আসলে একজন ধুরন্ধর গোয়েন্দা এবং ফিলিয়াস ফগকে টাকাচুরীর অপরাধে পিছু নেওয়া হচ্ছে—এ খবর জানলেই রহস্যের সমাধান ঘটত।

তবে পাসপার্তুর সাদামাটা বুদ্ধিতে ফিক্স-রহস্যের একটা ব্যাখ্যা এসে গিয়েছিল, ফিক্স নিশ্চয় ভাড়াটে গুপ্তচর। রিফর্ম ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা তাঁকে লেলিয়ে দিয়েছে মিস্টার ফগের পেছনে। সত্যিই মিস্টার ফগ ভূ-প্রদক্ষিণ করছেন কিনা পাশে পাশে থেকে তা দেখছেন ফিক্স।

ব্যাখ্যানটা মনে ধরল পাসপার্তুর। কিন্তু মনিবকে কিছু না বলাই মনস্থ

করল। মনে কষ্ট পেতে পারেন। ও রকম উদার খাঁটি মানুষকে অবিশ্বাস ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

তবে হ্যাঁ, গুপ্তচরটাকে একটু খোঁচা দেওয়া দরকার। সে যে রিফর্ম ক্লাবের স্পাই, তা না ফাঁস করে উত্যক্ত করে মজা দেখতে হবে।

ভোর চারটায় জাহাজ সিংগাপুর বন্দরে পৌছোলো। তেরশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে হংকং পৌছোনোব জন্যে কয়লা উঠতে লাগল জাহাজে। ঘড়ি দেখলেন ফগ। পুরো আধদিন আগে পৌছেছে জাহাজ।

বেলা এগারোটার সময়ে জাহাজ ছাডল সিঙ্গাপুব থেকে। এই কদিন আবহাওযা ভালই ছিল। কিন্তু হঠাৎ তুফানেব আভাস পাওয়া গেল আকাশে বাতাসে সমুদ্রে। সমুদ্র যেন গডাতে লাগল উত্তাল বেগে। থেকে থেকে ঝড়েব মত হুংকারে বইতে লাগল বাতাস, তবে হাওযাব বেগ দক্ষিণ পশ্চিম থেকে আসায় বেড়ে গেল জাহাজের গতিবেগ। মাঝে মাঝে স্ববিধে বুঝে পাল তুলে দিল ক্যাপ্টেন। পালে হাওয়া আর বাষ্পেব দ্বিগুণ গতি নক্ষত্র বেগে ঠেলে নিযে চলল জাহাজকে। কিন্তু দেবী হল তা সত্ত্বেও। অনেক ক্রটি ছিল জাহাজের গড়নে। তাই গতিবেগ বাডলেও দেরী হল। ফলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল পাসপার্তুর। শাপশাপান্তব চূড়ান্ত কবল ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনীযাব থেকে আবম্ভ করে খালাসীদের পর্যন্ত। ওব উদ্বেগেব কারণটা বোধ হয স্যাভিল রো-যে গ্যাসবাতিব খোলা চাবিটা। যত দেরী হচ্ছে, ততই গ্যাস পুডছে—কড়ায় গণ্ডায় বাড়তি গ্যাস খবচের দাম মিটোতে হবে তাকেই!

তাই দেখে ফিক্স একদিন বললেন ওকে—"হংকং যাওযাব খুব তাডা আছে দেখছি!"

"আছে বইকি, খুবই তাড়া আছে।"

"ইযোকোহামাব জাহাজ ধবাব জন্যে উদ্বিগ্ন হযে পড়েছেন বুঝি মিস্টার ফগ?"

"সাংঘাতিকভাবে উদ্বিগ্ন হযেছেন।"

"ভূ-প্রদক্ষিণের বাজীধরা বিশ্বাস হয তোমাব?"

"অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস হয়। আপনার হয না?"

"আমার? একটা অক্ষরও না!"

"আপনি মহা ঘোড়েল লোক মশাই!" চোখ মটকে বলল পাসপার্তু।

কথার স্বর আর চোখের ঢং দেখে মহাভাবনায় পড়লেন ফিক্স। হঠাৎ পাসপার্তু এভাবে কথা বলল কেন ধরতে পারলেন না। ফরাসী বিটলে কি ইংরেজের চালাকি ধরে ফেলেছে? কিন্তু পাসপার্তু জানবে কি করে যে

ফিক্স আসলে একজন ডিটেকটিভ? তবে মুখে যাই বলুক না কেন, লোকটা যে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে তা কথার ধরন দেখেই বোঝা গেছে।

পরের দিন আরও এক ধাপ এগোলো পাসপার্তু। ফরাসীদের স্বভাবই তাই, পেটের মধ্যে কথা যেন ফুলতে থাকে। না বললেই নয়।

"মিস্টার ফিক্স" বেঁকা সুরে বলল সে, "হংকং গিয়ে ফেব যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তো বুঝব বরাত খারাপ।"

"জানি না ছাড়াছাড়ি হবে কিনা" হঠাৎ খোঁচা খেয়ে হকচকিয়ে গেলেন ফিক্স, "তবে—"

"সে কি কথা? আপনি হলেন গিয়ে জাহাজ কোম্পানীব দালাল। মাঝখানে থেমে যাওযা আপনাকে মানায় না! এই দেখুন না কেন, আপনার থামবাব কথা ছিল বোম্বাইতে, পারলেন কি? এসে পড়লেন চীনদেশে। এখান থেকে আমেরিকা আর কদ্দূব বলুন—সেখান থেকে পা বাড়ালেই ইউবোপ।"

কি বলতে চায় ফবাসীটা? তীক্ষ্ণ চোখে পাসপার্তুর মুখ নিরীক্ষণ করে পরিহাসেব বাষ্পটুকুও দেখতে পেলেন না ফিক্স। সুতরাং গলা মিলিয়ে হো হো কবে হেসে উঠলেন দুজনে। পাসপার্তু কিন্তু ঠোক্কব মেরেই চলল। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, মিস্টার ফিক্সের হাতেব কাজ এগোচ্ছে তো?

"হ্যাঁ বলব, আবার না-ও বলব," ধবি-মাছ-না-ছুঁই-পানি গোছের জবাব দিলেন ফিক্স।" এসব কাজে ভাগ্য কখনো মুখ তুলে চায় আবার কখনো মুখ ফিরিযে নেয। তবে জেনে বেখো আমি কিন্তু নিজের ট্যাঁক খসিয়ে দেশ ভ্রমণ করছি না।"

"সে আমি ভাল করেই জানি!" বলে প্রাণ খুলে হেসে উঠল পাসপার্তু। আরো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন ফিক্স' ভাবিত মুখে কেবিনে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা এক নাগাড়ে ভাবলেন পাসপার্তুর হেঁয়ালিপূর্ণ কথাগুলি নিয়ে। কতদূর জেনেছে ফরাসী ভৃত্য? মনিবকে কিছু বলেছে কি? চাকরটাও কি মনিবের কুকর্মের দোসর? এত দূর এসে কি তাহলে খালি হাতে ফিরতে হবে?

উভয় সংকটে পড়েও মানসিক ধৈর্য হারালেন না দুঁদে গোয়েন্দা ফিক্স। মনে মনে এঁকে রাখলেন হংকং গিয়ে যে করেই হোক পাসপার্তুকে দলে টানতে হবে। সে যদি ফগের অপকর্মের সাগরেদ না হয়, তাহলে ফিক্সের পোয়াবারো। আর যদি উল্টোটা অর্থাৎ চুরীর ব্যাপারেও তার হাত থাকে, তাহলে ফিক্সের সর্বনাশ!

১৮॥ দেরী হয়েও দেরী হল না

পুরোদমে তুফান দেখা গেল তেসরা নভেম্বর। অতবড় জাহাজটাকে যেন ঢেউয়ের মাথায় তুলে আছাড় মারতে লাগল দামাল বাতাস। মড়মড় মচাৎ কাতরানি শোনা গেল জাহাজের সারা দেহে। ক্যাপ্টেনের হিসেবে জানা গেল, হংকং পৌছোতে চব্বিশ ঘণ্টা দেরী হবে।

ফিলিয়াস ফগ সহজাত স্থৈর্য নিয়ে দেখছিলেন ঝড়ের রুদ্রমূর্তি। চব্বিশ ঘণ্টা দেরী হওয়া মানে ইয়োকোহামাগামী জাহাজ না পাওয়া। পরিণামে উনি বাজী হারবেন-ই। কিন্তু সেজন্যে তিলমাত্র বিরক্তি বা উদ্বেগ দেখা গেল না তাঁর শান্ত চোখে মুখে। মানুষটার নার্ভ যেন লোহা দিয়ে গড়া। ঝড় যেন তাঁর প্রোগ্রামেই লেখা ছিল এবং চব্বিশঘণ্টা দেরী হওয়াটাও তার হিসেবের বাইরে নয়। রানী আউদা তো অবাক।

প্রথম যেদিন দেখেছিলেন মিস্টার ফগকে, সেদিন থেকে ঝড় জলের উৎকণ্ঠাময় মুহূর্তেও মানুষটা ধীর স্থির অবিচল। আশ্চর্য!

ফিক্স কিন্তু আনন্দে আটখানা হলেন। যাক, শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি নিজে তাঁকে সাহায্য করছেন। ফিক্স আরো খুশী হতেন যদি ঝড় জাহাজকে উল্টো দিকে ঠেলে নিয়ে যেত। জাহাজের যাচ্ছেতাই দুলুনিতে যদিও সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ভদ্রলোক। ক্ষণে ক্ষণে বমি করে ভাসাচ্ছিলেন। কিন্তু দেহটা কাহিল হলেও মনটা তুরীয় আনন্দে নেচে নেচে উঠছিল। চব্বিশঘণ্টা দেরীতে পৌছে মিস্টার ফগ জাপানের জাহাজ পাবেন না। ফিক্সও তাই চান!

চৌঠা নভেম্বর সমুদ্র অনেকটা শান্ত হল। জাহাজ সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটে চলল হংকং অভিমুখে। কিন্তু এত করেও যথাসময়ে পৌঁছোনো গেল না। পাঁচুই সন্ধ্যের পরিবর্তে হংকং বন্দরে জাহাজ ঢুকল তার পরের দিন দুপুর একটায়।

জাহাজ ঘাটায় তৎক্ষণাৎ খোঁজ নিলেন মিস্টার ফগ। ইয়োকোহামার জাহাজ কি ছেড়ে গেছে?

জবাব শুনে পাসপার্তু আনন্দে নেচে উঠল।

ইওকোহামার জাহাজ এখনো ছাড়ে নি। পরের দিন ভোর পাঁচটার আগে ছাড়বে না। কেননা, হঠাৎ জাহাজের একটা বয়লার বিগড়েছে। মেরামতি চলছে!

ভাগ্য মুখ তুলে চেয়েছেন তাহলে! চব্বিশ ঘণ্টা দেরীতে এসেও

অপ্রত্যাশিতভাবে জাপানের জাহাজ পেয়ে যাচ্ছেন মিস্টার ফগ! লণ্ডন থেকে রওনা হবার পর থেকে সেদিন পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ দিন পর্যটনের হিসেবে উনি পেছিয়ে আছেন মাত্র একটা দিন।

খবর শুনে উৎফুল্ল হলেন না মিস্টার ফগ। এ-রকম একটা ভাসা-ভাসা খবর 'রেঙ্গুন' জাহাজের পাইলটের মুখেই উনি শুনেছিলেন। এ-জাহাজ যদি না পেতেন, সাতটা দিন ওঁকে অপেক্ষা করতে হত পরের জাহাজের জন্যে।

জাহাজ ছাড়বে ভোর পাঁচটায়। হাতে তখনও ষোল ঘণ্টা রয়েছে। মিস্টার ফগ রাণী আউদাকে ক্লাব হোটেলে রেখে পাসপার্তুকে হুকুম দিলেন তাঁর কাছছাড়া না হতে। উনি সোজা গেলেন শেয়ার মার্কেটে। জীজীর মত ধনকুবেরের ঠিকানা সেখানেই পাওয়া যাবে।

জীজীর ঠিকানা পাওয়া গেল বটে। তবে সে ঠিকানা হংকং-য়ে নয়— হল্যাণ্ডে। দুবছর আগে দেদার টাকা কামিয়ে উনি চীনদেশ ছেড়ে ইউরোপ গেছেন। হল্যাণ্ডের সঙ্গে যাদের ব্যবসা সূত্রে যোগাযোগ, তারাই খবরটা দিলে। জীজীকে সেখানেই পাওয়া যাবে।

হোটেলে ফিরে এলেন মিস্টার ফগ। বিনা ভূমিকায় রাণী আউদাকে সব বললেন। ভেঙে পড়লেন আউদা—"মিস্টার ফগ, তাহলে আমার কি হবে?"

"কি আবার হবে?" অবিচল কণ্ঠ ফগের। "আমাদের সঙ্গে ইউরোপ যাবেন।"

"কিন্তু আপনার ঘাড়ে চেপে—"

"একে ঘাড়ে চাপা বলে না। আপনি সঙ্গে থাকলে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। পাসপার্তু!"

"আজ্ঞে?"

"ইয়োকোহোমার জাহাজে তিনটে কেবিন বন্দোবস্ত করে এস।"

রাণী আউদা সঙ্গে যাচ্ছেন তাহলে? আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটল পাসপার্তু।

১৯॥ চণ্ডুর আড্ডায়

ইয়োকোহামাগামী জাহাজের নাম 'কর্ণাটক'। জেটিতে পৌঁছে জাহাজ অফিসে ঢুকতে যাচ্ছে পাসপার্তু, এমন সময়ে দেখল গোয়েন্দা ফিক্স বিষম বিচলিত হয়ে পাদচারণা করছেন। ওয়ারেণ্ট এখনো পৌঁছোয়নি, এদিকে পাখী উড়ল বলে!

দেখেই উৎফুল্ল কণ্ঠে টিটকিরি দিল পাসপার্তু—"মঁসিয়ে ফিক্স না কি? কদ্দূর? ইউরোপ পর্যন্ত নিশ্চয়?"

"তাই তো ভাবছি" দাঁতে দাঁত পিষে বললেন ফিক্স। সব ভণ্ডুল হতে চলল, ঘাটে এসে তরী ডুবল। রাগ হবে না?

"বাঃ! এই এই তো চাই! আমি যে জানি আমাদের কাছছাড়া হতে গেলে বুক ফেটে যাবে আপনার। চলুন, জায়গা দখল করা যাক।"

অফিসে ঢুকে চারখানা টিকিট কাটা হল। কেরানী জানাল, 'কর্ণাটিক' জাহাজ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পরের দিন ভোর পাঁচটার পরিবর্তে সেইদিনই সন্ধ্যে নাগাদ ছাড়ছে। বয়লার মেরামত সম্পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং আর দেরী করা হবে না।

শুনে পাসপার্তু তো ভীষণ খুশী। "যাই গিয়ে কর্তাকে খবরটা দিই" বলে বেরোতে যাচ্ছে, ফিক্স তার হাত ধরলেন।

বললেন—"যাবে 'খন। হংকং এলে যখন, এক গেলাস মদ খেয়ে যাবে না?"

মদ? পাসপার্তু তাতে নারাজ নয়। ফলে, যেচে সে পা দিল ফিক্সের নতুন ফাঁদে!

স্টেশনের কাছেই একটা চণ্ডুর আড্ডায় পাসপার্তুকে নিয়ে ঢুকলেন ফিক্স। একপাশে বিলিতি মদের বোতল নিয়ে বসে মদ্যপান চলছে। সেই সঙ্গে ধূমপান—চৈনিক কায়দায়। জনা তিরিশেক মদ্যপ চণ্ডুখোরের সামনে লাল চীনে মাটির নল। নলের প্রান্তে আফিংয়ের গুলি। শিবনেত্র হয়ে টানের পর টান দিতে দিতে বেহুঁস হয়ে যারা গড়িয়ে পড়ছে টেবিলের তলায়, বেয়ারারা তাদের চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিচ্ছে এক পাশে পাতা বিছানায়।

আফিং দিয়ে একটা গোটা জাতকে পঙ্গু করে রেখেছে ইংরেজ ব্যবসাদাররা। ফি-বছর দশলক্ষ চার হাজার পাউণ্ড মূল্যের আফিং কিনছে চীনের সর্বস্তরের জনসাধারণ। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই সর্বনাশা নেশার দাস হয়ে ক্লীব হয়ে থাকছে, জড়দ্গব হয়ে দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। চীন সরকার আইন প্রণয়ন করে এ-নেশা ছাড়াতে পারছে না। কেননা, চণ্ডুর নেশা একবার শরীরে বাসা বাঁধলে সহজে যেতে চায় না—গেলেও দেহমন্দিরকে শেষ অবস্থায় পৌঁছে দিয়ে যায়।*

* বর্তমান চীনদেশ কিন্তু এই সর্বনাশা নেশার খপ্পর থেকে রেহাই পেয়েছে। সম্পাদক।

এক বোতল পোর্ট মদ নিয়ে টেবিল দখল করলেন ফিক্স। বকর বকর করতে করতে মহাফুর্তিতে এক গেলাস মদ চোঁ-চোঁ করে মেরে দিয়ে উঠে পড়ল পাসপার্তু। 'কর্ণাটক' জাহাজ আগেই ছেড়ে যাচ্ছে, সে খবর এখুনি মিস্টার ফগকে দেওয়া দরকার।

ফিক্স তার হাত চেপে ধরলেন, বললেন—"একটু সবুর করে যাও।"

"কেন?"

"কথা আছে। দরকারী কথা।"

"দরকারী কথা? কাল শোনা যাবে। আজ সময় নেই।"

"আজই শোনা দরকার। কথাটা তোমার কর্তাকে নিয়ে!"

"মিস্টার ফগকে নিয়ে?" ফিক্সের মুখটা ভালো করে দেখল পাসপার্তু। ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে শুধোলো—"কি ব্যাপার বলুন তো?"

"আমি কে বলে মনে হয়?" গলা নামিয়ে শুধোলেন ফিক্স।

"চর!" মুচকি হেসে বলল পাসপার্তু।

"তাহলে আমার সব কথা তোমাব শোনা দরকার।"

"শুনে আর কি করব বলুন। তবে আপনি যাদের নুন খেয়েছেন, শুধুমুধু তাদের খরচ বাড়াচ্ছেন।"

"শুধুমুধু কি হে? টাকার পরিমাণটা জানা আছে?"

"তা আব জানব না? বিশ হাজার পাউণ্ড!"

"মোটেই না। পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড!"

"অ্যাঁ! বলেন কী। পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ডের ঝুঁকি নিয়েছেন মিস্টার ফগ। তাহলে তো এখুনি তাঁকে জাহাজ ছাড়াব সময় পাল্টানোর খবরটা দিতে হয়।" বলে উঠে দাঁড়াল পাসপার্তু।

ফের তাকে ঠেলে বসিয়ে দিলেন ফিক্স। বললেন—"পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড টাকাটা নিশ্চয় কম নয়। আমি যদি কস্তিমাৎ করতে পারি, পাব দুহাজার পাউণ্ড। তা থেকে তোমাকে দেব পাঁচশ পাউণ্ড।"

"আমাকে দেবেন? কেন মিস্টার ফিক্স?"

"আমাকে সাহায্য করতে হবে।"

"কি সাহায্য করব?"

"মিস্টার ফগকে এখানে দিন দু'দিন আটকে রাখতে হবে।"

"কী? কী বললেন? আমার মনিবের মত এমন দেবতুল্য মানুষকে শুধুমুধু সন্দেহ করেও আশ মেটেনি নোংরা লোকগুলোর? এখন ওঁকে দেরী করিয়ে দিয়ে বাজী জিততে চান? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!"

ঘাবড়ে গেলেন ফিক্স। বলে কি পাসপার্তু ?

পাসপার্তু তখন রেগে তিনটে হয়ে চেঁচিয়ে চলেছে গাঁক গাঁক করে—"ছিঃ! শুনে রাখুন মশাই, আপনি আর আপনার মনিব রিফর্ম ক্লাবের নীচমনা সভ্যরা—আমার মনিব বাজী জিতবেনই। কেননা, তিনি নির্জলা খাঁটি লোক।"

তীক্ষ্ণ চোখে পাসপার্তুকে নিরীক্ষণ করে বললেন ফিক্স—"আমাকে কে বলে মনে হয় তোমার ?"

"চর! রিফর্ম ক্লাবের স্পাই! মিস্টার ফগের ভূ-প্রদক্ষিণ ভণ্ডুল করার জন্যেই লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনাকে! আপনার মতলব অনেক আগেই বুঝেছি মশায়, মনিবকে এখনো কিছু বলিনি।"

"তাই নাকি ? উনি কিচ্ছু জানেন না ?"

"একদম না," এক নিঃশ্বাসে গেলাস খালি করে দিয়ে বলল পাসপার্তু।

দোটানায় পড়লেন গোয়েন্দা। কি করবেন এখন ? পাসপার্তু মিস্টার ফগের কু-কর্মের দোসর নয়। সেক্ষেত্রে মনিবকে পাঁকে ফেলার ষড়যন্ত্রে সে যোগ দেবে কী ? দিতেও পারে।

যা হয় হোক! কপাল ঠুকে এগিয়ে গেলেন ফিক্স। যেনতেন প্রকারেণ ফগকে হংকং-য়ে আটকে রাখতে হবে দিন কয়েক।

বললেন পাসপার্তুকে—"তুমি যা ভাবছো, আমি তা নই।"

"তবে আপনি কে ?"

"পুলিশ ডিটেকটিভ। লণ্ডন থেকে আসছি।"

"অ্যাঁ! ডিটেকটিভ!"

"হ্যাঁ, ডিটেকটিভ! এই দেখো আমার পরিচয়পত্র।"

পরিচয়পত্র দেখে পাসপার্তু বোবা হয়ে গেল। ফিক্স সত্যিই পুলিশের গোয়েন্দা।

ফিক্স বললেন—"তোমাকে আর রিফর্ম ক্লাবের সবাইকে বোকা বানিয়েছেন মিস্টার ফগ। বাজী ধরার ব্যাপারটা স্রেফ অছিলা।"

"কিন্তু কেন ?"

"গত আটাশে সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড থেকে পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড খোয়া যায়। যাকে সন্দেহ করা হয়েছে, তার চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মিস্টার ফিলিয়াস ফগের চেহারা আশ্চর্যভাবে মিলে যায়।"

"কি আবোল-তাবোল বকছেন ?" দড়াম করে টেবিলে ঘুসি মেরে বলল পাসপার্তু—"মিস্টার ফগের মত সজ্জন মানুষ আর হয় না!"

"সেটা তোমাকে বলা সাজে না। তুমি যেদিন তাঁকে প্রথম দেখলে,

সেইদিনই তিনি বাক্সে অছিলায় লণ্ডন ত্যাগ করলেন। পৃথিবী ঘুরতে বেরোলেন, অথচ বাক্স প্যাঁটরা নিলেন না—নিলেন কেবল থলিভর্তি নোট। তার পরেও তাঁকে সজ্জন বলা চলে কি ?"

"আলবৎ সজ্জন তিনি।" যন্ত্রবৎ আউড়ে গেল পাসপার্তু।

"তবে আর কি, চোরের স্যাঙাৎ হিসেবে গ্রেপ্তার হওয়ার সখ হয়েছে বুঝি ?"

বোঁ-বোঁ করে মাথা ঘুরতে লাগল পাসপার্তুর। ঝুঁকে বসল দু'হাতে মাথা চেপে। একি শুনছে সে ? ফিলিয়াস ফগ, আউদার উদ্ধার কর্তা ফিলিয়াস ফগ, একজন হীন তস্কর ? না, না, না! অথচ গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকাতেও সাহস হল না তার।

অনেকক্ষণ পর বলল চিঁ-চিঁ করে—"আমাকে কি করতে বলেন ?"

"লণ্ডন থেকে মিস্টার ফগের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা না আসা পর্যন্ত তাঁকে হংকং-য়ে আটকে রাখতে হবে।"

"আমি! কিন্তু—"

"আমি পুরস্কার পাবো দুহাজার পাউণ্ড। তোমাকে তার ভাগ দেব।"

"না, না, না!" বলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল দেহে-মনে নিঃশেষিত পাসপার্তুর। "আপনি যা বললেন, উনি যদি তা-ও হন, আমি তাঁর নুন খেয়ে বেইমানি করতে পারব না।"

"তুমি রাজী নও ?"

"না।"

"তাহলে আমার কিছু বলার নেই। এসো, মদ খাও।"

"দিন!"

গেলাস ভর্তি করে দিলেন ফিক্স। উত্তেজনার মুহূর্তে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছিল পাসপার্তু। গেলাস-গেলাস মদ গিলে গেল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর যখন আঁখি ঢুলু-ঢুলু, পাশে রাখা একটা চণ্ডুর নল আলতো করে তার হাতে ধরিয়ে দিলেন ফিক্স। নেশার ঘোরে তাই নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরল পাসপার্তু। গোটা কয়েক টান দিতেই প্রচণ্ড মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। মাথা নেমে এল টেবিলের ওপর।

উঠে দাঁড়ালেন ফিক্স। সফল হয়েছে তাঁর উদ্দেশ্য। বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকুক পাসপার্তু। মিস্টার ফগ জানতেও পাবেন না—নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ছেড়ে যাচ্ছে 'কর্ণাটক' জাহাজ।

বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন গোয়েন্দা ফিক্স।

২০ ॥ ফিক্স এলেন ফগের সামনে

চণ্ডুর আড্ডায় পাসপার্তু যখন নেশা করে চলেছে, মিস্টার ফিলিয়াস ফগ তখন রাণী আউদাকে নিয়ে বাজারে বেরিয়েছেন। সামনে ঘোর বিপদ, 'কর্ণাটক' যাত্রার সময় বদল করেছে এবং তাঁকে না নিয়েই রওনা হতে চলেছে। তিনি তা জানেন না। নিশ্চিন্ত মনে আউদাকে নিয়ে ইংরেজ মহলের পথে-ঘাটে ঘুরছেন। দূর পাল্লার সমুদ্র যাত্রার উপযোগী জিনিসপত্র কিনে দিচ্ছেন সঙ্গিনীকে। একটি মাত্র থলি হাতে বিশ্ব ভ্রমণ মিস্টার ফগের মত ইংরেজকে সাজে, কিন্তু কোনো মহিলার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সুতরাং রাণী আউদার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি কিনে দিলেন। মুখে বললেন শুধু একটি কথা—"যা কিছু করছি জানবেন আমার পথ চলার সুবিধের জন্যে—প্রোগ্রামের বাইরে কিছু করছি না।"

কেনাকাটার পর হোটেলে ফিরে এসে খাওয়াদাওয়া সেরে নিলেন মিস্টার ফগ। ইংরেজি কেতায় তার সঙ্গে করমর্দন করে শুতে গেলেন রাণী আউদা। মিস্টার ফগ 'টাইমস্' আর সচিত্র 'লণ্ডন নিউজ' কাগজ দুখানা নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন রাত পর্যন্ত।

অবাক হতে জানতেন না মিস্টার ফগ। যদি জানতেন, তাহলে চাকরের অন্তর্ধান নিয়ে মাথা ঘামাতেন। উনি ধরে নিয়েছিলেন, জাহাজ ছাড়ছে পরদিন সকালে। সুতরাং রাত্রে নাই বা শুতে এল পাসপার্তু?

পরের দিন ভোরবেলাও দর্শন পাওয়া গেল চাকরের। সেজন্যে বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করলেন না মিস্টার ফগ। কার্পেট ব্যাগ হাতে নিয়ে রাণী আউদাকে ঘর থেকে ডাক দিয়ে নেমে এলেন নীচে। পাল্কী নিয়ে পৌঁছোলেন জেটিতে। অন্যান্য মালপত্র এল আলাদা গাড়ীতে।

খবরটা তখনি কানে এল। 'কর্ণাটক' জাহাজ আগের দিন সন্ধ্যায় ছেড়ে গিয়েছে।

মুখ দেখে বোঝাই গেল না যে ভেঙে পড়েছেন মিস্টার ফগ। নির্বিকার ভাবে রাণী আউদাকে শুধু বললেন—"ভাববেন না। পথে বেরুলে এরকম বিভ্রাট এক-আধটা দেখা দেবেই।"

ঠিক এই সময়ে অদূরে দাঁড়িয়ে দুজনের পানে তাকিয়ে ছিল এক ব্যক্তি। গোয়েন্দা ফিক্স। পায়ে পায়ে মিস্টার ফগের সামনে এসে শুধোলেন—"আপনিই না গতকাল রেঙ্গুন জাহাজে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ।" নিরুত্তাপ জবাব মিস্টার ফগের। "কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?"

"ক্ষমা করবেন। আমি ভাবলাম আপনার চাকর সঙ্গে আছে। তাই এসেছিলাম।"

"আপনি জানেন সে কোথায়?" উদ্বিগ্নকণ্ঠে শুধোলেন আউদা।

"সে কি কথা!" অবাক হওয়ার ভান করলেন ফিক্স। "আপনাদের সঙ্গে নেই সে?"

"না," বললেন আউদা "কাল থেকে দেখতে পাচ্ছি না তাকে। 'কর্ণাটক' জাহাজে উঠে চলে যায়নি তো?"

"আপনাদের রেখে যাবার পাত্র সে নয়। ভাল কথা, কর্ণাটক জাহাজে আপনাদেরও যাওয়ার কথা ছিল নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"আমারও ব্যবস্থা ছিল জাহাজে। কিন্তু আক্কেলটা দেখুন। মেরামতি তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে বলে বারো ঘণ্টা আগেই রওনা হয়েছে 'কর্ণাটক'—কাউকে জানানোর দরকারও মনে করেনি। সাত দিন পর আবার জাহাজ পাব।"

আর সাতদিন! কথাটা মুখ দিয়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ফিক্সের মনটা যেন ভুরুক নাচ নেচে উঠল। আহারে! সাত সাতটা দিন হংকং-এ আটক থাকুন মিঃ ফগ। ততদিনে এসে যাবে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা।

কিন্তু ফগের কথা শুনে পিলে চমকে উঠল ফিক্সের।

স্বভাব গম্ভীর কণ্ঠে প্রসন্নচিত্তে বললেন ফগ—"'কর্ণাটক' গেছে তো কি হয়েছে। হংকং বন্দরে আরো জাহাজ আছে।"

এই বলে, রানী আউদাকে নিয়ে সচল গণিত যন্ত্রের মত মেপে মেপে পা ফেলে এগোলেন ফিলিয়াস ফগ। জেটির কোথাও অন্য জাহাজ পাওয়া যায় কিনা। শুরু হল সেই খোঁজ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ফিক্স ছায়ার মত লেগে রইলেন পেছনে। ঘণ্টাতিনেক জনে-জনে জিজ্ঞেস করলেন ফগ—ইয়োকোহামাগামী জাহাজ ভাড়া চাই। গোটা জাহাজটাই ভাড়া নেবেন তিনি। কিন্তু সব জাহাজেই তখন মাল উঠছে নামছে—কেউ রাজী হল না। আঁচলের মত লেগে থাকা ফিক্সের প্রাণে ফের ফুর্তি দেখা দিল মিস্টার ফগকে হাঁকিয়ে দেওয়া দেখে।

কিন্তু মিস্টার ফগ তাতে দমে যাওয়ার পাত্র নন। সমান উদ্যমে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে চললেন একই কথা—আস্ত জাহাজ ভাড়া চাই।

হঠাৎ ঘাটের ওপর দেখা হল একজন নাবিকের সঙ্গে। মিস্টার ফগকে শুধোলো সে—"হুজুর কি নৌকো খুঁজছেন ?"

"এখুনি বেরোনোর মত তৈরী নৌকো আছে ?"

"আছে হুজুর। পাইলট বোট—আড়কাঠির নৌকো—নম্বর তেতাল্লিশ। এ-বন্দরে সেরা নৌকো।"

"জোরে যেতে পারে তো ?"

"ঘণ্টায় আট ন মাইলের মত যায়। দেখবেন নৌকো ?"

"চল।"

"দেখলেই মনে ধরবে। সমুদ্র বিহারের জন্যে নৌকো চাইত ?"

"না। সমুদ্র যাত্রার জন্যে চাই।"

"সমুদ্র যাত্রা ?"

"হ্যাঁ। ইওকোহামা নিয়ে যেতে হবে আমাকে।"

রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল নাবিকটা। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল শামুকের মত।

"হুজুর—কি পরিহাস করছেন ?"

"না। 'কর্ণাটক' জাহাজে যাওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু যে করেই হোক চোদ্দ তারিখের মধ্যে ইওকোহামা পৌঁছোতে হবে আমাকে—নইলে সানফ্রান্সিসকোর জাহাজ পাবো না।"

"কিন্তু আপনি যা বলছেন তা অসম্ভব।"

"প্রতিদিন একশ পাউণ্ড ভাড়া দেব। আরো দুশ পাউণ্ড বখশিস দেব—চোদ্দ তারিখের মধ্যেই ইওকোহামা পৌঁছে দিতে হবে আমাকে।"

"আপনি কি মন থেকে বলছেন ?"

"মনের একদম ভেতর থেকে।"

তফাতে সরে গেল নাবিক। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। বেশ বোঝা গেল দোটানায় পড়েছে বেচারী। একদিকে মোটা টাকার লোভ, অপর দিকে অতদূরে যাওয়ার ভয়। আর গোয়েন্দা ফিক্স! নিঃসীম উৎকণ্ঠায় ভদ্রলোক যেন কাঁটার ওপর ঝুলতে লাগলেন।

আউদাকে বললেন মিস্টার ফগ—"আপনার ভয় করবে না তো ?"

"আপনি সঙ্গে থাকলে ভয় কিসের ?"

নাবিক ফিরে আসছে। উত্তেজনায় বেচারী মাথায় টুপী খুলে লোফালুফি করছে দুহাতে।

"কি হল ?" শুধোলেন মিস্টার ফগ।

"হুজুর, আমার অত বুকের পাটা নেই। ছোট্ট নৌকো আমার—বড়জোর বিশটন মাল বইতে পারে। বছরের এ-সময়ে দূরপাল্লার পাড়ি জমানো ঠিক হবে না। তাছাড়া সময় মত যাওযাও সম্ভব নয়—ইওকোহামা এখান থেকে ১৬৫০ মাইল।"

"১৬০০ মাইল।"

"ঐ হল গিয়ে।"

এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ফিক্স।

"আর এক কাজ করা যেতে পারে," বলল নাবিক।

আরে সর্বনাশ! আপদ আবার বলে কী? নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে উৎকর্ণ হলেন ফিক্স।

"কি করতে চাও?"

"নাগাসাকি অথবা সাংহাই চলুন, নাগাসাকি এখান থেকে ১১০০ মাইল, সাংহাই ৮০০ মাইল। সাংহাই গেলে সুবিধে আছে। চীন উপকূলের ধার দিয়ে যাওযা যাবে, উত্তর মুখো স্রোতের টান পাওয়া যাবে।"

"কিন্তু আমেরিকার জাহাজ ইওকোহামা থেকেই ধরতে চাই আমি সাংহাই বা নাগাসাকি থেকে নয়।"

"কেন নয়? সানফ্রানসিসকোর জাহাজ ইওকোহামা থেকে ছাড়ে না—ছাড়ে সাংহাই থেকে। যাওয়ার পথে ইওকোহামা আর নাগাসাকিতে দাঁড়ায়।"

"ঠিক জানো?"

"বিলকুল।"

"সাংহাই থেকে কখন ছাড়ে?"

"এগারো তারিখে সন্ধ্যে সাতটায়। হাতে চারদিন মানে, পুরো ছিয়ানব্বই ঘণ্টা রয়েছে। এই সঙ্গে যদি কপাল জোরে দক্ষিণ-পশ্চিম হাওয়া পাই, সমুদ্রও শান্ত থাকে, ৮০০ মাইল পেরিয়ে সাংহাই পৌছোনো অসুবিধে হবে না।"

"বেরোতে পারবে কখন?"

"এক ঘণ্টার মধ্যে। খাবার নিতে আর পাল বাঁধতে যে-টুকু সময় লাগে আর কি।"

"তবে ঐ কথাই রইল। তোমারই তো নৌকো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম জন বুন্সবি—নৌকোর নাম 'তান্‌কাদেরে'।

"আগাম কিছু চাও?"

"হুজুরের অসুবিধে না হলে—"

"এই নাও দুশ পাউণ্ড।" বলে ফিরলেন ফিক্সের দিকে—"আপনি যদি ইচ্ছে করেন তো আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন।"

"ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। ভাবছিলাম আমিই বলব আপনাকে।"

"আধঘণ্টার মধ্যেই তৈরী হয়ে নিন।"

"আহা, চাকরটা রয়ে গেল!" শুকনো মুখে বললেন আউদা।

"দেখি ওর কি করতে পারি," বললেন ফগ।

দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে এবং উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে আড়কাঠি নৌকোয় উঠে বসলেন ফিক্স। ফগ আউদাকে নিয়ে প্রথমে গেলেন হংকং পুলিশ ফাঁড়িতে। সেখানে পাসপার্তুর চেহারার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করলেন। তাকে খুঁজে বার করার জন্যে কিছু টাকাকড়িও রেখে দিলেন। সেখান থেকে গেলেন ফরাসী দূতাবাসে। কিছু টাকা এবং চাকরের দৈহিক বর্ণনা রাখা হল সেখানেও। সেখান থেকে শিবিকা নিয়ে গেলেন হোটেলে। জাহাজ চলে গেছে শুনে মালপত্র ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন হোটেলে। সে সব নিয়ে জাহাজ ঘাটায় ফিরলেন তিনটের সময়ে। আটচল্লিশ নম্বর আড কাঠির নৌকো মাঝিমাল্লা খাবার-দাবার সমেত তখন সমুদ্র যাত্রার জন্যে তৈরী।

তান্‌কাদেরে নৌকোটা ছোট্ট, কিন্তু ঝকঝকে পরিষ্কার। মাল বইতে পারে বিশটন। প্যালতোলা বজরার অনুকরণে তৈরী। দ্রুতগামী এবং মজবুত। সারা গায়ে চকচকে তামার পাত আর দস্তা দিয়ে কলাই করা লোহার কারুকাজ। হাতীর দাঁতের মত ধবধবে সাদা ডেক। বুন্সবির রুচি আছে বটে। জোড়া মাস্তলে লাগানো তেকোনা পাল— সামনে এবং পেছনে। কোনোটা লাগে ঝড়ের সময়ে, কোনোটা অন্য সময়ে। ঝড় ঠেলে এগিয়ে যাবার জন্যে যা যা সরঞ্জাম সবই আছে। মোট কথা, 'তান্‌কাদেরে'কে দেখলেই মনে হয়, এ নৌকো ছোটে ভালো। বেশ কয়েকবার পাইলট-বোট রেসে প্রাইজ জিতে তা প্রমাণও করেছে 'তান্‌কাদেরে'। নৌকোর মাঝি মাল্লার মধ্যে জন বুন্সবি নিজে এবং আরও চারজন গাঁট্টাগোট্টা খালাসী। চীন সমুদ্রের মতিগতির নাড়িনক্ষত্র জানে তারা। জন বুন্সবির বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। রোদে পোড়া চনমনে চেহারা। পিচ্ছিল চোখে অফুরন্ত কর্মচাঞ্চল্য। মুখের ভাবে পরিস্ফুট সুগভীর আত্মবিশ্বাস আর আত্মশক্তি। এ-লোকের সংস্পর্শে এলে নেহাৎ নেতিয়ে পড়া মানুষের মনেও উৎসাহ-উদ্যম সঞ্চারিত হয়। আত্মশক্তিকে যেন সে চালনা করতে পারে সঙ্গীসাথীদের মধ্যে।

ডেকে উঠলেন ফগ এবং আউদা। ফিক্স আগেই উঠে বসে আছেন সেখানে।

ডেকের নীচে একটা চৌকোনা কেবিন। চারটে দেওয়াল খাটের আকারে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে একটা গোলাকার গদীমোড়া ডিভানের ওপর। ঠিক মাঝখানে টেবিলের ওপর ঘুরন্ত লম্ফ। স্বল্পপরিসরে বেশ ছিমছাম ব্যবস্থা।

ফিক্সকে বললেন ফগ—"আপনাকে এর চাইতে ভালো ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে পারছি না বলে আমার কুণ্ঠার শেষ নেই জানবেন।"

ফগের সহৃদয় আতিথেয়তায় ফিক্সের গায়ে যেন বিছুটির জ্বালা ধরে গেল। নিজেকে মানে খাটো মনে হল ব্যাঙ্ক চোরের সামনে।

মনে মনে বলল—"ওঃ খুব যে মুখমিষ্টি দেখছি। রাস্কেল না হলে এমনি ভদ্র কেউ হয়!"

তিনটে দশে ইংরেজ পতাকা উড়ল মাস্তুলের ডগায়। শেষবারের মত জেটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন ফগ এবং আউদা পাসপার্তুকে দেখার আশায়। ফিক্সের প্রাণেও স্বস্তি ছিল না নৌকো না ছাড়া পর্যন্ত—দুম্ করে চাকরটা এসে পড়লেই কেলেংকারী! কিন্তু ফরাসী ভৃত্য বোধ হয় তখনো চণ্ডু এবং মদের নেশায় বুঁদ হয়ে স্বপ্নের সপ্তম স্বর্গে চড়ে বসেছিল—তাই তার ছায়াও দেখা গেল না জাহাজ ঘাটায়।

নৌকো ছাড়ার নির্দেশ দিল বুন্সবি। হাওয়ার ঠেলায় ফুলে উঠল সামনের আর পেছনের পাল। মরাল ভঙ্গিমায় ঢেউয়ের মাথা টপকে এগিয়ে গেল 'তানকাদেরে'।

২১ ॥ গেল বুঝি ফসকে বখশিশের টাকা

বিশ টন নৌকো নিয়ে ৮০০ মাইল পাড়ি দেওয়া কম দুঃসাহসিকতা নয়। বিশেষ করে জল বিষুব আর মহাবিষুবের* সময়ে চীন সমুদ্রে ঝড়-জল লেগেই থাকে। নভেম্বরের গোড়ার দিকে রওনা হচ্ছেন যাত্রীরা—সুতরাং পথ নিষ্কণ্টক না থাকাই সম্ভব।

টাকার লোভে বেরিয়েছে বুন্সবি। দৈনিক একশ পাউণ্ড কম কথা নয়। কিন্তু সাংহাই পাড়ি দেওয়াটা নেহাতই হঠকারিতা। তবে 'তান্‌কাদেরে'র ওপর অসীম আস্থা বুন্সবির। গাংচিলের মত উড়ে চলে যে নৌকো। তাকে বিশ্বাস করা যায়।

ডেকের ওপর পা ফাঁক করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন ফিলিয়াস ফগ ঝাকু

* জল বিষুব (তেইশে সেপ্টেম্বর) এবং মহাবিষুব (একুশে মার্চ)—এই দুদিন দিন আর রাত সমান হয়। সম্পাদক।

নাবিকের মত। রাণী আউদা ত্রাস বিস্ফারিত চোখে দিগন্ত বিস্তারিত সমুদ্রের বড়-বুড় ঢেউয়ের পানে তাকিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল ডেক-চেয়ারে। এই তো অপলকা নৌকো, মাথার ওপর পাখীর সাদা ডানার মত পত-পত করছে সুবিশাল পাল—সীমাহীন এই জলধি পেরোনো যাবে তো? তান্‌কাদেরে কিন্তু অনুকূল হাওয়ায় ঠিক পাখীর মতই যেন উড়ে চলল বাতাসে ভর করে।

রাত নামল। চাঁদের আলো একটু পরেই নিভে যাবে। ডেকের লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিল বুন্সবি। অন্ধকারে যেন আচমকা কোন জাহাজ ঘাড়ে এসে পড়লে আর দেখতে হবে না—এই গতিবেগের ওপর সামান্যতম টুসকি লাগলেও ছাতু হয়ে যাবে তান্‌কাদেরে। লণ্ঠনের আলোর ওপর তাই এত ভরসা। কুয়াশার অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালাতে হয় এমনি ভাবে।

ফিক্স গলুইয়ের কাছে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছেন। ফগের কাছ থেকে ইচ্ছে করেই দূরত্ব বজায় রাখছেন ভদ্রলোক, কারণ উনি জানেন ফিলিয়াস ফগ কম কথার মানুষ। ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় ধাঁধায় পড়েছেন গোয়েন্দা। ফগ বোডের চালে কিস্তিমাৎ করতে চলেছেন। সোজা চাল দিয়ে কঠিন কাজ সারছেন। লণ্ডন থেকে সরাসরি আমেরিকা না গিয়ে উনি ভূগোলকের চার ভাগের তিন ভাগ মাড়িয়ে ঢুকছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সাধারণ চোর ইনি নন। পৃথিবী পর্যটক হিসেবে পা দেবেন আমেরিকার মাটিতে, হারিয়ে যাবেন জনারণ্যে, ধীরেসুস্থে ভোগ চোরাই টাকা—যা যক্ষপতির রত্নপুরীর সমতুল্য!

সারারাত্রি এবং পরের দিনটাও তান্‌কাদেরে নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলল। হিসেব করে দেখা গেল হংকং থেকে দুশ কুড়ি মাইল আসা গিয়েছে।

সন্ধ্যে থেকে ঝড়ের আভাস দেখা গেল দিগন্তে। ব্যারোমিটারের পারা মাথা পাগলার মত ওঠানামা শুরু করল। সূর্য অস্ত গেল লাল কুয়াশার মধ্যে।

নিজের মনে বিড় বিড করছিল বুন্সবি আর নিমেষহীন চোখে আকাশের হালচাল দেখছিল।

"হুজুরকে একটা কথা বলব?" অনেকক্ষণ পরে ফগকে শুধোলো সে।

"বল।"

"ঝড় আসছে।"

'উত্তুরে ঝড়, না, দখ্‌নে ঝড়?"

"দখ্‌নে ঝড়। টাইফুন।"

"ভালই হল। দখ্‌নে ঝড়ে আরো তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।"

"তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।" ফগের মানসিক দৃঢ়তা দেখে চুপ মেরে গেল বুন্সবি।

সত্যিই ঝড় এল। খালাসীরা আগে থেকেই তৈরী ছিল। বড় পাল নামিয়ে শক্ত তেরপলের তিনকোণা পাল তুলে দেওয়া হল। রাত আটটা নাগাদ সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল চীন সমুদ্রের বিভীষিকা—টাইফুন। পাখীর পালকের মত নৌকোকে উড়িয়ে নিয়ে চলল দামাল হাওয়া। স্টীম-চালিত রেল গাড়ীর চারগুণ গতিবেগ তুচ্ছ সেই বিপুল বেগের কাছে। বিশবার পর্বত প্রমাণ ঢেউ এসে গ্রাস করতে চাইল 'তান্‌কাদেরে'কে—প্রতিবারই রেহাই পেল খালাসীদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। জলে ভেসে গেল ডেক, বহুবার আউদাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচালেন ফগ। ওঁরা দুজনেই ছিলেন ডেকের ওপর। কেবলমাত্র ফিক্স ভয়ে আধ মরা হয়ে বসেছিল তলার কেবিনে।

রাত গেল। দিন গেল—ঝড-জল বিরামবিহীনভাবে প্রলয় চালিয়ে গেল চীন সমুদ্রে। সমুদ্রের সেই ভয়ংকর রূপ দেখে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন রানী আউদা। আর উত্তরোত্তর বিস্মিত হলেন চরম বিপদেও অনড়-অটল একটি মূর্তি দেখে—আশ্চর্য ধাতু দিয়ে গড়া বটে ফিলিয়াস ফগের ভেতরটা!

সন্ধ্যের দিকে অবস্থা আরো খারাপ হল। বাড়ল তাণ্ডব নাচানাচি। মিস্টার ফগের কাছে এসে বলল—"হুজুর, আমার মনে হচ্ছে কাছাকাছি কোনো বন্দরে আশ্রয় নেওয়া দরকার।"

"আমার তাই মনে হচ্ছে।"

"তবে আর কি। কোন্ বন্দরে যাই বলুন তো?"

"আমি তো একটা বন্দরই জানি।

"কোনটা?"

"সাংহাই।"

স্তম্ভিত হয়ে গেল বুন্সবি। পাথর কঠিন সংকল্প আর দৃঢতার এ-হেন রূপ এর আগে সে কখনো দেখেনি। বি" টা চীৎকার হয়ে বেরিয়ে এল গলা দিয়ে—"হুজুর ঠিকই বলেছেন! চলো সাংহাই!"

রাত্রে দুর্যোগ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোলো। তরঙ্গ ভঙ্গের প্রচণ্ড গর্জন, ঢেউয়ের পৈশাচিক নাচ, সাগরের প্রলয়ংকরী রূপ, মহাকালের প্রলয়-নাচন, পাগলা পবনের হাহাকার—সব মিলে-মিশে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না সেই ভয়ংকর দৃশ্যকে।

দু'দুবার জলে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল নৌকো। সব শেষ হয়েও শেষ হল না। আশ্চর্যভাবে দানবিক তরঙ্গে তলা থেকে থেকে যেন উঠে এল তান্‌কাদেরে। রাণী আউদা দেহে-মনে ভেঙে পড়লেন। কিন্তু কান্নাকাটির ধার দিয়েও গেলেন না।

রাত ভোর হল। দুপুর নাগাদ ঝড় নিজেও বুঝি বেদম হয়ে এল। বিকেলের দিকে শান্ত হল আকাশ-বাতাস।

ক্লান্ত, অবসন্ন আরোহীরা নাকে-মুখে যৎসামান্য গুঁজে লম্বমান হল ছোট্ট কেবিনে।

পরের দিন ভোরবেলা দেখা গেল সাংহাই তখনো একশ মাইল।

একশ মাইল! সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে একশ মাইল যাওয়া সম্ভব হবে কী? সাতটার পরে গেলে আমেরিকাব জাহাজ ছেড়ে যাবে। বুন্সবি হারাবে বখশিস, ফগ বিশ হাজার পাউণ্ড!

সন্ধ্যে সাতটা বাজল সাংহাই তখনো তিন মাইল বাকী! নিষ্ফল আক্রোশে মুখে যা আসে তাই বলতে লাগল বুন্সবি। কিন্তু শান্ত সমাহিত মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ফিলিযাস ফগ। এত চেষ্টাব পরেও তাঁর কপাল ভাঙল! অথচ ধ্যানীবুদ্ধর মত অবিচল রইল তাঁর দীর্ঘতনু। শান্ত, সংহত, বোষকলংক শূন্য চাহনির মধ্যে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র রইল না।

ঠিক সেই সময়ে জল যেখানে দিগন্তে মিশেছে, সেইখানে একতাল ধোঁয়া দেখা গেল। ধোঁয়ার মাঝে একটা লম্বা কালো চিমনী।

নির্দিষ্ট সময়ে মার্কিন জাহাজ চলেছে ইওকোহামার দিকে!

"জাহাজ জাহান্নমে যাক!" গলা ফাটিয়ে গালিগালাজ শুরু করল বুন্সবি।

"জাহাজকে সংকেতে ডাকো," শান্ত কণ্ঠে বললেন ফগ।

কুয়াশা ঘিরে ধরলে সিগন্যাল দেওযাব জন্যে একটা পেতলের খুদে কামান ছিল ডেকে। তৎক্ষণাৎ বারুদ ঠাসা হলে নলে। আগুন দিতে যাচ্ছে বুন্সবি, মিস্টার ফগ বললেন—"ফ্ল্যাগ তোলো!"

অর্ধেক তোলা হল পতাকা। বিপদ-জ্ঞাপক নিশানা দেখে আমেরিকান জাহাজ নিশ্চয় দৌড়ে আসবে 'তান্‌কাদেরে'র কাছে।

"কামান দাগো!" বললেন ফগ।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জে উঠল কামান!

২২। পাসপার্তুর নিঃসম্বল অবস্থায় নতুন শিক্ষা —খালি ট্যাঁকে পথ চলা ঠিক নয়

সাতুই নভেম্বর সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় হংকং বন্দর ছেড়ে রওনা হয়েছিল কর্ণাটক জাহাজ। জাহাজ ভর্তি মালপত্র এবং আরোহী নিয়ে পুরোদমে জাপানের দিকে চলল কর্ণাটক—খালি গেল কেবল দুটি খানদানী কেবিন—ফিলিয়াস ফগের জন্যে রক্ষিত দুটি স্টেট-রুম।

পরের দিন ভোরবেলা ঢুলু-ঢুলু চোখে অসংযত চরণে দ্বিতীয় কেবিন থেকে বেরিয়ে এল এক ব্যক্তি। চুল তার উস্কখুস্ক—জামাকাপড় ঠিক নেই—ঠিক যেন একটা ঝড়ো কাক। টলতে টলতে একটা ডেকচেয়ারে ধপ করে হতবুদ্ধির মত বসে পড়ল কিম্ভুতদর্শন আরোহী।

লোকটি আর কেউ নয়, আমাদের পাসপার্তু।

গোয়েন্দা ফিক্স জ্ঞানহীন পাসপার্তুকে গুলির আড্ডায় ফেলে রেখে চম্পট দেওয়ার পর দুজন বেয়ারা এসে তাকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে শুইয়ে দিল নেশাখোরদের বিছানায়। ঘণ্টা তিনেক পরে সামান্য জ্ঞান সঞ্চার হল পাসপার্তুর। স্বপ্নের ঘোরে বদ্ধমূল ধারণার মধ্যে একটা চেতনাই কেবল একগুঁয়ের মত উত্যক্ত করে চলল তাকে।

তীব্র কর্তব্য চেতনা তাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন হওয়া থেকে নিরস্ত করে রাখল অতি ক্ষীণ ভাবে। যে কাজ নিয়ে কর্তা তাকে পাঠিয়েছেন, তা এখনো শেষ হয়নি—অসমাপ্ত এই কর্তব্যবোধ তার নেশা ছুটোতে না পারলেও চণ্ডুর আড্ডা থেকে টেনে নিয়ে এল। মাথার মধ্যে কেবল একটি কথাই ঘুরতে লাগল—কর্ণাটক জাহাজ।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। টলতে টলতে বাড়ী-ঘরদোরের দেওয়াল ধরে ধরে বেরিয়ে পড়ল সে। যেন স্বপ্নের ঘোরে 'কর্ণাটক', 'কর্ণাটক' চীৎকার করতে করতে চলল জেটির দিকে। কতবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল বেসামাল চরণে, আবার উঠল সম্পূর্ণ মনের জোরে। হোঁচট খেতে খেতে এসে পৌঁছোল জাহাজঘাটায়।

নাবিকরা তখন জাহাজের সিঁড়ি তুলতে চলেছে। মাত্র কয়েক পা আর বাকী। ছুটে গিয়ে ডক্কা পেয়ে গেল পাসপার্তু। জাহাজের ডেকে কোন মতে উঠেই সেই যে হতচেতন হয়ে পড়ল, আর কোন সাড় রইল না।

কর্ণাটক তখন ভেঁপু দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। নাবিকরা নেশাগ্রস্ত আরোহীর দুর্দশা দেখে অবাক হল না। এ-রকম কাণ্ড হামেশাই দেখতে হয় তাদের। সুতরাং নিঃসাড় পাসপার্তুকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল কেবিনের মধ্যে।

জাহাজ যখন চীনসমুদ্রে দেড়শো মাইল চলে এসেছে, জ্ঞান-সঞ্চার ঘটল পাসপার্তুর। সমুদ্রের টাটকা বাতাস ওর নেশায় আচ্ছন্ন জড়বুদ্ধিকে আস্তে-আস্তে পরিষ্কার করে দিল। মাথা সাফ হতেই অন্যান্য অনুভূতিগুলো ফিরে এল তারও অনেক পরে। একটু-একটু করে মনে পড়ল গতকাল সন্ধ্যায় চণ্ডুর আড্ডায় নেশা করার ঘটনা আর ফিক্সের দুরভিসন্ধি।

হায়-হায় করতে লাগল পাসপার্তু। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। মাতলামি করার জন্যে মিস্টার ফগ নিশ্চয় তাকে খুব বকাবকি করবেন। তবে একটা দিক দিয়ে খুব রক্ষে পাওয়া গেছে। জাহাজে উঠে বসা গেছে, এই বাঁচোয়া। নইলে কেলেংকারীর একশেষ হত। আর সেই হারামজাদা গোয়েন্দাটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে, এটাও কম কথা নয়। আশ্চর্য! অমন দেবতুল্য মনিবকেও চোর ভাবতে পারে কেউ? শুধু তাই নয়, পেছনে টিকটিকি ঘুরছে সেই লণ্ডন থেকে! তোবা! তোবা! খুন-জখম যেমন আমার ধাতে আসে না, চুরি-ডাকাতিও তেমনি আমার মনিবের কুষ্ঠীতে লেখেনি!

ফিক্স শয়তানটার কুউদ্দেশ্য মিস্টার ফগের কাছে ফাঁস করাটা সমীচীন হবে কি? ফিক্সের নোংরা কেরামতি তাঁর কানে তুলে দিলে কেমন হয়? নাকি লণ্ডন ফিরে গিয়ে বলবে পাসপার্তু? একজন গোয়েন্দা সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছে তাঁর পেছন পেছন, এ খবর শুনলে তো হাসির হুল্লোড় পড়ে যাবে! যাই হোক, আগে তো মিস্টার ফগকে খুঁজে বার করা যাক, মাতলামো করার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া যাক – তার পরের কথা পরে।

উঠে দাঁড়াল পাসপার্তু। কিন্তু সারা জাহাজ তন্নতন্ন করে খুঁজেও মনিব বা রানী আউদাকে দেখতে পেল না। মনে মনে ভাবল, রানী বুঝি এখনো ঘুমোচ্ছেন এবং মিস্টার ফগ হুইস্ট খেলায় মত্ত হয়েছেন।

সেলুন ঘরে গেল পাসপার্তু। কিন্তু সেখানে তাসের আড্ডা বা মিস্টার ফগের মূর্তি—কোনোটাই দেখা গেল না।

তখন সে জাহাজের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করল মিস্টার ফগের কেবিনের নম্বর কত। তিনি সরাসরি জবাব দিলেন, ঐ নামে কোনো আরোহী জাহাজে ওঠে নি।

কিন্তু ছিনেজোঁকের মত লেগে রইল পাসপার্তু—"কি যে বলেন! ভদ্রলোক মাথায় বেশ লম্বা, সুপুরুষ, শান্ত চেহারা, কম কথা বলেন। সঙ্গে আছেন কম বয়েসী মহিলা—"

"জাহাজে কোনো মহিলা নেই," বললেন অফিসার। "এই দেখুন আরোহীদের নামের তালিকা। ঐ ধরনের কোনো নাম আছে কি?"

তন্নতন্ন করে তালিকা দেখল পাসপার্তু। মনিবের নাম পেল না, তখন একটা সন্দেহ উঁকি দিল মাথায়।

শুধোলো—"আচ্ছা, আমি 'কর্ণাটক' জাহাজেই উঠেছি তো?"

"হ্যাঁ।"

"ইওকোহামা যাচ্ছি?"

"নিশ্চয়।"

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন! এতক্ষণ সন্দেহ হয়েছিল বুঝি বা ভুল জাহাজে উঠেছে। কিন্তু তাতো নয়। কর্ণাটক জাহাজেই উঠেছে সে—ওঠেন নি কেবল মিস্টার ফগ।

বজ্রাহতের মত চেয়ারে বসে পড়ল পাসপার্তু। এতক্ষণে ধাঁধাটা পরিষ্কার হল তার কাছে। মনে পড়ল, জাহাজ ছাড়ার সময় যে পালটেছে, সে খবর তো মনিবকে দেওয়া হয় নি! তারই দোষে মিস্টার ফগ এবং রানী আউদা জাহাজে উঠতে পারেন নি। তার চাইতেও বড় অপরাধী হল সেই গোয়েন্দা বদমাসটা। মনিবের সঙ্গে ভৃত্যর বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যেই তাকে নেশার ঘোরে বেহুঁস করে পালিয়েছে! গোয়েন্দার চালাকি এবার ধরা পড়ল তার কাছে। ফলে, সর্বনাশ হয়ে গেল মিস্টার ফগের। বাজী হেরে কপর্দকশূন্য হলেন, হয়ত বা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছেন এবং শ্রীঘরে বন্দী রয়েছেন!

মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল পাসপার্তু। ফিক্সকে যদি হাতের কাছে পাওয়া যেত, হিসেব নিকেশটা মিটিয়ে নেওয়া যেত!

বিষাদের প্রচণ্ডতা একটু-একটু করে অপসৃত হল। শান্ত হল পাসপার্তু। নিজের ভাবনায় ব্যস্ত হল এতক্ষণে। জাপান পর্যন্ত পয়সা লাগবে না। কারণ পাইক্রান্থি ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাবার দাবার নিয়েও ভাবনা নেই। মিস্টার ফগ আর রানী আউদার খাবার গুলোও সে গোগ্রাসে গিলবে'খন। সত্যি সত্যিই খাবার টেবিলে তার খাওয়া দেখে মনে হল যেন জাপান দেশটা একটা মরুভূমি—খাবার দাবারের অভাব আছে সেখানে।

তেরো তারিখে ইওকোহামা পৌছোলো 'কর্ণাটক'। পকেটে কাণাকড়ি নেই পাসপার্তুর। ভয়ে ভয়ে সে 'সূর্য-সন্তান'দের দেশে পা দিল অদৃষ্টকে সম্বল করে।

২৩॥ পাসপার্তুর নাক ছ'ফুট বেড়ে গেল

পকেটে কাণাকড়িও না নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে লড়তে গেলে পেট ভরে খেয়ে নেওয়া দরকার। বেচারা পাসপার্তু সেই কারণেই আকণ্ঠ খেয়ে নিয়েছিল জাহাজে।

'শয়নং হট্টমন্দিরে' নীতি অনুসরণ করে রাতটা কাটল কোন মতে। পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙল ক্ষিদের জ্বালায়। এখুনি কিছু না খেলেই নয়। পেটের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে।

কিন্তু ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ। ঘড়িটা বেচে দেওয়া যাবে'খন। কিন্তু তার আগে গতর খাটিয়ে পেট ভরানো যায় কিনা দেখা যাক। পাসপার্তুর গানের গলাটি খাসা, মিনমিনে গলা অবশ্য নয়—তেড়েমেড়ে গিটকিরি দেওয়ার মত দিলদরিয়া গলা, জোরালো হলেও গলার মধ্যে সুরের ওঠানামা আছে—ঈশ্বরকৃপায় গানের গলা তার জন্মসূত্রে পাওয়া। বেশ কয়েকটা ফরাসী আর ইংরেজী গানও জানা আছে। জাপানীরা সমঝদার জাত, গানবাজনার কদর করতে জানে। খঞ্জনী, করতাল, ঢাকের একঘেয়ে বাদ্যির মধ্যে বিলিতি গান মন্দ জমবে না।

অত ভোরে অবশ্য কনসার্ট শোনানোর শ্রোতা পাওয়া মুস্কিল। ঘুম থেকে টেনে এনে গান শোনানো তো যায় না। শোনালেও মিকাডোর মূর্তি আঁকা নগদ মুদ্রার বদলে ঘাড়ধাক্কা জুটবে বরাতে। তার চাইতে বরং ঘণ্টা কয়েক সবুর করাই ভাল।

কিন্তু বিলিতি পোশাকটা বেখাপ্পা লাগছে না? জাপানীদের চিত্তবিনোদন করতে হলে জাপানী পোশাক পরাই সমীচীন। অনেক ভেবেচিন্তে পাসপার্তু পোশাক বিনিময় করা মনস্থ করল। বিলিতি পোশাকের বদলে জাপানী পোশাক, সেই সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা ক্ষিদে নিবারণ করার জন্যে। মতলব স্থির হতেই দ্রুত পা চালালো সে।

অনেক খুঁজে একটা পুরোনো জামাকাপড়ের দোকান পাওয়া গেল। দোকানদার মহাখুশী পাসপার্তুর নিখুঁত ইউরোপীয় পোশাক দেখে। তার বদলে এগিয়ে দিল একটা জরাজীর্ণ জাপানী কোট, একটা বিবর্ণ একপেশে পাগড়ী। সেই সঙ্গে কিছু নগদ পয়সা। পকেটে ঝনাঝন শব্দে পয়সার বাজনা জাপানী পোশাক পরা বোম্বেটে ছুটল একটা চায়ের দোকানে। ভাত টাত খেয়ে উদরকে প্রসন্ন করল তখনকার মত।

পেটের ভাবনা সাময়িক ভাবে রেহাই দিতে শুরু হল ভবিষ্যতের ভাবনা। জাপানী পোশাক পালটে আর এক প্রস্থ পোশাক এবং পয়সা পাওয়ার সম্ভাবনা আর নেই। সময় থাকতেই সূর্যদেবের এই দেশ থেকে পিঠটান দেওয়া দরকার।

মাথায় নতুন বুদ্ধি এল। আমেরিকাগামী কোনো জাহাজে বিনা মাইনের চাকরী নিলে হয় না? দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার বিনিময়ে সে বাবুর্চি থেকে আরম্ভ করে খিদমৎগার পর্যন্ত হতে রাজী—কিন্তু তাকে আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। চারহাজার সাতশ মাইল জল পথ পেরিয়ে একবার সানফ্রান্সিসকোর মাটিতে পা দেওয়ার পর একটা কিছু হিল্লে হয়ে যাবে'খন।

পাসপার্তু হল "উঠল-বাই-তো-কটক-যাই' জাতের মানুষ, মাথায় কিছু

খেয়াল চাপলে হল, তক্ষুণি তা করা চাই। সুতরাং হন হন করে সে রওনা হল জাহাজঘাটার দিকে। কিন্তু জাহাজঘাটা যতই কাছে আসতে লাগল, পাসপার্তুর উৎসাহ ছিপিখোলা সোডার বোতলের গ্যাসের মতই ভস্‌ভস্‌ করে উবে যেতে লাগল। মুখ দেখেই কি রান্নাবান্নার ভার তার ওপর দিয়ে দেবে আমেরিকাগামী জাহাজ? অসম্ভব! পোশাকের এই তো ছিরিছাঁদ, তার ওপর কারো সুপারিশও নেই পকেটে। চাকরী কি হাতের মোয়া?

মনে মনে যখন এই ধরনের জ্ঞানোদয় ঘটছে ধীরে ধীরে, ঠিক তখনি রাস্তার ওপর একটা প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপনের দিকে নজর পড়ল পাসপার্তুর। রঙচঙে পোশাক পরা সার্কাসের এক সঙ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাকার্ডটা। তাতে ইংরেজীতে লেখা আছে:

স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী
উইলিয়াম বাটুলকারের জাপানী বাজীকরের দল!
আমেরিকা যাত্রার পূর্বে
অদ্যই শেষ রজনী!
দীর্ঘনাসা! দীর্ঘনাসা!
ভগবান টিঙ্গুর সরাসরি মুরুব্বিয়ানায়
দীর্ঘনাসার অত্যাশ্চর্য খেলা!
আসুন! দেখুন!! উপভোগ করুন!!!

বিজ্ঞাপন দেখেই লাফিয়ে উঠল পাসপার্তু।—"বাজীকরের দল আমেরিকা চলেছে? এই তো চাই—আমিও তো আমেরিকা যেতে চাই।"

বিজ্ঞাপনবাহক সঙের পেছন পেছন গিয়ে জাপানী পল্লীতে হাজির হল পাসপার্তু। সোয়া ঘণ্টা পরে এসে দাঁড়াল মস্ত একটা কেবিনের সামনে। কেবিনের দেওয়ালে চড়া রঙের অগুন্তি পোস্টার। সব পোস্টারেই এক বিজ্ঞাপন—বাজীকরদের পিলে চমকানো খেলার ছবি!

এই হল সুবিখ্যাত উইলিয়াম বাটুল্‌কারের আস্তানা। লোকটা নিজেই যেন একজন বার্ণাম।* দমবাজ, ভণ্ড, হাতসাফাইয়ের ভোজবাজিকর, বাজীকর, ব্যায়ামবীরদের পাণ্ডা সে—সোজাকথায় দলের অধিকারী—ডিরেক্টর। সূর্য-সাম্রাজ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র রওনা হওয়ার আগে এ-দেশে সেই তার শেষ খেলা।

*বার্ণাম (১৮১০-৯১) নামী শো-ম্যান ছিলেন। বিবিধ প্রদর্শনীর আয়োজন করতে তাঁর জুড়ি ছিলনা। সম্পাদক।

সোজা ভেতরে ঢুকে বাটুলকারের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করল পাসপার্তু। তৎক্ষণাৎ নিজেই বেরিয়ে এল বাজীকরদের শিরোমণি।

"কি চাই?"

"আজ্ঞে, আপনার চাকর দরকার আছে?"

"চাকর!" ঝোপের মত পুরু ধূসর দাড়ির ওপর দুহাত ভাঁজ করে রাখল উইলিয়াম বাটুলকার। "বাপু হে, আমার দুটো চাকর আছে। বড় বিশ্বাসী চাকর, বড্ড ভালবাসে আমাকে। জীবনে কাছ ছাড়া হয়নি—হবেও না। এই ছাখো!" বলে মোটা মোটা শিরাওলা লোমশ হাত দুটো নাড়তে লাগল পাসপার্তুর নাকের ওপর।

বেগতিক দেখে চটপট বলল পাসপার্তু—"তাহলে আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবেনা আপনার?"

"একদম না।"

"হায়রে! ভেবেছিলাম আপনাদের দলে ভিড়ে প্রশান্ত মহাসাগর টপকে যাব!"

"আমার মত তুমিও জাপানী নও, অথচ জাপানীর সাজ পরেছো কেন?"

"সাধ্যে যে রকম কুলোয়, সেইরকম পোশাক তো পরতে হবে।"

"তা ঠিক, তা ঠিক। তুমি তো ফরাসী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। প্যারিসের বাসিন্দা।"

"তাহলে নিশ্চয় ভেংচি কাটতে পারো?"

"তা পারি," স্বজাতি সম্পর্কে এ-হেন বক্রোক্তি বেমালুম হজম করতে না পেরে ঈষৎ খোঁচা মারল শেষের কথায়—"আমেরিকানদের চেয়ে অবশ্য ভাল পারি না।"

"তা ঠিক, তা ঠিক। তোমাকে চাকরী দিতে পারি সঙ হিসেবে। কেননা, ফ্রান্সে সঙ সাজে বাইরের লোক—আর বাইরে সঙ সাজে ফ্রান্সের লোক।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি।"

"গায়ে জোর আছে তো?"

"খেলে-দেলে জোরটা আরো বাড়ে।"

"গান গাইতে পারো?"

"তা পারি," এককালে রাস্তায় রাস্তায় গান গাইত পাসপার্তু।

"মাথার ওপর উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ পায়ে ঘুরন্ত লাট্টু আর ডান পায়ে খাড়াই তলোয়ার ডগার ওপর খাড়া রেখে গান গাইতে পারবে?"

"ও আর এমন কি ব্যাপার," পুরোনো দিনের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল পাসপার্তুর।

"বেশ, বেশ ওতেই হবে," বলল উইলিয়াম বাটুলকার।

তৎক্ষণাৎ বাজীকরের দলে চাকরী হয়ে গেল পাসপার্তুর। ভগবান টিঙুর দীর্ঘনাসা ভক্তরা আজ জগন্নাথের রথ দেখাবে। পাসপার্তুকেও থাকতে হবে তাদের মধ্যে। কাজটা সম্মানজনক না হলেও দিন সাতেকের মধ্যেও আমেরিকা রওনা হওয়া যাবে তো!

বাটুলকার শহরময় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানিয়েছে খেলা শুরু হবে বেলা তিনটের সময়ে। রঙ্গমঞ্চে লোক গিজগিজ করছে। কানে তালা লাগানো শব্দে ঐকতান-বাজনা বাজছে। সব খেলার শেষ খেলা হল জগন্নাথের রথ। অর্থাৎ পঞ্চাশজন দীর্ঘনাসা জগন্নাথের রথ বানাবে মানুষ-পিরামিড সৃষ্টি করে। এ-খেলার বৈশিষ্ট্য হল দীর্ঘনাসারা গতানুগতিকভাবে কাঁধাকাঁধি করে অর্থাৎ একজনের কাধে আর একজন দাঁড়িয়ে তৃতীয়জনকে কাঁধ দিয়ে পিরামিড বানাবে না। গোটা পিরামিড গড়ে উঠবে নাকের ওপর। পিরামিডের নির্ভর-স্তম্ভ স্বরূপ যে বলিষ্ঠ মানুষটি অ্যাদ্দিন খেলা দেখিয়েছে, শেষ মুহূর্তে সে সটকান দেওয়ায় ডাক পড়েছে পাসপার্তুর। এ কাজে প্রয়োজন কেবল দৈহিক শক্তি আর ক্ষিপ্রতা।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে নানা রঙে রঙীন সাজগোজ করল পাসপার্তু। মনটা মুষড়ে পড়ল পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ায়। রঙচঙে একজোড়া ডানা লাগানো হল দুপাশে। ছ' ফুট লম্বা এক নাক এঁটে বসানো হল ওর আসল নাকের ওপর। মনটা একটু প্রফুল্ল হল একটা কথা ভেবে—নাকটা হতকুচ্ছিৎ হোক গে, এই নাকের বিনিময়ে পেট ভরে খাওয়া তো মিলবে!

নকল নাকের তলায় লুকোনো হাত চ'রেক লম্বা বাঁশের ওপর গড়ে উঠবে জগন্নাথের রথ। মঞ্চে এসে দাঁড়াল দীর্ঘনাসা ভক্তরা। পাসপার্তুও আছে তাদের মধ্যে। কয়েকজন দীর্ঘনাসা শুয়ে পড়ল মঞ্চের পাটাতনে। আরো কয়েকজন শুল তাদের নাকের ওপর। তাদের ওপর আরো একটা দল। এইভাবে থাকে থাকে মানুষ-মন্দির-জগন্নাথের রথ উঠতে লাগল ওপর দিকে। উঠতে উঠতে সৌধ-শীর্ষ যখন রঙ্গমঞ্চের ছাদ স্পর্শ করেছে, তখন ঘনঘন হাততালিতে, আনন্দ ধ্বনিতে অভিনয়-মণ্ডপ—যেন কেঁপে উঠল থর থর করে।

ঐকতান-বাজনা কর্ণবধিরকারী শব্দে বেজে উঠল। একেই বলে ক্লাইম্যাক্স—চূড়ান্ত মুহূর্ত!

এই ক্লাইম্যাক্সেই ঘটল সেই অভাবনীয় ঘটনা।

আচম্বিতে কেঁপে উঠল মানুষ-মন্দির। বেসামাল হয়ে দুলছে ছাদস্পর্শী সৌধ-চুড়ো। নিমেষ মধ্যে একদম তলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল একটা নাক। সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথের রথ তাসের কেল্লার মত ধুমধাম দুড়দাড় শব্দে ছিটকে ভেঙে পড়ল মঞ্চের ওপর।

বিভ্রাটটি ঘটল পাসপার্তুর জন্যে। মনুষ্য মন্দিরের দীর্ঘনাসা ভক্তরা যখন শূন্য পথে মঞ্চে আছাড় খাচ্ছে একে-একে, পাসপার্তু তখন তীরের মত ছুটছে—ডানার সাহায্য না নিয়েই একলাফে টপকে এল পাদ প্রদীপ, হাঁচড় পাঁচড় করে ডানদিকের গ্যালারী বেয়ে একজন দর্শকের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে আবেগঘন ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল উন্মাদের মত—"প্রভু···আমার প্রভু···"

"তুমি এখানে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ আমি।"

"চলো জাহাজে।"

মিস্টার ফগ, রানী আউদা এবং পাসপার্তু বেরিয়ে এলেন। রঙ্গমঞ্চের বাইরে আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলছিল দলের অধিকারী মিস্টার বাটুলকার। জগন্নাথের রথ ভেঙে দেওয়ার জন্যে পাসপার্তুর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করল সে। মিস্টার ফগ এক তাড়া নোট তার হাতে গুঁজে দিলেন। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছটার সময়ে পৌছোলেন আমেরিকান জাহাজে। গোলমালের ঠেলায় ছফুট লম্বা নাক আর রঙচঙে ডানা দুটো নিয়েই জাহাজে উঠে পড়ল পাসপার্তু।

২৪॥ প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে

সাংহাই বন্দরে কি ঘটেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। 'তান্‌কাদেরে'র সংকেতধ্বনি শুনেছিল ইওকোহামাগামী জাহাজের ক্যাপ্টেন—দেখেছিল অর্ধেক নামানো রয়েছে নৌকোর পতাকা। তৎক্ষণাৎ জাহাজ এসে ভিড়ল নৌকোর গায়ে। ফিলিয়াস ফগ বুন্সবির পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিলেন এবং বখশিস দিলেন সাড়ে পাঁচশ পাউণ্ড। ফিক্স এবং আউদাকে নিয়ে উঠে বসলেন জাহাজে।

ইওকোহামা পৌছোলেন চোদ্দই নভেম্বর। তৎক্ষণাৎ 'কর্ণাটিক' জাহাজে গিয়ে শুনলেন, পাসপার্তু নামে এক ফরাসী গতকাল জাহাজ থেকে নেমে গিয়েছে। শুনে উল্লাসের অবধি রইল না আউদার। ফগের মনে আনন্দ হলেও বাইরে তা প্রকাশ পেল না।

সেইদিন সন্ধ্যায় সানফ্রান্সিসকো রওনা হবে জাহাজ। মিস্টার ফগ বৃথাই পাসপার্তুর খোঁজ নিলেন ইংরেজ এবং ফরাসী দূতাবাসে। শেষকালে দৈবাৎ যদি তাকে চোখে পড়ে, এই ভরসায় রাস্তাঘাটে টো-টো করলেন সারাদিন।

কপালজোরে চোখে পড়ল স্বনামধন্য মিস্টার বাটুলকারের রঙ্গমঞ্চ। যদি দর্শকদের মধ্যে বেচারাকে দেখা যায়, এই রকম একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে রাণী আউদাকে সঙ্গে করে তিনি একদম সামনের আসনে বসেছিলেন। দীর্ঘনাসার কিম্ভূতকিমাকার ছদ্মবেশে পাসপার্তুকে তিনি চিনতে পারেন নি। কিন্তু পাদপ্রদীপের আলোয় পাসপার্তু তাঁকে চিনেছিল। এমন চমকে উঠেছিল যে নাক কাঁপিয়ে টলমল করে ছেড়েছিল মনুষ্যমন্দিরকে। তারপর হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মনুষ্য-মন্দিরকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে আছড়ে পড়েছিল হারানো মনিবের পদতলে।

হংকং থেকে সাংহাই অভিযানের রোমাঞ্চকর বর্ণনা রাণী আউদা শুনিয়েছিলেন তাকে। জনৈক মিস্টার ফিক্সকেও নাকি জাপান নিয়ে এসেছেন মিস্টার ফগ।

ফিক্সের নাম শুনে কিন্তু কোনোরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না পাসপার্তু। সব কথা বলার সময় হয়নি এখনো। তাই ফিক্স-প্রসঙ্গ বেমালুম চেপে গেল মনিবের কাছে। শুধু বলল চণ্ডুর আড্ডায় আফিং খেয়ে তার এত দুর্দশা।

মিস্টার ফগ শুধু শুনলেন, কোনো কথা বললেন না। কিছু টাকা দিলেন নতুন জামা-কাপড় কিনতে। এক ঘণ্টার মধ্যে নাক আর ডানা বিসর্জন দিয়ে ফের সভ্যভব্য হল পাসপার্তু।

আমেরিকাগামী এই জলপোতটি আসলে একটা ডাক জাহাজ। পি-এম-এস কোম্পানীর জাহাজ। নাম 'জেনারেল গ্রান্ট'। এ-জাহাজ চলে প্রকাণ্ড প্যাডল-চাকার সাহায্যে। ওজন বইতে পারে আড়াই হাজার টন। বলা-বাহুল্য, জাহাজটা বিলক্ষণ বেগবান।

মিস্টার ফগ আগেও যা, এখনো তাই, ধীর, স্থির, সংহত স্বল্পবাক। সঙ্গিনী ভদ্রমহিলা ক্রমশঃ আকৃষ্ট হচ্ছিলেন তাঁর প্রতি। ছোট ছোট আবেগের ঢেউগুলো কিন্তু যেন কোনো সাড়া তুলতে পারছিল না উদাসীন ফগের চিত্তে। তা সত্ত্বেও চলন্ত এই গণিতযন্ত্রটিকে উত্তরোত্তর ভাল লাগছিল রাণী আউদার। ভাল লাগছিল বাজী ধরে ভূ-প্রদক্ষিণের এই দুঃসাহসিকতা। তাই ফগের পরিকল্পনা রাণী আউদাকেও উদ্দীপিত করেছিল। যাত্রাপথে তিলমাত্র বিঘ্ন ঘটলে আউদা আর ধৈর্য রাখতে পারতেন না।

পাসপার্তু তাঁর জন্যে যা করেছে, তা ভোলবার নয়। তাই প্রায়ই তার

সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইতেন আউদা। ভদ্রমহিলার মনের অবস্থা বুঝতে বাকী ছিল না পাসপার্তুর। তাই তাল বুঝে গুণকীর্তন করত দেবতুল্য মনিবের। ওরকম সাধুতা, উদারতা, নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার তুলনা হয় না। আউদার উৎকণ্ঠা নিবারণের জন্যে আশ্বাস দিয়ে বলত, নির্বিঘ্নে ভূ-প্রদক্ষিণ সাঙ্গ করে নির্দিষ্ট সময়ে দেশে ফিরবেন ফিলিয়াস ফগ। যাত্রা পথের সব চাইতে দুর্ঘট অংশটুকু পেরিয়ে আসা গিয়েছে। চীন জাপানের মত ফ্যানটাসটিক দেশ পেছনে পড়েছে। সামনে রয়েছে কেবল সুসভ্য দেশ। সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউইয়র্ক রেলপথে, নিউইয়র্ক থেকে লিভারপুল জলপথে পাড়ি দিলেই সম্ভব হবে ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণের মত একটা অসম্ভব ব্যাপার।

ইওকোহামা ছেড়ে আসার নবম দিনে অর্থাৎ তেইশে নভেম্বর দেখা গেল ভূ-গোলকের ঠিক অর্ধেক পরিক্রমা করে এসেছেন ফিলিয়াস ফগ। আশীদিনের মধ্যে বাকী আছে আর মাত্র আটাশ দিন।

তেইশে নভেম্বরেই পাসপার্তু খুশীতে ডগমগ হল একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করে। বাপঠাকুর্দার আমলের যে ঘড়িটির কাঁটা ঘুরিয়ে দেশদেশান্তরের দ্বিপ্রাহরিক সময়ের সঙ্গে মিলোতে সে কিছুতেই রাজী হয় নি, তেইশে নভেম্বর দেখা গেল তার বিশ্বস্ত ঘড়ির জাহাজে রাখা ক্রোনোমিটারের সময় হুবহু মিলে যাচ্ছে। পাসপার্তুর আনন্দ তখন দেখে কে। ফিক্সকে এই সময়ে হাতের কাছে পাওয়া গেলে সমঝে দেওয়া যেত ভাল ঘড়ি কাকে বলে।

হায়রে পাসপার্তু। অজ্ঞতার দরুন সে কি করে জানবে যে ঘড়ি তার এখনো ভুল সময় দিচ্ছে? ইটালিয়ান ঘড়ির মত তার ঘড়িও যদি চব্বিশ ঘণ্টায় দাগ কাটা থাকত, তাহলে দেখা যেত সময়টা সকাল ন'টা নয়, রাত ন'টা! পৃথিবীটাকে ঠিক অর্ধেক ঘুরে আসার পর অর্থাৎ ১৮০ দ্রাঘিমাবৃত্তে বারো ঘণ্টা সময়ের এদিক-ওদিক তো হবেই।

কিন্তু পাসপার্তু বেচারার সে জ্ঞান নেই। তার মাথায় তখন ঘুরছে এক চিন্তা—ফিক্সকে হাতের কাছে পেলে ভাল ঘড়ি কাকে বলে সমঝে দেওয়া যেত এবং সেই সঙ্গে আরও কিছু হিসেবনিকেশ মিটিয়ে নেওয়া যেত।

কিন্তু ফিক্স কোথায়?

'জেনারেল গ্রান্ট' জাহাজেরই একটা কেবিনে।

ইওকোহামা পৌঁছেই সটান ইংরেজ দূতাবাসে গিয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এসেছে কিনা খোঁজ করেছিলেন ফিক্স। জবাব শুনে মনটা ময়ূরের মত নেচে উঠেছিল—সেইসঙ্গে মুষড়েও পড়েছিল বিলক্ষণ। বোম্বাই থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁর পেছন পেছন এসেছে এবং 'কর্ণাটিক' জাহাজেই পৌঁছেছে

জাপানে। অথচ ঐ জাহাজেই আমার কথা ফিক্সের! কিন্তু এখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর কাজে লাগছে না। ইংরেজ রাজত্ব তো পেছনে পড়ে।

"তবে হ্যাঁ", মনে মনে ভাবলেন ফিক্স, "এখানে না হোক, ইংলণ্ডের মাটিতে আবার তো কাজে লাগবে ওয়ারেণ্ট। রাস্কেলটাকে আমি সেখানেই পাকড়াও করব। তদ্দিনে অবশ্য ব্যাঙ্কের চোরাই টাকা আরো ফতুর করে আনবে—আসুক গে! ব্যাঙ্ক গরীব নয় যখন পুরস্কার ঠিক মিলবে।"

মতলব পাকা হতেই 'জেনারেল গ্রাণ্ট' জাহাজে গিয়ে উঠলেন ফিক্স। মিস্টার ফগ আউদা আর পাসপার্তুকে নিয়ে জাহাজে যখন উঠলেন, ফিক্স দূর থেকেই তাঁদের দেখেছেন। কিম্ভূতকিমাকার নাক আর ডানার আড়ালে পাসপার্তুকে ও চিনেছেন চকিতে। ভেবেছেন, আরে গেল যা! এ আপদটা আবার কোত্থেকে এল। পরক্ষণেই সুট করে উধাও হয়েছেন নিজের কামরায়—আর বেরোননি।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়। তাই একদিন হঠাৎ পাসপার্তুর সামনে গিয়ে পড়লেন ফিক্স। সেখানে তখন আরো আমেরিকান ছিল। পাসপার্তু বাঘেব মত লাফিয়ে এসে ক্যাঁক করে ফিক্সেব টুঁটি টিপে ধরে দমাদম ঘুসি চালিয়ে গেলেন। ঘুসি তো নয়, যেন শিলাবৃষ্টি। মুষ্টিযুদ্ধে ফরাসীরা যে ইংরেজদের অনায়াসে কুপোকাৎ কবতে পারে, সেদিন তা প্রমাণিত হয়ে গেল ফিক্সের ধরাশায়ী অবস্থা দেখে। আমেরিকান যাত্রীরা ওদের ঘিরে ধবে পবমোৎসাহে বাজী ধরতে লাগল সম্ভাব্য বিজয়ীব ওপর।

ফিক্স টুঁ শব্দটি না করে চোরেব মাব খেল ডেকে শুয়ে। মেরে টেরে পাসপার্তুর হাত ব্যথা হয়ে যাবার পর যখন দেখা গেল মনেব ঝাল সব ঝাড়া হয়ে গেছে, তখন সে অনেকটা শান্ত হল।

ফিক্স তখন জামা-কাপড় ঝেড়ে উঠে বসে খুব শান্তভাবে বললে—"আশ মিটেছে?"

"এখনকার মত।"

"চলো তাহলে একটা কাজেব কথা সেরে নিই।"

"আমার বয়ে গেছে—"

"কথাটা তোমার মনিবের স্বার্থে।"

ফিক্সের প্রশান্ত আচরণ দমিয়ে দিয়েছিল পাসপার্তুকে। তাই দ্বিরুক্তি না করে এল গোয়েন্দার পেছন পেছন। অন্যান্য যাত্রীদের থেকে একটু তফাতে বসল।

ফিক্স বললেন—"খুব আড়ং ধোলাই দিলে যা হোক। আমি অবশ্য

জানতাম একদিন না একদিন তোমার হাতে মার খেতেই হবে। যাক হবার তা তো হল। অ্যাদ্দিন আমি মিস্টার ফগের পথের কাঁটা ছিলাম, এখন থেকে আমি তাঁর সহায়।"

"পথে আসুন" সোল্লাসে বললে পাসপার্তু। "বিশ্বাস হয়েছে তাহলে উনি কতখানি খাঁটি মানুষ?"

"না, হয় নি," ঠাণ্ডা জবাব ফিক্সের। "এখনো বিশ্বাস করি উনি মুখোশধারী শয়তান। আরে! আরে! উসখুস করোনা! আমাকে শেষ করতে দাও। মিস্টার ফগ ইংরেজ রাজত্বে যদ্দিন ছিলেন, যত রকমভাবে পারি তাঁর পর্যটন-সূচী ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছি আমি। ওয়ারেন্ট হাতে না আসা পর্যন্ত আটকে রাখতে চেষ্টা করেছি নানাভাবে। আমিই বোম্বাই পুরুৎদের লেলিয়ে দিয়েছিলাম। তোমাকে হংকংয়ে বেহুঁশ করেছিলাম, ইওকোহামাগামী জাহাজে ওঠা বানচাল করে দিয়েছিলাম।"

ফের শক্ত হল পাসপার্তুর হাতের মুঠো।

ফিক্স নির্বিকার ভাবে বলে চললেন—"এখন দেখছি মিস্টার ফগ ইংলণ্ডেই ফিরে চলেছেন। আমিও তাই চাইছি। সুতরাং এখন থেকে আমি তাঁর সহায়। ইংলণ্ডের মাটিতে ফিরে যাওয়ার পর প্রমাণ করা যাবে উনি সাধু না শয়তান।"

এরপর আর কথা চলে না। ফিক্সকে স্যাঙাৎ বলে মেনে নিল পাসপার্তু।

এগারো দিন পরে তেসরা ডিসেম্বর জাহাজ সানফ্রান্সিসকো পৌঁছোলো।

প্রোগ্রাম মাফিক চলেছেন মিস্টার ফগ। দিনের হিসেবে একটা দিনও খোয়া যায় নি—লাভও হয় নি।

২৫॥ সানফ্রান্সিসকো দর্শন

সকাল সাতটায় আমেরিকার মাটি স্পর্শ করলেন ফগ, আউদা এবং পাসপার্তু। ভাসমান জেটির ওপর দাঁড়িয়ে দেখলেন জাহাজ দুলছে, জেটিও দুলছে, ফলে সহজেই মাল ওঠানো নামানো যাচ্ছে। আশপাশে গিজগিজ করছে ছোটবড় অগুন্তি জাহাজ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের জলযান হাজির এখানে। একপাশে পড়ে রাশিকৃত পণ্যদ্রব্য এখান থেকে যাবে মেক্সিকো, চিলি, পেরু, ব্রেজিল, ইউরোপ, এশিয়ায়।

এত ভোগান্তির পর আমেরিকায় পৌঁছে আনন্দে আটখানা হল পাসপার্তু। খুশীর চোটে ওস্তাদ বাজীকরের মতই শূন্যে এমন সাংঘাতিক

একখানা ডিগবাজী দিল যে হুড়মুড় করে পচাকাঠের তক্তা ভেঙে অবতীর্ণ হল 'নতুন দুনিয়া'র মাটিতে। অভিনব পন্থায় আমেরিকা স্পর্শ করে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল পাসপার্তু। ভয় পেয়ে ডানা ঝটপটিয়ে তৎক্ষণাৎ শূন্যে উড়ল গাছখেকোপাখী আর পেলিক্যানের দল।

মিস্টার ফগ আগে ট্রেনের খোঁজ নিলেন। জানা গেল, নিউইয়র্কের ট্রেন সেই দিনই সন্ধ্যে ছটায় ছাড়ছে। সুতরাং সময় কাটানোর জন্যে শহর দেখতে বেরোলেন সদলবলে। তিন ডলার দিয়ে ভাড়া নেওয়া হল একটা ঘোড়ার গাড়ী। গাড়ী চলল ইন্টার ন্যাশন্যাল হোটেল অভিমুখে। কোচোয়ানের পাশে ছাদে বসল পাসপার্তু। ছানাবড়ার মত বিস্ফারিত চোখে যেন গিলতে লাগল দুপাশের দৃশ্য। চওড়া রাস্তা, সমান মাপের সারি সারি অনুচ্চ বাড়ী, অ্যাংলো স্যাক্সন গথিক গির্জে, সুবিশাল জাহাজ ঘাটা, কাঠ আর ইটের তৈরী প্রাসাদোপম গুদোমঘর, অগণিত যানবাহন, বাস, ঘোড়ায় টানা শকট, এবং ফুটপাতের ওপর আমেরিকান, ইউরোপিয়ান, চীনে এবং রেডইণ্ডিয়ানদের ভীড়। যা দেখে, তাই দেখেই অবাক হয় পাসপার্তু। সানফ্রান্সিসকো আর সেই সানফ্রান্সিসকো নেই, মারামারি কাটাকাটির যুগ গেছে, রাস্তাঘাটে রক্তলোভী নরপিশাচদের দাপট আর নেই স্বর্ণ-ধূলা নিয়ে জুয়া খেলাও নেই, এককালে এই শহর ছিল সমাজ শত্রু ডাকাতদের স্বর্গ বিশেষ, একহাতে রিভলবার আরেক হাতে উলঙ্গ ছুরী হাতে তারাই নির্ভয়ে রাজত্ব করেছিল শহরময়। আজকের সানফ্রান্সিসকো আমেরিকার অন্যতম প্রধান বাণিজ্য নিকেতন। রাজপথ সবসময়ে কোলাহল-চঞ্চল। নাগরিকরা অষ্ট প্রহর কাজে ব্যস্ত।

শহরের রাস্তাঘাটের নক্সা ঠিক যেন ছবির মত। সোজা সড়ক। সমকোনে কাটাকুটি হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। মোড়ে সাজানো উদ্যান। সিটি হলের অন্যদিকে চৈনিক পল্লী। ঠিক যেন চীনদেশ থেকে তুলে আনা একটা চীনে পাড়া। লাল সার্ট পরা রেডইণ্ডিয়ানদের ছায়াও দেখা যায় না এখানে। রাস্তাঘাটে ঘুরছে সিল্কের টুপী আর কালো কোট পরা স্বল্পভাষী চীনের দল। সারি সারি চীনে দোকানে সাজানো চীনদেশের রকমারি পণ্যবস্তু।

সুসজ্জিত ইন্টারন্যাশন্যাল হোটেলে পৌঁছে পাসপার্তুর মনে হল না সে লণ্ডন শহরের বাইরে রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোনো জিনিসের অভাব নেই।

প্রাতরাশ খেয়ে মিস্টার ফগ বানী আউদাকে নিয়ে চললেন ইংরেজ দূতাবাসে পাশপোর্টে সই করতে। রাস্তায় হঠাৎ দেখা ফিক্সের সঙ্গে। ফিক্স

যেন আকাশ থেকে পড়লেন 'ভানূকাদেরে' নৌকোর 'মহানুভব' মিস্টার ফগকে দেখে। ফগের সঙ্গে শহর দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন ফিক্স। আসল উদ্দেশ্য অবশ্য চোর মহাপ্রভুকে নজর ছাড়া না করা। ফগ অবশ্য অতশত না বুঝে ফিক্সকে সঙ্গে নিলেন।

পাসপার্তু কিছু এনফিল্ড রাইফেল আর কোল্ট রিভলবার কিনতে নেমে গেল। সে নাকি কোথায় শুনেছে আমেরিকার ট্রেনে রাহাজানি লেগেই আছে। তাই কিছু অস্ত্র মজুদ রাখতে চেয়েছিল নিজেদের কাছে। আপত্তি করেন নি ফগ।

পথিমধ্যে এক বিভ্রাটের মধ্যে গিয়ে পড়লেন মিস্টার ফগ। মণ্টোগোমারী স্ট্রীটে এক জায়গায় দেখা গেল কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে। যানবাহন স্তব্ধ। পোস্টার, ফেস্টুন, পতাকা নিয়ে মিছিল চলেছে। সেই সঙ্গে নানারকমের স্লোগান:

"ক্যামারফিল্ড জিন্দাবাদ!"

"ম্যান্ডিবয় জিন্দাবাদ!"

বটে, মিটিংটা তাহলে রাজনৈতিক। এ-সব হুজুগের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলাই ভাল। ফিক্স বললে ফগকে—"ভীড়ের মধ্যে গেলে বিপদ ঘটতে পারে।"

"বরাতে ঘুষিও জুটতে পারে," সায় দিয়ে বললেন ফগ।

জনতার গতি দেখা গেল কয়লা আর পেট্রল গুদোমের উল্টোদিকে নির্মিত একটা উঁচু মঞ্চের দিকে। এঁরা তিনজনে জনস্রোত থেকে গা বাঁচিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু মিটিংটা কি নিয়ে? কিসের এত উত্তেজনা? কার নির্বাচন প্রসঙ্গে এই ভোটরঙ্গ? গভর্ণর, না, কংগ্রেস সদস্য?

আচম্বিতে দারুণ চেঁচামেচি হাত ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হয়ে গেল মিছিলের মধ্যে। জনসমুদ্র সহসা দুলে উঠল। মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলো নিক্ষিপ্ত হল শূন্যে—পরমুহূর্তে তা অদৃশ্য হল ভীড়ের মধ্যে—সঙ্গে সঙ্গে সে কী আর্ত চীৎকার! ভোট প্রার্থনার একি অদ্ভুত পন্থা? ফেস্টুন, ব্যানার, পতাকা, পোস্টার অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে—পুনরায় আবির্ভূত হল শতছিন্নরূপে। দারুণ উত্তেজনায় মাথার টুপী নিক্ষিপ্ত হল শূন্যে—যেন ঝড় উঠেছে জনসমুদ্রে। দেখতে দেখতে পাতলা হয়ে এল ভীড়।

ফিক্স বললেন—"মিটিংই বটে। নিশ্চয় 'অ্যালাবাম' নিয়ে যদিও সে প্রসঙ্গের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।"

ফগ শুধু বললেন—"হয়তো।"

"প্রতিদ্বন্দ্বী তো দেখছি মাত্র দুজন, ক্যামারফিল্ড আর ম্যান্‌ডিবয়।"

এই বলে পাশের একজনকে কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেন ফিক্স, এমন সময়ে ফের হট্টগোল বৃদ্ধি পেল। ফেস্টুন, পতাকা, পোস্টারের ডাণ্ডাগুলো লেঠেলের লাঠির মত দমাদম করে পড়তে লাগল পিঠের ওপর। দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনের ওপর থেকেও আরোহীরা ঘুষি বৃষ্টি আরম্ভ করল নীচের লোকের ওপর। জুতো ছুটল ভীড়ের মাথা দিয়ে। পিস্তল ছোঁড়ার আওয়াজও ভেসে এল ফগের কানে। জনস্রোত ঠেলে উঠেছে মঞ্চের প্রথম ধাপে। কিন্তু কে জিতছে আর কে হারছে—তা বোঝা গেল না।

ফিক্সের মনে ভয় ঢুকল ফগকে নিয়ে। লণ্ডনে তাঁকে অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া চাই। তাই বলল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে—"আমরা সবে পড়ি চলুন। গোলমালটা যদি ইংলণ্ডকে নিয়ে হয়, তাহলে—"

"ইংরেজরা—" সবে শুরু করেছেন মিস্টার ফগ, এমন ম্যান্‌ডিবয় জিন্দাবাদ, হিপ হিপ হুররে, ধ্বনিতে তাঁর স্বর ডুবে গেল।

ম্যানডিবয়ের নতুন সমর্থকরা ছুটে আসছে ক্যামারফিল্ডের সমর্থকদের ঠেঙাতে। দুদিক থেকে তারা কোণঠাসা করে ফেলেছে ক্যামারফিল্ড ভোটারদের। হাতে তাদের সীসে দিয়ে ভারী করা মারাত্মক লাঠিসোটা। দুইদলের মধ্যে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হবার উপক্রম হলেন ফগ, ফিক্স এবং আউদা। প্রথম দুজন প্রাণপণে আউদাকে রক্ষে করে গেলেন দুহাতে ঘুসি চালিয়ে। এমন সময়ে একজন লালদাড়ি, লালমুখ, বৃষস্কন্ধ আমেরিকান তেড়ে এল। লোকটা নিঃসন্দেহে দলের পাণ্ডা। ফগকে লক্ষ্য করে বজ্রমুষ্টি তুলল শূন্যে।

ফিক্স আচমকা মাথা বাড়িয়ে দিলেন দুরমুশের মত নেমে আসা ঘুসির তলায়। ফলে তাঁর টুপী দফারফা হল, কপালেও বেশ বড় গোছের কালসিটে দেখা গেল।

"ইয়াঙ্কি।" দাঁতে দাঁত পিষে ঘৃণাভরে বললেন ফগ। দুই চোখে বিচ্ছুরিত নিঃসীম অবজ্ঞা।

"ইংরেজ।" বলল তাঁর প্রতিপক্ষ—"আবার দেখা হবে।"

"যখন খুশী।"

"নাম কী?"

"ফিলিয়াস ফগ। আপনার?"

"কর্নেল স্ট্যাম্প প্রোক্টর।"

জনতা ছুটতে শুরু করেছে। ঠিকরে পড়ে গেলেন ফিক্স। উঠে দাঁড়ালেন পরমুহূর্তেই। দেখা গেল, তাঁর ট্র্যাভেলিংকোট ছিঁড়ে দুটুকরো হয়ে গেছে,

ট্রাউজার্সের অবস্থা হাস্যকর এবং জুতোর চেহারা রেড ইণ্ডিয়ানদের জুতোর মত। মাথায় সেই কালসিটে।

ভীড়ের বাইরে এসে গোয়েন্দাকে ধন্যবাদ জানালেন ফগ।

"কোনো দরকার নেই", বললেন ফিক্স, "চলুন যাই।"

"কোথায়?"

"দরজির দোকানে।"

সত্যিই দরজির দরকার হয়ে পড়েছিল। ফগ এবং ফিক্সের পরিচ্ছদ ছিঁড়েখুঁড়ে একসা হয়েছে কেবল রাণী আউদাকে বাঁচাতে গিয়ে। ঘণ্টাখানেক পরে ভদ্রস্থ হয়ে সবাই ফিরলেন হোটেলে।

ছটা ছপড়া বিভলবার নিয়ে মনিবের পথ চেয়ে বসেছিল পাসপার্তু। ফিক্সের চেহারা দেখে এবং তার বীরত্বের বর্ণনা আউদার মুখে শুনে মনটা প্রফুল্ল হল। যাক, ছ্যাচড়া গোয়েন্দাটা তাহলে কথা রেখেছে। শত্রু নয়, এখন সে মিত্র।

খেয়েদেয়ে নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হওয়ার সময়ে ফিক্সকে শুধোলেন ফগ—"কর্ণেল প্রোক্টরের সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?"

"না।"

"আবার আমেরিকা আসব আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে", প্রশান্ত স্বরে বললেন ফগ। 'ইংরেজরা মুখ বুঁজে অপমান হজম করে না।"

মনে মনে একচোট হেসে নিলেন ফিক্স, মুখে কিছু বললেন না।

পৌনে ছটায় প্ল্যাটফর্মে পৌঁছোলেন সবাই। ট্রেনে ওঠবার সময়ে একজন কুলীকে জিজ্ঞেস করলেন ফগ—"আজকে সানফ্রান্সিসকোয় একটা হাঙ্গামা হয়েছে না?"

"রাজনৈতিক সভা ডাকা হয়েছিল।"

"কিন্তু রাস্তায় খুব গোলমাল চলছে মনে হল?"

"নির্বাচনের গোলমাল।"

"সেনাপতির নির্বাচন নিশ্চয়?"

"আজ্ঞে না, জাস্টিস অফ-পীস।"*

কামরায় উঠে বসলেন ফগ। চাকা গড়ালো ট্রেনের।

* Justice of Peace—সংক্ষেপে J. P.—নিম্ন পর্যায়ের ম্যাজিস্ট্রেট। সম্পাদক।

২৬॥ পাসপার্তুকে কেউ পাত্তা দিল না

পাহাড়ি পথে এঁকে বেঁকে কখনো পাহাড়ের বুক ফুঁড়ে চোদ্দ হাজার ফুট লম্বা সুড়ঙ্গর মধ্যে দিয়ে ভীমবেগে ছুটে চলল ট্রেন। দুপাশের নয়নমনোহর দৃশ্য দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল, বোঝা গেল না।

সাতুই ডিসেম্বর সোয়া ঘণ্টার জন্যে গ্রীন রিভার স্টেশনে দাঁড়াল ট্রেন। গতরাতে দারুণ তুষার পাত হয়ে গেছে এ-অঞ্চলে। বৃষ্টির জলে তুষার গলে গিয়ে অবশ্য রেলপথ সুগম করে দিয়েছে, কিন্তু চাকার মধ্যে তুষার জমাট বাঁধলে অ্যাকসিডেণ্ট অনিবার্য!

মহা ভাবনায় পড়ল পাসপার্তু। মনিবেরই বা আক্কেলটা কী! শীতকালে কখনো বাজী ধরে রওনা হয় কেউ?

রাণী আউদার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল অবশ্য অন্য কারণে। গ্রীন রিভার স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ানোর পর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিলেন তিনি। জনা-কয়েক যাত্রী পায়চারী করছিল প্ল্যাটফর্মে। কর্ণেল প্রোক্টর ছিল তাদের মধ্যে।

ভূত দেখার মতো আঁৎকে উঠলেন রাণী আউদা। মিস্টার ফগ তখন ঘুমোচ্ছেন। ঠাণ্ডা প্রকৃতির শক্তধাতের মানুষটার ওপর বড় মায়া পড়ে গিয়েছিল তাঁর। কৃতজ্ঞতার চাইতেও বড় আকর্ষণে শ্রদ্ধার চোখে দেখছিলেন ফগকে। সেই ফিলিয়াস ফগের সঙ্গে কর্ণেলের সামনা সামনি হওয়ার পরিণামটা আঁচ করেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল তাঁর।

ফিলিয়াস যা বলেন, তা করেন। কর্ণেলের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে উনি ফের আমেরিকায় আসবেন বলেছেন। ভাগ্য চক্রে কর্ণেল একই ট্রেনে চলেছেন জানতে পারলে মিস্টার ফগ হিসেব নিকেশটা এখুনি চুকিয়ে নিতে তৎপর হবেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে যদিও বা জেতেন উনি, দেরী হবে নির্ঘাৎ। পরিণামে হারাবেন বাজীর টাকা, এত কষ্ট করে ঘাটে এসে তরী ডুববে?

না, কখনোই না। ফগের সঙ্গে কর্ণেলের যাতে মোলাকাৎ না হয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ওঁকে কিছুতেই ট্রেন থেকে নামতে দেওয়া হবে না।

মিস্টার ফগ তখনো ঘুমোচ্ছেন। পাসপার্তু আর ফিক্সের সঙ্গে চুপিচুপি শলাপরামর্শ করতে বসলেন আউদা। কর্ণেল প্রোকটর একই ট্রেনের যাত্রী? সর্বনাশ! ফিক্স কথা দিলেন—কর্ণেলের সঙ্গে উনিই লড়বেন ফগের বদলে।

কেননা, মার খেয়েছেন তিনিই। পাসপার্তু আপন মনে বললে—"আমার সঙ্গে টক্কর দিতে হবে আগে—হলেই বা তিনি কর্ণেল ?…"

শেষকালে সবাই মিলে ঠিক করলেন, তাসের খেলায় ভুলিয়ে রাখতে হবে ফগকে। হুইষ্ট ওঁর প্রিয় নেশা। একবার খেলায় জমে গেলে ট্রেন থেকে আর নামতেই চাইবেন না।

এই সময়ে চোখ মেললেন ফগ। আলোচনা স্থগিত রইল। তবে ফিক্স প্রস্তাব করলেন, হুইষ্ট খেলা হোক। তাস ? ষ্টুয়ার্ডের কাছ থেকে জোগাড় হয়ে যাবে'খন। রাজী হলেন ফগ। তাস এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করে আনল পাসপার্তু। শুরু হল তিনজনের খেলা—রাণী আউদা, গোয়েন্দা ফিক্স এবং ফিলিয়াস ফগ। দেখা গেল, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা আউদা হুইষ্ট খেলা ভালই বোঝেন। এমন কি স্বল্পবাক ফগও তারিফ করলেন তাঁর খেলার।

দিনেরাতে সমানে খেলা চলল। তন্ময় হয়ে রইলেন ফগ।

আচম্বিতে তীব্র শব্দে সিটি বাজিয়ে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো পাসপার্তু। কিন্তু স্টেশন কোথায় ? এ-কোথায় দাঁড়িয়েছে ট্রেন ? মনিবের হুকুম নিয়ে সে লাফিয়ে নামল কামরা থেকে। দেখল তিরিশ চল্লিশ জন আরোহীও নেমে পড়েছে। কর্ণেল প্রোকটরও রয়েছে তাদের মধ্যে।

ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে একটা লালবাতির সামনে। সামনে বিপদ—না এগোনোই সমীচীন। কনডাকটার উত্তেজিতভাবে কথা বলছে সিগন্যালম্যানের সঙ্গে। পরের স্টেশন থেকে সে এসেছে লালবাতি নিয়ে ট্রেন থামাতে। যাত্রীরাও বিষম উত্তেজিতভাবে অংশ নিয়েছে আলোচনায়। কর্ণেল প্রোকটরের ঔদ্ধত্য জেগে রয়েছে সবার ওপরে।

সিগন্যালম্যান বলছেন—"না, যাবেন না। ব্রীজ নড়বড় করছে। ট্রেনের ভার সইতে পারবে না।"

কর্ণেল প্রোকটর বলল—"আচ্ছা মুস্কিল তো ? এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো বরফে জমে যাব।"

কনডাকটর বলল—"ওমাহাতে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, কর্ণেল। পরের স্টেশনে রিলিফ ট্রেন ছঘণ্টার মধ্যেই পৌছে যাবে।"

"ছঘণ্টা ?" আঁৎকে উঠল পাসপার্তু।

"তাতো লাগবেই" বলল কনডাকটার। "পায়ে হেঁটে ছঘণ্টার আগে পরের স্টেশনে পৌছোতেও তো পারবেন না।"

"এক মাইল তো পরের স্টেশন বলল একজন যাত্রী।

"তা ঠিক। কিন্তু নদী পেরোতে হবে যে।"

"নৌকোয় পেরোবো" বলল কর্ণেল।

"অসম্ভব। নদী ফুলে ফেঁপে এখন রাক্ষসে মূর্তি ধরেছে। উত্তর দিকে মাইল দশেক ঘুরে গেলে তবে হাঁটুজলে পেরোনো যাবে।"

শুনে কর্ণেল এক পশলা গালিগালাজ বর্ষণ করল রেল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে। পাসপার্তুও একমত হল কর্ণেলের সঙ্গে এই একটি ব্যাপারে। একী গেরো রে বাবা! টাকা ছড়িয়েও কিন্তু এ-বাধা পেরোতে পারবেন না ফিলিয়াস ফগ!

যাত্রীরা মুষড়ে পড়ল বরফ মাড়িয়ে এত মাইল হাঁটার সিদ্ধান্ত শুনে। মিস্টার ফগ কিন্তু এ-সবের বিন্দু বিসর্গ জানলেন না। তিনি তন্ময় হয়ে রইলেন তাসখেলা নিয়ে।

পাসপার্তু নিজেও গরুচোরের মত পা বাড়ালো কামরার দিকে। মহা ফাঁপরে পড়ল সে। মনিবকে এ-বিভ্রাট বলা যায় কি করে?

আচমকা কানে ভেসে এল একজনের উচ্চকণ্ঠ। ফর্সস্টার নামে একজন খাঁটি ইয়াঙ্কি ইঞ্জিনীয়ার সবাইকে শুনিয়ে বলছে—"শুনুন সবাই, নদী পেরোনোর আর একটা পথ আছে।"

"ব্রীজের ওপর দিয়ে তো?" শুধোলো একজন যাত্রী।

"হ্যাঁ ব্রীজের ওপর দিয়ে।"

"ট্রেন নিয়ে?"

"হ্যাঁ ট্রেন নিয়ে।"

থমকে দাঁড়াল পাসপার্তু। বলে কি ইঞ্জিনীয়ার?

"কিন্তু সাঁকো নিরাপদ নয় মোটেই," বলল কনডাকটার।

"তাতে কিছু এসে যায় না," বলল ফর্সস্টার। "খুব জোরে গেলে সাঁকো পেরিয়ে যেতে পারব পলক ফেলতে না ফেলতেই।

"পিশাচ নাকি?" মনে মনে বলল পাসপার্তু।

প্রস্তাবটা কিন্তু মনে ধরল অধিকাংশ যাত্রীর। সবচাইতে বেশী উৎসাহ দেখা গেল কর্ণেল প্রোক্টরের। কোন ইঞ্জিনীয়ার কবে পুরোদমে ট্রেন ছুটিয়ে লাফিয়ে নদীপার হয়েছে, সালংকারে তা গল্প করতে লাগল অন্যান্য যাত্রীদের কাছে।

একজন যাত্রী বলে উঠল—"এতে কিন্তু নদী পেরোনোর সম্ভাবনা যতখানি, না পেরোনোর সম্ভাবনাও ততখানি। অর্থাৎ নির্বিঘ্নে পেরিয়ে যাওয়ার শতকরা ৫০ ভাগ।"

"৮০ বার—৯০ বার!" ফোড়ন দিলে আর একজন।

পাসপার্তুর বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেল এদের কথাবার্তা শুনে। সে মনে মনে ভাবল—"আহাম্মকগুলোর মাথায় সোজা বুদ্ধিটা কেন আসছে না বুঝি না।" একজন যাত্রীকে ডেকে বললে—"দেখুন মশায়, ইঞ্জিনীয়ারের প্ল্যান কিন্তু বিপজ্জনক। নিরাপদ ব্যবস্থা আছে একটাই—"

লোকটা তার দিকে পেছন ফিরে শুধু বলল—"শতকরা ৮০ ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে—"

"জানি জানি," বলে আর একজন যাত্রীর দিকে দিকে ফিরল পাসপার্তু। "কিন্তু একটা সোজা উপায় আমি বাংলাতে—"

"উপায় নিয়ে কি ধুযে খাবো?" খেঁকিয়ে উঠল আমেরিকান প্যাসেঞ্জার। "ইঞ্জিনীয়ার নিজে যখন বলছেন ঝড়ের মত ছুটে গেলে চক্ষের পলকে সেতু পেরোনো যাবে—"

"তাতো যাবেই। কিন্তু আরও সমীচীন হত যদি—"

"সমীচীন! কি সমীচীন সমীচীন করছ হে?" রেগে যেন মারতে এল কর্ণেল প্রোক্টর।" পুরোদমে যাবো বলা হচ্ছে না? কানে কথাটা ঢুকেছে? ফুল স্পীডে যাওয়া হবে!"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ কানে ঢুকেছে। তবে কিনা আমি বলছিলাম, কাজটা আরো সমীচীন—আচ্ছা, আচ্ছা, সমীচীন কথাটায় যদি আপনার এতই আপত্তি থাকে, তাহলে বরং বলা যাক কাজটা আরো স্বাভাবিক হত, যদি—"

"কে রে? কি বলে? হল কি লোকটার?" চারপাশ থেকে চেঁচামেচি করে উঠল অন্যান্য যাত্রীরা।

পাসপার্তু বেচারী কথা বলার কোনো সুযোগই পেল না?

"ভয় পেয়েছো মনে হচ্ছে?" টিটকিরি দিল কর্ণেল প্রোক্টর।

"ভয়! ঠিক আছে, আমেরিকানদের সঙ্গে ফরাসীরা পাল্লা দিতে পারে কিনা দেখিয়ে দিচ্ছি!"

"উঠে পড়ুন সবাই গাড়ীতে! হেঁকে উঠল কনডাকটার।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, উঠে পড়ুন সবাই!" পাসপার্তুও হেঁকে উঠল জোর গলায়? পরক্ষণেই বললে অনুচ্চ কণ্ঠে—"হায়রে! পায়ে হেঁটে সেতু পেরিয়ে যাবার পর খালি গাড়ীটা সাঁকোয় তুললেই তো গোল চুকে যেত! এক মাইল হেঁটে মেরে দিতাম, ট্রেন আসতো পেছনে!"

কিন্তু তার সৎপরামর্শে কান দিল না কেউ। যুক্তিটার সারবত্তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামালো না। যাত্রীরা উঠে পড়ল যে-যার কামরায়। পাসপার্তু

কাউকে কিছু না বলে কাঠ হয়ে বসে পড়ল নিজের জায়গায়। হুইষ্ট খেলোয়াড় তন্ময় হয়ে রইলেন খেলার মধ্যে।

তীব্র শব্দে সিটি বাজল ইঞ্জিনে। ইঞ্জিনীয়ার এক মাইল পেছনে নিয়ে গেল ট্রেনকে। লম্বা লাফ দেওয়ার আগে ব্যায়ামপটু বেশ খানিকটা পেছিয়ে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে নেয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে—ঠিক সেইভাবে ট্রেনখানাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তৈরী হয়ে নিল। তারপর আবার বাজল সিটি। এবার সামনে এগোলো ট্রেন। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেল গতিবেগ। শেষে এত জোরে গাড়ী ছুটতে লাগল যে যাত্রীদের গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল সেই ভীমবেগ উপলব্ধি করে। সারা ট্রেনটা থেকে একটানা একঘেয়ে তীক্ষ্ণ ধাতব আর্তনাদ রক্ত হিম করে দিল প্রত্যেকের, সেকেণ্ডে বিশবার ওঠানামা করতে লাগল পিসটন। ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে ধেয়ে গেল ট্রেনখানা—চাকাগুলো রেললাইন না স্পর্শ করেই হাওয়ায় ভর করে উড়ে গেল!

বিদ্যুৎ যেমন নিমেষ মধ্যে নীল আকাশের একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে যায়. ট্রেনখানাও তেমনিভাবে পেরিয়ে গেল নড়বড়ে সাঁকো। সাঁকোর চেহারা কেউ দেখতেও পেল না। নদীর এপার থেকে ওপারে যেন লাফিয়ে পড়ল ট্রেনটা। পরের স্টেশন ছাড়িয়ে আরো পাঁচ মাইল চলে আসার পর তবে গাড়ী থামাতে পারল ইঞ্জিনীয়ার। তবে পার্বত্য তরঙ্গিনী পেরোনোর ঠিক পরের মুহূর্তেই ভীষণ শব্দে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল সাঁকোটা—তলিয়ে গেল নদীর জলে।

২৭॥ আমেরিকান রেলপথের রক্তারক্তি কাণ্ড

তিন দিন তিন রাত সমানে ট্রেন চলছে ; আরও চার দিন চার রাত ট্রেন ছুটবে। তারপর পৌঁছানো যাবে নিউইয়র্কে। সানফ্রান্সিসকো থেকে ১৩৮২ মাইল আসা গিয়েছে এবং ফিলিযাস ফগ এখনো পর্যন্ত প্রোগ্রাম মাফিক চলেছেন—একটুও পেছিয়ে নেই।

একশ এক দ্রাঘিমাবৃত্ত পেরিয়ে যাবার পর ফের তাস খেলতে বসলেন ফগ। প্রথম-প্রথম ফিক্স কয়েক গিনি জিতেছিলেন—যদিও জেতবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না তাঁর। শেষের দিকে জিততে লাগলেন ফগ। কয়েক দান জেতবার পর বড় গোছের একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন চিড়িতন ফেলে, এমন সময়ে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল পেছনে :

"আমি হলে হরতন ফেলতাম।"

মাথা তুললেন ফগ, ফিক্স এবং আউদা। দেখলেন কর্ণেল প্রোকটর দাঁড়িয়ে আছে পেছনে!

এক পলকে দেখেই ফগ চিনলেন কর্ণেলকে, কর্ণেল চিনল ফগকে।

সবিস্ময়ে বলল কর্ণেল—"আরে গেল যা! এ যে সেই ইংরেজটা! তাই তো বলি, তা নাহলে কেউ চিড়িতন খেলে!"

"খেলছি-ও," নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে চিড়িতন ফেললেন ফগ।

ছোঁ মেরে তাসটা তুলে নেওয়ার ভঙ্গী করে বলল কর্ণেল উদ্ধত কণ্ঠে—"হুইষ্ট খেলার কিছুই জানা নেই দেখছি।"

"যা বলেছেন—আপনার মতই," আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন ফগ।

"ওরে জনবুলের বাচ্চা! এক হাত খেললেই তো হয়," টিটকিরি দিল কর্ণেল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন আউদা। ফগের হাত চেপে ধরে টেনে আনলেন পেছনে। কর্ণেল মনিবের দিকে মারমুখো ভঙ্গিমায় এগোচ্ছে দেখে পাসপার্তু শার্দুলের মত লাফ দেওয়ার জন্যে উদ্যত হল। কিন্তু মাঝখান থেকে উঠে দাঁড়ালেন ফিক্স। কর্ণেলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন-"বোঝাপড়াটা আগে আমার সঙ্গে হোক, কেননা আপনি আমাকেই খামোকা অপমান করেছেন—ঘুসিও মেরেছেন।"

ফগ বললেন—"মিস্টার ফিক্স, আপনি সরে দাঁড়ান। বোঝাপড়াটা শুধু আমার সঙ্গেই হবে। কেননা, আবার কর্ণেল আমাকে অপমান করেছেন আমার হুইষ্ট খেলার বিদ্যেবুদ্ধির ওপর কটাক্ষ করে। সুতরাং কৈফিয়ৎটা দিতে হবে আমার কাছেই।"

"কোথায় কখন কৈফিয়ৎ চান সেটা বলুন," বিদ্রুপ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কর্ণেল। "খুশী মত অস্ত্র সঙ্গে নিন—কোনো আপত্তি নেই।"

বৃথাই ফগকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন আউদা। পাসপার্তুর হাত নিসপিস করছিল কর্ণেলকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু তার মতলব বুঝে ফগ তাকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলেন। কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন টানা গলিপথে। পেছনে এল কর্ণেল।

ফগ বললেন—"আমার একটু তাড়া রয়েছে ইউরোপে ফেরবার। দেরী হলে অনেক ক্ষতি"

"তাতে আমার কী?" চাঁচাছোলা জবাব দিল কর্ণেল।

"সানফ্রান্সিসকোতে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আবার আমেরিকা আসব শুধু আর একবার আপনার

সামনা-সামনি হওয়ার জন্যে। ইউরোপের কাজটা শেষ হলেই আমি ফিরে আসব।"

"তাই নাকি!"

"ছমাস পরে দেখা করব আপনার সঙ্গে—রাজী?"

"তার চেয়ে বলুন না কেন দশবছর পরে?"

"না, ছ'মাস। যেখানে বলবেন, সেখানে যাবো।"

"পালাতে চান দেখছি!"

"ঠিক আছে। চলেছেন কোথায়? নিউইয়র্ক?"

"না।"

"শিকাগো?"

"না।"

"ওমাহা?"

"যেখানেই যাই না কেন, আপনার তাতে কি দরকার? প্রাম ফ্রিক চেনেন?"

"না।"

"পরের স্টেশনই প্রামফ্রিক। ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেন পৌঁছাবে সেখানে, দাঁড়াবে মিনিট দশেক। কয়েকবার রিভলবার ছোঁড়ার পক্ষে দশমিনিট যথেষ্ট সময়।"

"ঠিক আছে। প্রামফ্রিকে থামব আমি।"

"এ-জন্মের মত থামবেন বলুন।" কর্ণেলের কথা তো নয়, যেন গায়ে বিছুটির জ্বালা ছড়িয়ে দেয়।

ফগ শুধু বললেন—"দেখা যাক কার কবর রচনা হয় প্রাম ফ্রিকে।"

ধীর পদক্ষেপে কামরায় ফিরে এলেন ফগ। আউদাকে আশ্বস্ত করলেন। ধৃষ্টতার একটা সীমা আছে, তা বেশী নাকি কাউকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ফিক্সকে রাজী করালেন পিস্তল যুদ্ধে তার দোসর হতে। তারপর যেন কিছুই ঘটেনি, এমনি ভাবে ফের খেল শুরু করলেন।

এগারোটার সময়ে বংশীধ্বনি শুনে বোঝা গেল ট্রেন প্রামফ্রিক স্টেশনে থামল বলে। ফগ উঠে পড়লেন ফিক্সকে নিয়ে। পাসপার্তু একজোড়া রিভলবার নিয়ে পেছন পেছন গেল। একা আউদা বসে রইলেন মড়ার মত রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে।

পাশের কামরার দরজা খুলে বেরিয়ে এল কর্ণেল - সঙ্গে একজন আমেরিকান দোসর। সবাই মিলে ট্রেন থেকে নামবার জন্যে যেই পা বাড়িয়েছে, অমনি কনডাকটর গার্ড দৌড়ে এসে বললে—"নামবেন না—নামবেন না!"

"কেন?" শুধোলো কর্ণেল।

"বিশ মিনিট দেরী হয়ে গেছে। তাই গাড়ী এখানে দাঁড়াবে না।"

"সেকি কথা! এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যে ডুয়েল লড়তে হবে।"

"বড়ই আপশোষের কথা!" পিস্তল-লড়াইটা হচ্ছে না বলে সত্যিই যেন দুঃখিত হল কনডাকটর গার্ড। "গাড়ী কিন্তু এখুনি ছাড়ছে। ঐ শুনুন ঘণ্টা বাজছে।"

ট্রেন চলতে শুরু করল।

কনডাকটর গার্ড তখন বলল—"এক কাজ করলে হয় না? গাড়ী চলতে চলতেই লড়ে নিন না!"

"তাতে কি এ ভদ্রলোকের সুবিধে হবে?" ফের টিটকিরি দিল কর্ণেল।

"হবে," ছোট্ট জবাব ফগের।

পাসপার্তু তাজ্জব হয়ে গেল কথাবার্তা শুনে। সত্যি সত্যিই আমেরিকার বুকে পৌঁছেছে ওরা! চলতি গাড়ীতেই পিস্তল লড়াইয়ের আয়োজন করে দিচ্ছে রেলের গার্ড!

একদম শেষের কামরায় জন বারো যাত্রী ছিল। গার্ডের অনুরোধে তারা তৎক্ষণাৎ কামরা ফাঁকা করে দিয়ে বেরিয়ে গেল করিডরে।

কামরাটা লম্বায় পঞ্চাশ ফুট। দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপযুক্ত জায়গা। ফগ আর কর্ণেল ছঘড়া রিভলবার হাতে ঢুকল ভেতরে। দোসরর রইল বাইরে। ট্রেনের সিটি বাজলেই দুমদাম পিস্তল ছুঁড়বে দুজনে। যে মরবার সে মরবে। যদি কেউ বেঁচে থাকে, দু'মিনিট পরে কামরায় ঢুকে তাকে বাইরে আনা হবে।

এত সহজে পিস্তল যুদ্ধের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে ভাবাই যায়নি। কিন্তু আর পাসপার্তুর হৃদ্‌পিণ্ডজোড়া এমন ধড়ফড় করতে লাগল এই বুঝি ছিঁড়ে পড়ে যাবে। দুজনেই উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে বংশীধ্বনির প্রতীক্ষা করছে। এমন সময়ে অগুনতি ডাকাতে হুংকারে আকাশবাতাস যেন ফালাফালা হয়ে গেল। সেইসঙ্গে শোনা গেল মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণের শব্দ—আওয়াজটা কিন্তু পিস্তল যোদ্ধাদের কামরা থেকে এল না।

সারা ট্রেন জুড়ে একই সঙ্গে বর্বর-চীৎকার আর গুড়ুম-গুড়ুম আওয়াজের ঐকতান। সেই সঙ্গে শুরু হল যাত্রীদের ভয়ার্ত চীৎকার।

কামরার মধ্যে থেকে পড়ি কি মরি করে বেরিয়ে এলেন ফগ এবং কর্ণেল। দৌড়োলেন সামনের দিকে। দেখলেন, সর্বনাশ হয়েছে! সিয়োক্স ট্রেন লুঠেরার দল আক্রমণ করেছে!

এই প্রথম নয়, এর আগেও দুর্দান্ত রেড ইণ্ডিয়ানরা এইভাবে চড়াও হয়েছে

চলন্ত ট্রেনের ওপর। প্রায় শ'খানেক ডাকাত অদ্ভুত কায়দায় লাফিয়ে পড়েছে গাড়ীর পাদানির ওপর। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। যাত্রীরাও কেউ নিরস্ত্র নয়। তাই এত গুলি বিনিময়ের আওয়াজ!

রেড ইণ্ডিয়ানরা প্রথমে লাফিয়ে উঠেছিল ইঞ্জিনের ওপর। মাস্কেট-বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে আধমরা করেছে ইঞ্জিনীয়ার ড্রাইভারকে। পাস্পের গোদাটি ট্রেন চালানোর কিসস্যু না জেনেও বাহাদুরি করে ট্রেন থামাতে গিয়েছিল। ফলে, বাষ্পনল আরো খুলে গেছে। ঝমাঝম শব্দে প্রচণ্ড গতিবেগে ট্রেন ধেয়ে চলেছে সামনে।

একই সাথে সব কটা কামরায় হানা দিয়েছে সিয়োক্সরা। হনুমানের মত লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে—চলন্ত কামরার ছাদ বেয়ে, গড়িয়ে নেমে দরজা খোলবার চেষ্টা করছে, হাতাহাতি লড়ে যাচ্ছে যাত্রীদের সঙ্গে। মালপত্র যে কামরায় থাকে, তার দরজা ভেঙে বাক্স প্যাটরা তোরঙ্গ সব টেনে টেনে ফেলে দিচ্ছে বাইরে সেইসঙ্গে বিরামবিহীনভাবে শোনা যাচ্ছে চঁচানি আর গুলির আওয়াজ।

ঘণ্টায় মাইল বেগে ছুটছে ট্রেন। ভেতরে প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে যাত্রীরা। কেউ কেউ লুটিয়ে পড়ছে গুলি বিদ্ধ হয়ে—কিন্তু তবুও লড়াই চলছে।

শুরু থেকেই আউদা লড়ছেন বাবাঙ্গনার মত। তার বিভলভার ঘনঘন অগ্নিবর্ষণ করে ঘায়েল করেছে বিশজন সিয়োক্সকে। ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে বিভলবার বার করে নির্ভুল লক্ষ্যে শুইয়ে দিচ্ছে যে আসছে দরজার সামনে।

কত লাশ যে ঘুরন্ত চাকায় কচুকাটা হল, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এভাবে লড়াই চালানো বেশীক্ষণ সম্ভব । দশ মিনিট লড়েছে এই অবস্থা—দীর্ঘক্ষণ লড়াই হলে সিয়োক্সরা জবলাভ করবেই। আর মাত্র ৬ মাইল গেলেই ফোর্টকিয়ার্নি স্টেশন। সেখানকার ঘেঁটিতে সেপাই রয়েছে বিস্তর। ট্রেন যদি সেখানে না থেমে বেরিয়ে যায়, তাহলে ট্রেনশুদ্ধ লোককে খতম করে ছাড়বে সিয়োক্সরা।

ফগের পাশেই দাড়িয়ে বীরবিক্রমে লড়ছিল কনডাক্টর গার্ড। আচমকা একটা গুলি এসে বিঁধল তার বুকে, লুটিয়ে পড়ার আগে দেহের শেষ শক্তিবিন্দু দিয়ে বলে গেল—পাঁচ মিনিটের মধ্যে টেন না দাড়ালে কেউ আর বাঁচবেন না।"

'টেন দাঁড়াবেই," বলে কামরা থেকে ছুটে বেরোতে গেলেন ফগ। কিন্তু তার আগেই বন্দুকের বুলেটের মত সাঁ করে বেরিয়ে গেল পাসপার্তু। যেতে যেতে বললে—"আমি যাচ্ছি।"

ডানপিটে ভৃত্যকে রোখবার সময় পেলেন না ফগ। রেড ইণ্ডিয়ানদের বুঝতে না দিয়ে একটা দরজা খুলে চক্ষের পলকে গাড়ীর তলায় অন্তর্হিত হল পাসপার্তু।

বাজীকর হিসেবে অনেকদিনের চর্চাকে নতুন করে ঝালিয়ে নিল ট্রেনের তলায়। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় শেকল, ব্রেক, পাইপ আর ইস্পাতের পাত ধরে ধরে এগোলো ইঞ্জিনের দিকে—ওপরে যখন গুলি চলছে—নীচে তখন ঝুলতে ঝুলতে অদ্ভুত নৈপুণ্যে এগিয়ে চলেছে পাসপার্তু।

কামরার পর কামরা সুকৌশলে পেরিয়ে এল সে। লাগেজ-গাড়ী আর ইঞ্জিনের মাঝে পৌঁছে লোহার ডাণ্ডা ধরল এক হাতে—আরেক হাতে খুলে দিল লোহার শেকল। দুই গাড়ীকে একসঙ্গে ধরে রেখেছিল মোটা শেকলটা—খুলে যেতেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি পড়ল লোহার ডাণ্ডার ওপর। পাসপার্তু শুধু হাতে কিছুতেই পেঁচিয়ে খুলতে পারত না ডাণ্ডাটা কিন্তু ছুটন্ত ট্রেনের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে চক্ষের পলকে ডাণ্ডা উপড়ে বেরিয়ে গেল। ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ইঞ্জিন। আস্তে আস্তে পেছিয়ে পড়ল গোটা ট্রেনটা—লেজুড় খসে যাওয়ায় উল্কাবেগে সামনে ছিটকে গেল ইঞ্জিন গাড়ীটা।

ট্রেনের গতি ক্রমশঃ কমতে লাগল। মিনিট কয়েকের মধ্যে ব্রেক ধরে গেল চাকার। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল কোর্টকিয়ার্নি স্টেশন থেকে একশ ফুট দূরে।

গুলির আওয়াজে কেল্লা থেকে মার-মার করে ছুটে এল ফৌজ। সিয়োক্সরা বেগতিক দেখে গাড়ী থামবার আগেই লাফিয়ে পড়ে চম্পট দিল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের সংখ্যা গুণতে গিয়ে পাওয়া গেল না অনেককেই—যার জন্যে যাত্রীরা বেঁচে গেল, দুর্দান্ত সাহসী সেই ফরাসীটিও ছিল নিখোঁজদের ফর্দে!

২৮॥ ফিলিয়াস ফগ কর্তব্য করলেন

তিনজন প্যাসেঞ্জার নিখোঁজ হয়েছে। পাসপার্তু তাদের একজন। তারা যুদ্ধে নিহত হয়েছে কি সিয়োক্সদের কয়েদী হয়েছে, কে তা বলবে?

আহত হয়েছে অনেকে—তবে মারাত্মকভাবে নয়। কর্ণেল প্রোক্টর অবশ্য বড় চোট পেয়েছে। একটা সীসের গুলি ঢুকে রয়েছে তার কুঁচকির মধ্যে। স্টেশনে তাকে নামিয়ে নেওয়া হল চিকিৎসার জন্যে।

আউদা বেঁচে গেছেন। ফিলিয়াস ফগের গায়ে আঁচড়টি লাগেনি, অথচ তিনি ছিলেন সব চাইতে বেশী রক্তারক্তির মধ্যে। ফিক্সের হাতে সামান্য

চোট লেগেছে। পাওয়া গেল না কেবল পাসপার্তুকে। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন আউদা।

ট্রেন থেকে নেমে পড়েছে যাত্রীরা। চাকা লাল হয়ে গেছে রক্তে। টায়ার আর স্পোক থেকে টুকরো টুকরো নরমাংস ঝুলছে। ফেলে আসা তুষারাবৃত প্রান্তরের ওপর শোণিত রেখা। সিয়োক্সেরা দক্ষিণ দিগন্তে অপস্রিয়মান।

ত্'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখে নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে রইলেন মিস্টার ফগ। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন উনি। পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে তাঁর পানে তাকিয়ে অশ্রুপাত করছেন আউদা। চাহনি দিয়ে অনুনয় করছিলেন ফগকে। সিয়োক্সরা যদি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে থাকে পাসপার্তুকে, তার কি উচিত নয় সবস্ব পণ করে তাকে উদ্ধার করা? শান্তকণ্ঠে আউদাকে অভয় দিলেন ফগ—"জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় পাসপার্তুকে আমি ফিরিয়ে আনব, কথা দিচ্ছি।

দুহাতে অশ্রুসজল চোখ চাপা দিয়ে শিউরে উঠলেন আউদা—"মিস্টার ফগ ·· মিস্টার ফগ।"

তাড়াতাড়ি শুধরে নিলেন ফগ "এখুনি বেরিয়ে পড়লে জীবিত অবস্থাতেই পাব।"

ফিলিয়াস ফগ স্বেচ্ছায় ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হলেন। একদিন দেরী হলেই নিউইয়র্কগামী জাহাজ ফস্কে যাবে জেনেও তিনি কর্তব্যকে প্রাধান্য দিলেন সবাগ্রে।

কেল্লার সেনাধ্যক্ষ হাজির ছিলেন স্টেশনে। শখানেক সৈন্য নিয়ে তিনি স্টেশন পাহারা দিচ্ছেন, বলা যায় না, সিয়োক্সরা ফের ফিরে আসতে পারে।

সেনাধ্যক্ষকে বললেন ফগ—"জানেন নিশ্চয় তিনজন যাত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"মারা গেছে কী?" শুধোলেন ক্যাপ্টেন।

"মারা যেতে পারে, অথবা বন্দীও হতে পারে। সিয়োক্সদের ধাওয়া করতে চান কী?"

"জিনিসটা সিরিয়াস। সিয়োক্সরা আরকানসাস-য়ের আড়ালে গা-ঢাকা দিতে পারে। কেল্লা অরক্ষিত রেখে আমার যাওয়া ঠিক হবে না।"

"তিনজনের প্রাণ যেতে বসেছে, খেয়াল রাখবেন।"

"তা ঠিক। কিন্তু তিনজনের প্রাণ রক্ষার জন্যে পঞ্চাশজনের প্রাণের ঝুঁকি আমি নিতে পারি কি?"

"পারবেন কিনা জানিনা, তবে নেওয়া উচিত।"

"উচিত অনুচিতের শিক্ষা নিতে আমি আসিনি," বললেন ক্যাপ্টেন।

"তাহলে আমি একাই চললাম।" তাপহীন কণ্ঠ ফগের।

দৌড়ে সামনে এলেন ফিক্স—"বলেন কী! আপনি একা রেড ইণ্ডিয়ানদের ধাওয়া করবেন?"

"যার জন্যে আমরা এখনও বেঁচে রয়েছি, তাকে প্রাণে মারতে চান নাকি? চললাম আমি।"

"আরে মশাই, আপনি একা যাবেন কেন?" ফগের সাহসে অভিভূত হয়ে বললেন সেনাধ্যক্ষ। "আপনি বীর! তিরিশজন সৈন্য চাই!" হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন।

তৎক্ষণাৎ গোটা বাহিনীটা পা বাড়ালো যাওয়ার জন্যে। তিরিশজনকে বাছাই করে নিলেন সেনাধ্যক্ষ। একজন বৃদ্ধ সার্জেন্টকে দলের নেতা করা হল।

"ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন," বললেন ফগ।

"আপনার সঙ্গে আমিও আসতে চাই," বললেন ফিক্স।

"আপনার খুশী। তবে আউদাকে আগলালে আমি নিশ্চিন্ত থাকতাম—"

ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন গোয়েন্দা ফিক্স। এত ঝড় ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে যার পেছন পেছন তিনি ছায়ার মত চলেছেন, তাকে নজর ছাড়া করতে হবে? মরুভূমিতে একলা হারিয়ে যাবেন ফগ? পলকহীন চোখে ফগের পানে চেয়ে রইলেন ফিক্স। অন্তর্দ্বন্দ্বে শতধাবিদীর্ণ হয়েও ফগের শান্ত অকপট চাহনির সামনে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলেন।

বললেন – "বেশ, আমি রইলাম।"

টাকা ভর্তি কার্পেট-ব্যাগটি আউদার হাতে সঁপে দিয়ে রওনা হলেন ফগ। যাওয়ার আগে অবশ্য সৈন্যদের বললেন—"বন্দীদের যদি উদ্ধার করতে পারি, আমি কথা দিচ্ছি পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ভাগ করে দেবো আপনাদের মধ্যে।"

তখন সবে দুপুর বারোটা।

ওয়েটিংরুমে গিয়ে একলা বসে রইলেন আউদা। ফিলিয়াস ফগের সাহস আর উদারতা অন্তর স্পর্শ করেছিল তাঁর। কি আশ্চর্য মানুষ ইনি! শৌর্যে বীর্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, অথচ বিন্দুমাত্র আস্ফালন নেই, মুখে কোনো বড়াই নেই। নীরবে নিঃশব্দে যাবতীয় টাকা কড়ি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হলেন, এমনি কি জীবন বিসর্জন দিতেও মনে মনে তৈরী হলেন তিলমাত্র দ্বিধা না করে—নিছক কর্তব্যের খাতিরে।

ফিক্সের মাথায় তখন অন্য চিন্তা তালগোল পাকাচ্ছে। উত্তেজনায় ক্ষিপ্তের মত কিছুক্ষণ প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করার পর হাবভাবের উত্তেজনা অনেকটা দমন করে ফেললেন—মনের মধ্যে উত্তেজনা কিন্তু তুঙ্গে চড়ে রইল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একী করলেন তিনি! একী আহাম্মুকি করে বসলেন সারা পৃথিবী চষে আসার পর! জেনেশুনেও চোখের আড়াল করলেন তস্কর-সম্রাট কে? গাল পাড়তে লাগলেন নিজেকে—"গাধা কোথাকার! পকেটে গেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পগার পার হতে দিলে আসামীকে?"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অস্থির প্রতীক্ষায় কাটল। সহস্র চিন্তায় পাগলের মত হয়ে রইলেন ফিক্স। আউদাকে খুলে বলবেন ফগের প্রকৃত পরিচয়? কিন্তু রাণী আউদা বিশ্বাস করবেন কি? বরফের ওপর ফগের পদচিহ্ন দেখে অনুসরণ করবেন? কিন্তু বরফের ওপর পায়ের ছাপ বেশীক্ষণ তো থাকে না। নতুন বরফ ঢেকে দেয় পদচিহ্ন—ধূ ধূ বরফ প্রান্তরে কোনো চিহ্নই থাকে না।

হাল ছেড়ে দিলেন ফিক্স। কি হবে আর খামোকা বরফ রাজ্যে বসে থেকে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া যাক।

দুটো নাগাদ হুস্‌হুস্‌ শোনা গেল। তখন বেশ জোরে বরফ পড়ছে। বেশী দূর দৃষ্টি চলে না। পূর্বদিক থেকে দীর্ঘ বংশীধ্বনি ভেসে এল বরফপাতের মধ্যে দিয়ে।

এ সময় বংশীধ্বনি? আচমকা দেখা গেল একটা বিরাট ছায়া কুয়াশার মধ্যে জোরালো আলো ফেলে এগিয়ে আসছে।

তাজ্জব কাণ্ড তো! পূর্বদিক থেকে এ সময়ে ট্রেন আসার কথা নয়। তবে?

রহস্যের সমাধান হয়ে গেল অচিরে।

কানে তালা লাগানো শব্দে সিটি বাজিয়ে লাইন কাঁপিয়ে আসছে আস্ত কোনো ট্রেন নয়—শুধু একটা ইঞ্জিন। বিচ্ছিন্ন সেই ইঞ্জিনটা ট্রেন থেকে বন্ধন মুক্ত হয়ে বিপুলবেগে ধেয়ে গিয়েছিল বেশ কিছু মাইল। তারপর নতুন কয়লার যোগান না পেয়ে আগুন নিভে যায়, বাষ্প ফুরিয়ে যায় এবং ইঞ্জিন আপনা হতেই দাঁড়িয়ে যায় ফোর্ট কিয়ার্নি স্টেশন থেকে বিশ মাইল দূরে।

ইঞ্জিনীয়ার ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান দুজনের কেউই কিন্তু প্রাণে মারা যায় নি। বন্দুকের কুঁদোর মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে পড়ার পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে ড্রাইভার বুঝে নিল কি হয়েছে। সে অবশ্য ভেবেছিল, গাড়ীশুদ্ধ লোক সিয়োক্সদের খপ্পরে যখন পড়েছে, তখন এখনো লুঠপাট চলছে নিশ্চয়। এক্ষেত্রে প্রাণের মায়া থাকলে সোজা পিঠটান দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ড্রাইভার বিপজ্জনক পন্থাটাই বেছে নিলেন। অর্থাৎ ইঞ্জিন নিয়ে ফিরে

এলেন ফোর্ট কিয়ার্নিতে। ঘনঘন হুইসল বাজিয়ে কুয়াশার মধ্যে থেকে ভুতুড়ে গাড়ীর মত বেরিয়ে এল এই ইঞ্জিনটাই।

যাত্রীরা মহাখুশী হল ট্রেনের মাথায় ফের ইঞ্জিন লাগতে দেখে। আর কী! নির্বিঘ্নে যাত্রা শুরু করা যাবে এখন।

আউদা দৌড়ে বাইরে এসে শুধোলেন রেলপথের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে—"গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, এখুনি ছাড়ছি।"

"কিন্তু সহযাত্রী ক'জন যে বন্দী—'

"তাদের জন্যে বসে থাকা সম্ভব নয়। এমনিতেই তো তিন ঘণ্টা দেরী করে বসে আছি।"

"পরের ট্রেন কখন পাচ্ছি?"

"কাল সন্ধ্যায়।"

"কাল সন্ধ্যায়! কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে যাবে যে! ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত—"

"অসম্ভব! অপেক্ষা করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। আপনি যেতে চান তো উঠে পড়ুন ট্রেনে।"

"আমি যাবো না," বললেন আউদা।

ফিক্স সব শুনলেন। একটু আগেই ভাবছিলেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া যাক। কিন্তু ফেরার পথ পরিষ্কার হয়ে যেতেই মন ঘুরে গেল। আবার দারুণ রাগ হয়ে গেল নিজের ওপর। হাতে পেয়েও চোরশিরোমণিকে কেউ ছেড়ে দেয়? না, শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কি হয়।

কর্ণেল প্রোকটর এবং অন্যান্য যাত্রীদের নিয়ে ঘনঘন সিটি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে গেল।

গোয়েন্দা ফিক্স রাগে ফুলতে লাগলেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে।

আরও কয়েকটা ঘণ্টা গেল। আবহাওয়া আরো খারাপ হয়েছে। ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। স্টেশনের বেঞ্চিতে নিস্পন্দ দেহে বসে আছেন ফিক্স। ওয়েটিংরুমে চুপচাপ বসে থাকতে পারছেন না আউদা। বারবার বাইরে আসছেন। তুষার ঝড়ের মধ্যেও প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়ে তাকিয়ে দেখছেন দূর দিগন্ত। কিন্তু বৃথাই।

কেল্লার সেনাধ্যক্ষও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তিরিশজন সৈন্য কি তাহলে আত্মাহুতি দিল?

রাত বাড়তে লাগল, বৃদ্ধি পেল তুষারপাত আর শীতের কামড়। চারদিক আশ্চর্য নিস্তব্ধ।

সারারাত ঠায় বসে রইলেন রাণী আউদা। তাঁর তখনকার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।

ফিক্স বেঞ্চি ছেড়ে নড়লেন না, ঘুমোলেনও না। মাঝরাতে একটা লোক এসে কি যেন বলল তাঁকে। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন গোয়েন্দা।

রাত ভোর হল। কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে মরা সূর্য উঁকি দিল। কিন্তু দিগন্তে ফগ এবং ফৌজী অনুচরদের ছায়াও দেখা গেল না।

কেল্লার ক্যাপ্টেন এতক্ষণে প্রমাদ গুণলেন। তিরিশজনের অবস্থা কি হয়েছে জানার জন্যে আর একদল সৈন্য পাঠানোর হুকুম দিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দূরে বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল।

সংকেত নাকি? কেল্লা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল সৈন্যরা। দেখল, আধমাইল দূরে অক্ষত দেহে ফিরছেন ফগ এবং অন্যান্য সৈন্যরা।

ছোট্ট দলটার পুরোভাগে রয়েছেন ফিলিয়াস ফগ। ঠিক পেছনেই পাসপার্তু এবং আরো দুজন নিখোঁজ যাত্রী।

দশ মাইল যাওয়ার পর রেড ইণ্ডিয়ানদের ধরে ফেলেছিলেন ফগ। তার একটু আগেই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বেপরোয়া পাসপার্তু বেধড়ক ঘুসি চালিয়ে তিনজন সিয়োক্সকে শুইয়ে ফেলেছে। এমন সময়ে সদলবলে এসে পৌঁছোলেন ফগ। চলল দুমদাম গোলাগুলি। রণে ভঙ্গ দিল সিয়োক্সরা বন্দীদের পেছন ফেলে।

হৈ-হৈ পড়ে গেল বিজয়ী সৈন্যদের ফিরতে দেখে। ফগ পাঁচ হাজার পাউণ্ড ভাগ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কথামত টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে ভাগ করে প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন তিনি। তাই দেখে পাসপার্তুর আক্ষেপের অবধি রইল না—"হায়রে! আমার জন্যেই মনিবের এতগুলো টাকা গলে গেল!"

ফিক্স দুর্বোধ্য চাহনি মেলে চেয়ে রইলেন ফগের পানে। তাঁর তখনকার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। আউদা ফগের দুহাত চেপে ধরে সুগভীর চোখে কেবল চেয়ে রইলেন, কথা বলতে পারলেন না।

পাসপার্তু কিন্তু ট্রেনে ওঠবার ফিকির করছে। কিন্তু ট্রেন কই? কোথায় ট্রেন? ট্রেন তো তাকে ফেলে যেতে পারে না?

"ট্রেন চলে গেছে," বললেন ফিক্স।

"পরের ট্রেন কখন আসছে?" শুধোলেন ফগ।

"আজ সন্ধ্যার আগে নয়।"

"ও," ওর বেশী আর কিছু বললেন না অবিচল মূর্তি ফিলিয়াস ফগ।

২৯ ॥ ফগের স্বার্থে ফিক্স

বিশ ঘণ্টা দেরী করে ফেলেছেন ফিলিয়াস ফগ। বিলম্বের কারণ পাসপার্তু। সুতরাং তার মানসিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। তার জন্যেই সর্বনাশ হয়ে গেল মনিবের।

ঠিক এই সময়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন ডিটেকটিভ। মর্মভেদী চাহনি দিয়ে মিস্টার ফগের ভেতর পর্যন্ত যেন দেখে নিয়ে বললেন—"সত্যিই কি আপনার তাড়া আছে? এখুনি রওনা হওয়ার জন্যে কি সিরিয়াস আপনি?"

"খুবই সিরিয়াস।"

"কারণ আছে বলেই কথাটা জিজ্ঞেস করছি। সত্যিই কি লিভারপুলের জাহাজ ধরার জন্যে এগারো তারিখে নটার আগেই নিউইয়র্ক পৌঁছোতে চান?"

"হ্যাঁ। পৌঁছোতে আমাকে হবেই।"

"সিয়োক্সদের উৎপাত না ঘটলে, আপনি এগারোই সকালে পৌঁছে যেতেন নিউইয়র্কে?"

"পৌঁছেও হাতে এগারো ঘণ্টা থাকত—জাহাজ ছাড়ত এগারো ঘণ্টা পরে।"

'আপনি কুড়ি ঘণ্টা পেছিয়ে আছেন। কুড়ি থেকে বারো বাদ গেলে থাকে আট। অর্থাৎ এই আট ঘণ্টা দেরীকে পুষিয়ে নিতে হবে আপনাকে যে করেই হোক। চেষ্টা করে দেখবেন নাকি?"

"পায়ে হেঁটে নাকি?"

"না, না, স্লেজ গাড়ীতে চেপে। পাল তোলা স্লেজ। একটা লোক এসে বলছিল আমাকে এ রকম স্লেজ গাড়ী নাকি তৈরী রয়েছে তার কাছে।"

গতরাতে যে-লোকটা এসে কথা বলে গিয়েছিল ফিক্সের সঙ্গে, এ সেই লোক। ফিক্স কর্ণপাত করেন নি তার প্রস্তাবে।

ফগ তক্ষুনি কোনো কথা বললেন না। স্টেশনের বাইরে পায়চারী করছিল লোকটা, দেখিয়ে দিলেন ফিক্স। ফগ গিয়ে দাঁড়ালেন তার সামনে। নাম তার মাজ, জাতে আমেরিকান। দুজনে মিলে গেলেন কেল্লার নীচে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে।

অদ্ভুত গড়নের একটা যান দেখলেন মিস্টার ফগ। দুটো লম্বা বরগার ফ্রেমের ওপর কিম্ভূতকিমাকার গাড়ীটাকে দেখতে অনেকটা স্লেজ গাড়ীর মত। বরগা দুটোর সামনের প্রান্ত ওপরদিকে বেঁকানো—যেমন স্লেজ গাড়ীতে থাকে।

গাড়ীর ভেতর প্রায় ছ'জন অনায়াসে বসতে পারে। ফ্রেমের ওপর বাঁধা একটা উঁচু মাস্তল। লোহার পাত দিয়ে বেশ মজবুত করে আঁটা মাস্তলের গায়ে ঝুলছে মস্ত বড় জোড়া-পাল। লোহার ঠেকনা থেকে তেকোণা পাল ঝোলানোর ব্যবস্থাও আছে—এ-পাল থাকে মাস্তলের একদম ডগায়। পেছনে হাল ঝুলছে গাড়ীকে খুশীমত এদিক-সেদিকে চালানোর জন্যে। এক কথায় বলতে গেলে, স্লেজ গাড়ীটাকে বানানো হয়েছে এক-মাস্তল হাল্কা নৌকোর ছাঁদে। শীতকালে বরফ পড়ে রেলপথ বন্ধ হয়ে গেলে এই স্লেজ-নৌকো পাল তুলে দিয়ে অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে প্রান্তর পেরিয়ে ছুটে যায় এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে। হাওয়ার ঠেলায় পালের সাহায্যে যে গতিবেগে স্লেজ-নৌকো হুড়কে যায় বরফ পিচ্ছিল ধু ধু প্রান্তরের ওপর দিয়ে—তা এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিবেগের চাইতেও বেশী।

স্লেজ নৌকোর মালিকের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ দর ঠিক করে ফেললেন মিস্টার ফগ। টাটকা হাওয়া অনুকূলে বইছে পশ্চিম থেকে। বরফ জমে কঠিন হয়েছে। মাজ কথা দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওমাহা পৌঁছে দেবে মিস্টার ফগকে। অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে ঠিক, কিন্তু তা পুষিয়ে নেওয়া অসম্ভব হবে না।

খোলা হাওয়ায় আউদার কষ্টের সীমাপরিসীমা থাকবে না, এই আশংকায় ফগ চাইলেন আউদা আর পাসপার্তু থাকুন স্টেশনে। পরের ট্রেনে ফিরবে তারা। কিন্তু রাণী আউদা বেঁকে বসলেন। ফগের সঙ্গ-ছাড়া হবেন না তিনি। শুনে ভীষণ পুলকিত হল পাসপার্তু। সে ও মনিবকে ফিক্সের সঙ্গে একা ছাড়তে চায় না।

ফিক্সের ভেতরে তখন দোটানার তুফান চলেছে। পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারায় অন্তরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। ফগ কি নিছক নিরাপত্তার খাতিরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড পৌঁছোতে চাইছেন? অতিশয় ধূর্ত বদমাস বলেই কি মিস্টার ফগ অকুণ্ঠ সরলতার ভান করে রয়েছেন? চুলোয় যাকগে! ফিক্স তাঁর কর্তব্য করবেন। আগে তো চটপট ফেরা যাক ইংলণ্ডে।

আটটা নাগাদ যাত্রার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল। যাত্রীরা বেশ করে শীতের পোশাকে সর্বাঙ্গ মুড়ে উঠে বসলেন গাড়ীর ভেতরে। জোড়া পাল তুলে দিতেই হাওয়ায় নড়ে উঠল স্লেজ-নৌকো। কঠিন বরফের ওপর পিছলে গেল দ্রুতবেগে—দেখতে দেখতে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ধেয়ে চলল বরফ হাওয়া তেপান্তরের ওপর দিয়ে।

ফোর্ট কিয়ার্নি থেকে ওমাহা দুশ মাইল দূরত্ব। হাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং পথে বিঘ্ন উপস্থিত না হলে পাঁচ ঘণ্টায় দুশ মাইল পেরিয়ে যাওয়া যাবে—ওমাহা পৌঁছোনো যাবে একটা নাগাদ।

সেদিনের সেই যাত্রার অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন যাত্রীরা, কথা বলতে পারছেন না অত্যধিক শৈত্যের জন্যে। ছোটার বেগে শীতটা আরও বেশী মালুম হচ্ছে। ঢেউয়ের ওপর সহজভাবে নৌকো যায় যে ভাবে, স্লেজ চলেছে বরফের ওপর দিয়ে সেই রকম হাল্কা ভাবে। এক একবার হাওয়া জোর হচ্ছে, মনে হচ্ছে স্লেজ যেন বরফ ছেড়ে শূন্যে ভর দিয়ে ছুটছে। আর একটা তেকোণা পাল খাটিয়ে দেওয়া হয়েছে মাস্তুলের ডগায়। স্লেজ-নৌকো টলে টলে উঠলে হাল নেড়ে আর হাত ঝোঁকিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছে মাজ। সব মিলিয়ে গড়ে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটছে আজব স্থল নৌকো।

মাজকে মোটা বখশিশের লোভ দেখিয়েছেন ফগ—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওমাহা স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে তাদের।

বরফ-প্রান্তর সমুদ্রের মতই চ্যাটালো এবং দিগন্ত বস্তৃত। ঠিক যেন একটা বিশাল সরোবর জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। এমন কি পথের নদী-নালা পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে যাওয়ায় অক্লেশে তার ওপর দিয়ে পিছলে চলেছে স্লেজ নৌকো। মাস্তুল বেঁকে যাচ্ছে হাওয়ার বেগে—কিন্তু আংটা থেকে খুলে আসছে না ধাতব রজ্জুর বাঁধনের জন্যে। ধাতব রজ্জু টান টান হয়ে রয়েছে বেহালার তারের মত। হাওয়ার ধাক্কায় মিহি রাগিণী বাজিয়ে চলেছে তারগুলো। ঠিক যেন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে অশরীরী পরীরা।

তারগুলো কি সুরে বাঁধা, ওস্তাদ সঙ্গীত বিশারদের মত বলে দিলেন মিস্টার ফগ।

এই একবার ছাড়া আর কথা বলেন নি ফগ। আউদা গুটিসুটি মেরে বসে রইলেন এককোণে। পাসপার্তু রক্তিম মুখে অতিকষ্টে নিঃশ্বাস নিতে লাগল হু হু হাওয়ার মুখে। মাঝে মাঝে তার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল আহ্লাদে জাপটে ধরে ফিক্সকে—তার চেষ্টাতেই তো স্লেজ নৌকো পাওয়া গেল।

নদী-নালা মাঠ-পথ—কিছু আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু বরফ আর বরফ। সাদা বরফের চাদর পাতা দিক হতে দিগন্তে। মাঝে মাঝে বরফ ঢাকা গাছগুলো কংকাল দেহ প্রেতমূর্তির মতই দ্রুত এগিয়ে এসে মুহূর্তে অপসৃত হচ্ছে পেছনে। কখনো ভৌতিক পাখীর মত প্রান্তরের পাখীগুলো ডানা ঝটপটিয়ে লাফিয়ে উঠছে। কখনো তেড়ে আসছে উপোষী নেকড়ে।

পাসপার্তু রিভলবার হাতে বসে রয়েছে। এতটুকু বিঘ্ন সইতে সে নারাজ। আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে নেকড়ের রক্ত জল করা চীৎকার।

দুপুর নাগাদ মাজ বুঝল আর মাত্র বিশ মাইল গেলেই ওমাহা স্টেশন। একঘণ্টাও গেল না, চেঁচিয়ে উঠল সে—"নেমে পড়ুন, এসে গেছি!"

লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন যাত্রীরা। মাজ-এর হাতে প্রতিশ্রুতি মত বখশিস গুঁজে দিয়ে রেল স্টেশনের দিকে রওনা হলেন ফগ।

ওমাহা থেকে বিস্তর ট্রেন রওনা হচ্ছে নানা দিকে। ওরা এসে দেখলেন একটা ট্রেন ছাড়ল বলে। হুড়মুড় করে কোন মতে কামরার মধ্যে উঠে পড়লেন সকলে। ট্রেন ছেড়ে দিল।

পরের দিন, অর্থাৎ দশ তারিখে, বিকেল চারটায় শিকাগো পৌঁছোলো ট্রেন। ট্রেনের অভাব নেই সেখানে। ফগ তক্ষুনি উঠে পড়লেন আর একটা ট্রেনে। সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রবেগে শুরু হল যাত্রা। নিষ্প্রাণ রেল গাড়ীটাও যেন বুঝল, মিস্টার ফগ নামক আরোহীর দারুণ তাড়া রয়েছে। তাই যেন একটা বিদ্যুৎ ছুটে গেল ইণ্ডিয়ানা, ওহিও, পেনসিলভানিয়া আর নিউজার্সির ওপর দিয়ে। এগারো তারিখে রাত সাড়ে এগারোটায় জাহাজঘাটার পাশেই এসে হাঁপাতে লাগল বেগবান ট্রেনটা।

হায়রে কপাল! মাত্র পৌনে এক ঘণ্টা আগে ছেড়ে গিয়েছে লিভারপুল-গামী জাহাজ 'চায়না'!

৩০ দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ফগের হাতাহাতি

'চায়না' গেল, সেই সঙ্গে গেল ফগের শেষ ভরসা। চৌদ্দ তারিখের আগে কোনো বেগবান জাহাজ পাওয়া যাবে না। সংক্ষেপে, বাজী হারলেন ফিলিয়াস ফগ।

পাসপার্তু একেবারেই ভেঙে পড়ল। কোথায় মনিবকে সে সাহায্য করবে, তা না তার সর্বনাশ করে ছাড়ল সে। তার জন্যে মুঠোমুঠো টাকা উড়িয়েছেন মনিব। শেষ মুহূর্তেও তার যথাসর্বস্ব গেল শুধু একটা অকেজো চাকরের জন্যে। আত্মধিক্কারে ম্রিয়মান হয়ে রইল পাসপার্তু।

মিস্টার ফগ অবশ্য তাকে কিছুই বললেন না। তিরস্কারও করলেন না। জাহাজঘাটা থেকে বেরিয়ে এসে কেবল বললেন—"কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। আসুন সবাই।"

খেয়া নৌকোয় নদী পেরিয়ে সদলবলে হোটেলে উঠলেন ফগ। কিন্তু

ফিরে চলেছেন তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডে। ঘরের বন্দোবস্ত করে তোফা নিদ্রা দিলেন ফিলিয়াস ফগ। অন্যান্য সকলে বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন নিঃসীম উদ্বেগে।

পরের দিন বারোই ডিসেম্বর। সেদিন সকাল সাতটা থেকে একুশে ডিসেম্বর রাত নটা পর্যন্ত মোট সময় হল ন'দিন তেরো ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। 'চায়না'র মত বেগবান কলের জাহাজে চাপলে নির্দিষ্ট সময়ে লণ্ডন পৌঁছে যেতেন ফগ।

একা হোটেল থেকে বেরোলেন ফগ। নদী পেরিয়ে জাহাজঘাটায় এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মনের মত জাহাজ পেলেন না। মনে মনে যখন নিরাশ হয়ে পড়েছেন বললেই চলে, ঠিক তখনি একটা মালবওয়া জাহাজ চোখে পড়ল তাঁর। জাহাজের নাম হেনরিয়েটা—প্রপেলারে চলে। মজবুত গড়ন। চিমনী দিয়ে গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অর্থাৎ সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে 'হেনরিয়েটা'।

একটা নৌকো ভাড়া করে জাহাজের ডেকে গিয়ে উঠলেন ফগ। দেখলেন 'হেনরিয়েটা'র খোলটা লোহার তৈরী, কিন্তু ওপরের অংশ কাঠে তৈরী। ক্যাপ্টেনের সামনে হাজির হয়ে দেখলেন ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। ঠিক যেন সামুদ্রিক-নেকড়ে। বিশাল চোখ, তামাটে রং, লাল চুল, পুরু ঘাড় হেঁড়ে গলা।

"আপনিই ক্যাপ্টেন," শুধোলেন ফগ।

"হ্যাঁ আমিই ক্যাপ্টেন।"

"আমি ফিলিয়াস ফগ, লণ্ডনে থাকি।"

"আমি অ্যানড্রু স্পীডি, কার্ডিফে থাকি।

"আপনি কি এখুনি জাহাজ ছাড়ছেন?"

"ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছাড়ছি "

"কোথায় যাচ্ছেন?"

"বোর্দো।"

"মালপত্র?"

"নিচ্ছি না। খালি জাহাজ ঠিক রাখার জন্যে পাথর, বালি দিয়ে ভারী করে নিচ্ছি।"

"যাত্রী নিয়েছেন?"

"না। যাত্রী নিই না আমি। জ্বালিয়ে মারে রাস্তায়।"

"আপনার জাহাজ কি তাড়াতাড়ি চলে?"

"ঘণ্টায় এগারো-বারো মাইল যায়। 'হেনরিয়েটা'র নাম ডাক আছে।"

"লিভারপুলে নিয়ে যাবেন আমাকে এবং আরো তিনজনকে ?"

"লিভারপুল কেন, চীনদেশে চলুন না ?"

"আমি লিভারপুলে যেতে চাই।"

"না !"

"না ?"

"না। বোর্দো যাচ্ছি, বোর্দো-ই যাবো।"

"যদি অনেক টাকা দিই ?"

"দরকার নেই।"

"হেনরিয়েটার মালিকের দরকার হতে পারে।"

"আমিই 'হেনরিয়েটা'র মালিক।"

"হেনরিয়েটাকে ভাড়া দিন।"

"দেব না।"

"বিক্রী করুন।"

"করব না।"

মিস্টার ফগের মুখ দেখে মনে হল না তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এটা হংকং নয়, জাহাজটাও 'তান্কাদেরে' নয়। নিউইকের 'হেনরিয়েটা'র কাছে টাকার জারিজুরী যে খাটে না, হাতেনাতে তার প্রমাণ পেলেন ফগ।

এখন উপায় ? এ-যাবৎ টাকাই একমাত্র মুস্কিল আসান হিসেবে ভেল্কী দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু 'হেনরিয়েটা'র মালিক টাকার টোপও গিলতে চাইল না।

কিন্তু যে ভাবেই হোক অ্যাটলান্টিক পেরোতেই হবে। অর্ণবপোত যদি না মেলে, বেলুনের শরণ নিতে হবে। যদিও বেলুনে চড়ে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাওয়াটা একটু বেশী রকমের ঝুঁকি হয়ে যাবে, তাছাড়া ও জিনিসের রেওয়াজও নেই।

আচম্বিতে একটা ফন্দী এল ফগের মস্তিষ্কে।

শুধোলেন—"বোর্দো পযন্ত নিয়ে যাবেন কি ?"

"না। দুশ ডলার দিলেও না।"

"দু হাজার ডলার দেব।"

"মাথা পিছু ?"

"হ্যাঁ, মাথা পিছু।"

"সবশুদ্ধ চারজন আছেন ?"

"হ্যাঁ চারজন।"

মাথা চুলকোতে লাগল ক্যাপ্টেন। পথ পরিবর্তন হচ্ছে না, মাঝখান থেকে ফালতু আট হাজার ডলার পকেটে চলে আসছে। মন্দ কী? যাত্রী নেওয়ার ব্যাপারে ক্যাপ্টেনের নিদারুণ বিতৃষ্ণার মোক্ষম দাওয়াই হল কড়কড়ে আটটি হাজার ডলার। তাছাড়া এতটাকা এক কথায় যে-যাত্রীরা বার করতে পারে, তাদেরকে মূল্যবান পণ্যসামগ্রীও বলা যেতে পারে।

সোজা সুরে বলল ক্যাপ্টেন স্পীডি—"নটায় জাহাজ ছাড়ছি। আপনারা তৈরী?"

আরও সোজা সুরে জবাব দিলেন ফগ "নটায় জাহাজে আসছি।"

তখন সাড়ে আটটা। হেনরিয়েটা থেকে নেমে, হোটেলে পৌঁছে, দলবলকে মুহূর্তের নোটিসে রাস্তায় নামিয়ে ফের হেনরিয়েটায় ফিরতে ঠিক আধঘণ্টাই লাগল। জাহাজের নোঙর উঠছে তখন। আগাগোড়া আশ্চর্য নিরুদ্বেগ নিরুত্তাপ নির্বিকার রইলেন ফগ। তাড়াহুড়োর লেশমাত্র দেখা গেল না কথাবার্তায়।

কিন্তু পাসপার্তু শেস সমুদ্র যাত্রার খরচটা শুনে 'আঁউ' করে বসে পড়ল ডেকের ওপর।

আর ফিক্স ভাবলেন, ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের পুরো টাকা উদ্ধার করা যাবে না দেখছি। যাওয়ার পথে ফগ যদি সাগরের জলে কয়েক মুঠো নোট নাও ফেলেন, ইংলণ্ড পৌঁছে দেখা যাবে হাজার সাতেক পাউণ্ড উড়িয়ে দিয়েছেন তস্কর-সম্রাট ফিলিয়াস ফগ। চোরাই টাকা তো, মায়া কম!

৩১ ॥ ফিলিয়াস ফগ কোনো কাজেই পেছপা নন

ঠিক একঘণ্টা পরে হাডসন নদীর আলোকস্তম্ভ পেরিয়ে এল 'হেনরিয়েটা', স্যানডি হুক-এর মোড় ঘুরে সমুদ্রে পৌঁছোলো। সারাদিন একটানা চলে পেছনে ফেলে এল লঙ আইল্যাণ্ড আর ফায়ার আইল্যাণ্ড।

পরের দিন দুপুরবেলা গট গট করে এক ব্যক্তি উঠে এল জাহাজের ব্রীজে। 'হেনরিয়েটা'র অবস্থান নির্ণয় করল ব্রীজে দাঁড়িয়ে। এই ব্যক্তি নিশ্চয় ক্যাপ্টেন স্পীডি, এমন মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু তা নয়। ইনি মিস্টার কিলিয়াস ফগ। স্পীডি রুদ্ধ কক্ষে বন্দী। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে তার বিকট বিশ্রী গালিগালাজ।

যা ঘটেছে, তা এই:

ফগ লিভারপুল যাবেনই, কিন্তু ক্যাপ্টেন তাঁকে নিয়ে যাবে না। সুতরাং বোর্দো যাওয়ার অছিলায় জাহাজে উঠে ব্যাঙ্কনোটের মহিমা দেখাতে শুরু করলেন ফগ। তিরিশ ঘণ্টার মধ্যে টাকার ফুসমন্তরে তাঁর কেনা গোলাম হয়ে গেল জাহাজের খালাসী আর ফায়ারম্যানরা। এরা প্রত্যেকেই ঠিকে কর্মচারী এবং ক্যাপ্টেনের দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ছিল। সুতরাং ফগের মিষ্টি বচন আর সিলভার টনিকে ওষুধ ধরল। একযোগে তারা কয়েদ করে রাখল ক্যাপ্টেন স্পীডিকে এবং হেনরিয়েটার ক্যাপ্টেনের পদে মেনে নিল ফিলিয়াস ফগকে। যে ভাবে তিনি জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, বেশ বোঝা যাচ্ছে নৌবিদ্যাটা তাঁর রীতিমত রপ্ত আছে। জাহাজ চলেছে লিভারপুল অভিমুখে।

ফগের অসমসাহসিকতায় আউদা বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন। পাসপার্তু কিন্তু মনিব-গর্বে দারুণ গর্বিত। ক্যাপ্টেন স্পীডি মিথ্যে বড়াই করেননি। 'হেনরিয়েটা'কে ঘণ্টায় এগারো বারো মাইল বেগে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ফগ। যদি সমুদ্র পাগলামি না করে, হাওয়া উলটো পালটা দিকে না বয়, কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে এবং কলকব্জা না বিগড়োয় তাহলে ন দিনে তিন হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারবে হেনরিয়েটা। পৌঁছোনোর পর অবশ্য ফগের কপালে অনেক দুঃখ লেখা রয়েছে। একে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নোট চুরীর অপরাধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, তার ওপর আস্ত একটা জাহাজ লোপাট!

কপালে যা থাকে থাকুক, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই পাসপার্তুর। আনন্দে সে ঘন ঘন ডিগবাজি খাচ্ছে খালাসীদের সামনে এবং বিবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করে চিত্ত বিনোদন করে চলেছে খালাসীদের। তার মত ফুর্তিবাজকে পেয়ে সবাই খুশী।

মাথার মধ্যে গোলমাল লেগে গেছে কেবল ফিক্সের। 'হেনরিয়েটা' বিজয়, খালাসীদের ঘুষ দিয়ে কিনে নেওয়া, ওস্তাদ নাবিকের মত ফগের জাহাজ চালনা,—সব কিছুই হতবুদ্ধি করে দিচ্ছিল ফিক্সকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন বেচারী। পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড যে সরাতে পারে, সে জাহাজ চুরীও করতে পারে। কিন্তু তস্কর-সম্রাট আদৌ লিভারপুল যাচ্ছে তো? ফিক্সের তীব্র সন্দেহ 'হেনরিয়েটা' চলেছে বিশ্বের অজানা কোনো অঞ্চলে; সেখানে গিয়ে ভোল পালটে তস্কর হবে বোম্বেটে—চোরাই জাহাজ চালিয়ে ডাকাতি করে বেড়াবে সাগরে সাগরে। সম্ভাবনাটা এমনি যুক্তিযুক্ত যে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন ফিক্স। এ-কাজ হাতে না নিলেই ভাল ছিল দেখছি। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রেই দেখা যায়—নইলে সারা পৃথিবী ঘুরে এসে বাড়ীর কাছে পৌঁছে এ-ভেলকি দেখাবে কেন ধুরন্ধর চোর ফিলিয়াস ফগ?

ক্যাপ্টেন স্পীডি বিরামবিহীন ভাবে তর্জন গর্জন আস্ফালন উল্লম্ফন করে চলেছে তালাচাবী দেওয়া কেবিনের মধ্যে। ফগের কিন্তু মনেই নেই যে জাহাজে একজন ক্যাপ্টেন রয়েছে। মনে আছে কেবল পাসপার্তুর। ক্যাপ্টেনের খাবার নিয়ে যাওয়ার ভার তার ওপর।

তেরো তারিখে 'হেনরিয়েটা' খুব খারাপ অঞ্চলে এসে পড়ল। শীতকালে এ-তল্লাটে ঝড় আর কুয়াশা লেগেই থাকে। সত্যি সত্যিই সন্ধ্যে থেকে ব্যারোমিটারে খারাপ আবহাওয়া আভাষ পাওয়া গেল। রাত্রে ঠাণ্ডা বাড়ল, হাওয়ার গতি গেল পাল্টে।

একী বিপত্তি? কিন্তু ফিলিয়াস ফগও কম একরোখা নন। জেদী বাতাসকে তোয়াক্কা করলেন না। পাল তুলে দিয়ে বাষ্পের শক্তি বাড়িয়ে দিলেন। তা সত্ত্বেও সমুদ্রের দামালপনার জন্যে কমে এল জাহাজের গতিবেগ। গলুইয়ের ওপর টানা লম্বা ঢেউ মুখোমুখি আছড়ে পড়ছে, জাহাজও একগুঁয়ের মত ঢেউ ঠেলে এগোচ্ছে। সুতরাং স্পীড তো কমবেই। হাওয়ার বেগ একটু একটু করে বেড়েই চলল। শেষে দেখা গেল প্রবল ঝড়। ঢেউয়ের ওপর আর বুঝি 'হেনরিয়েটা'কে সিধে রাখা গেল না।

পুরো দুটি দিন দারুণ মুষড়ে রইল পাসপার্তু আকাশের অবস্থা দেখে। ফিলিয়াস ফগ অবশ্য তুখোড় নাবিক! উনি গতিবেগ কমালেন না, গতিমুখও পালটালেন না। জাহাজ যেমন চলছিল, তেমনিই চলতে লাগল। শুধু বাষ্পের শক্তি কমানো দূরে থাকুক, দিলেন আরো বাড়িয়ে। যে ঢেউয়ের ওপরে ওঠার সাধ্য নেই 'হেনরিয়েটা'র, তার বুক চিরে বেরিয়ে গেলেন তিনি গোটা জাহাজ নিয়ে। জলে ডেক ভেসে গেল বটে, কিন্তু পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের মধ্যে থেকে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে এলেন নিরাপদে। কখনো সখনো ঘুরন্ত প্রপেলার জলের ধাক্কায় শূন্যে উঠে ঘুরে চলল,—তবুও নাকের সিধে এগিয়ে চলল 'হেনরিয়েটা'।

যতটা ভয় করা গিয়েছিল, ঝড় সে-রকম প্রবল আকার নিল না অবশ্য। ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে না বইলেও গোঁয়ারের মত বইতে লাগল দক্ষিণ পূর্ব দিকে। ফলে, অকেজো হয়ে রইল পালগুলো!

ষোলই ডিসেম্বরে পঁচাত্তর দিন শুরু হল ফিলিয়াস ফগের দিনপঞ্জীতে। অর্থাৎ, লণ্ডন থেকে রওনা হওয়ার পর সেদিন পঁচাত্তর দিনে পা দিলেন ফগ। 'হেনরিয়েটা' ঘড়ি ধরে চলেছে, খুব একটা দেরী হয় নি! অর্ধেক পথ চলে এসেছে এবং বিপজ্জনক অঞ্চলগুলোই নির্বিঘ্নে আসা গিয়েছে। গ্রীষ্মকাল হলে যাত্রা পুরোপুরি নিষ্কণ্টক হত। কিন্তু শীতকাল তো, ঝড়ঝঞ্ঝা লেগেই থাকবে।

পাসপার্তু গুম হয়ে বসে ভাবছে, হাওয়া প্রতিকূলে গেলেও বাষ্পের জোরে ঠিক এগিয়ে যাওয়া যাবে'খন।

সেইদিনই একটা কাণ্ড ঘটল। ডেকে উঠে এল ইঞ্জিনীয়ার। সোজা মিস্টার ফগের কাছে গিয়ে হাত মুখ নেড়ে কি যেন বলল। কথাটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা ইঞ্জিনীয়ারের চোখ মুখের ভাব দেখে ধরল পাসপার্তু। আড়ি পেতে দুজনের কথাবার্তা শোনার ইচ্ছে হল খুবই। কান খাড়া করে শুনল শেষের কথাগুলো।

ফগ বললেন—"তোমার ভুল হয়নি তো?"

ইঞ্জিনীয়ার বললে—"আজ্ঞে না। আপনি তো জানেন শুরু থেকেই পুরোদমে চুল্লী জ্বালিয়ে রাখতে হয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে বোর্দো পর্যন্ত পুরো বাষ্প ব্যবহার না করে যাওয়ার মত কয়লা মজুদ ছিল জাহাজে। কিন্তু পুরোদমে বাষ্প খরচ করে লিভারপুল যাওয়ার মত কয়লা তো নেই।"

"দেখি কি করা যায়" বললেন ফগ।

শুনে তো চুল খাড়া হয়ে গেল পাসপার্তুর। সর্বনাশ! কয়লা ফুরিয়ে আসছে। কথাটা ফিক্সের কাছে না বলা পর্যন্ত যেন পেট ফুলতে লাগল তার।

ফিক্স সব শুনে বললেন—"তোমার কি এখনো বিশ্বাস উনি লিভারপুল চলেছেন?"

"আলবৎ।"

"গাধা কোথাকার!" বলেই পালিয়ে গেলেন ফিক্স।

খেতাবটা নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ল পাসপার্তু। কিছুতেই মাথায় এল না হঠাৎ এ-হেন উপাধিতে তাকে ভূষিত করা হল কেন। অনেক ভেবে চিন্তে দেখল, ফিক্স বেচারার আদ্দিনে আক্কেল হয়েছে বোধহয়। সারা পৃথিবীটাকে চক্কর দিয়ে আসার পর বুঝতে পেরেছেন কি আহাম্মুকিই তিনি করেছেন সাধু সজ্জন ফিলিয়াস ফগকে চোর বলে সন্দেহ করে। তাই এখন নিরতিশয় অনুতপ্ত।

কিন্তু ফিলিয়াস ফগ এমতাবস্থায় কি ব্যবস্থা করতে চলেছেন, সেইটাই হল প্রশ্ন। তবে একটা উপায় যে মাথায় এসেছে, তা বোঝা গেল সন্ধ্যে নাগাদ। ইঞ্জিনীয়ারকে ডেকে হুকুম দিলেন—"কয়লা চাপাও যত বেশী করে—আগুন যেন একটুও না কমে। ফুরোক কয়লা, তখন দেখা যাবে।"

কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখা গেল 'হেনরিয়েটা'র চিমনী দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। পুরো বাষ্প ব্যবহার করে বিপুল বেগে ছুটে চলেছে জাহাজ। কিন্তু আঠারো তারিখে ইঞ্জিনীয়ার জানাল—কয়লা ফুরিয়ে এসেছে—সারাদিন চলে যাবে অবশ্য। তারপর জাহাজকে পালে চলতে হবে।

দুপুর নাগাদ পাসপার্তুর ওপর হুকুম হল ক্যাপ্টেন স্পীডিকে ফগের সামনে নিয়ে আসার জন্যে। শুনেই তো আঁৎকে উঠল সে। বাঘের শেকল খুলতে যাওয়া আর স্পীডিকে ঘর খুলে আনতে যাওয়া যে একই রকম বিপজ্জনক ব্যাপার! স্পীডি এখন পাগলা কুকুরের পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ-অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিলে কেলেংকারীর শেষ থাকবে না।

একটু পরেই ফিলিয়াস ফগের বাপান্ত করতে করতে যেন একটা সজীব বোমা উঠে এল ডেকে। বোমাটি হেনরিয়েটার ক্যাপ্টেন স্পীডি। বিস্ফোরণের আর বুঝি দেরী নেই!

ক্রোধে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে প্রথমেই প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন—"জাহাজ এখন কোথায়?" ভাগ্যিস ভদ্রলোকের সন্ন্যাস রোগ ছিল না; থাকলে আর দেখতে হত না। অবরুদ্ধ ক্রোধে মাথার শির ছিঁড়ে অক্কা পেত নির্ঘাৎ।

"জাহাজ এখন কোথায়?" লাল টকটকে মুখে ফের প্রশ্নটা নিক্ষেপ করল ক্যাপ্টেন।

"লিভারপুল থেকে সাতশ সত্তর মাইল দূরে," অবিচলিত প্রশান্তি সহকারে জবাব দিলেন ফগ।

"বোম্বেটে!"

"আপনাকে ডেকে এনেছি—"

"জাঁহাবাজ বদমাস!"

"—আপনার জাহাজটা কেনবার জন্যে।"

"না, না, শয়তান কোথাকার!"

"কিন্তু আমাকে যে জাহাজটা পোড়াতে হবে।"

"হেনরিয়েটা'কে পোড়াবেন!"

"ওপর দিকটা। কয়লা ফুরিয়ে গেছে।"

"আমার জাহাজ পোড়াবেন?" শব্দগুলো ভালভাবে উচ্চারণ করতেও পারল না ক্যাপ্টেন। "পঞ্চাশ হাজার ডলারের জাহাজ পোড়াবেন!"

"এই নিন ষাট হাজার ডলার," এক তাড়া নোট ক্যাপ্টেনের হাতে গুঁজে দিলেন ফগ।

টলমল করে উঠল অ্যানড্রু স্পীডি। দারুণ ধাক্কায় যেন মনের ভিত পর্যন্ত নড়ে গেল ক্যাপ্টেনের। ষাট হাজার ডলার চোখের সামনে দেখার পর কোনো আমেরিকানের পক্ষেই আর স্থির থাকা সম্ভব নয়। মুহূর্তের মধ্যে রাগ জল হয়ে গেল স্পীডির। ভুলে গেল ঘরে বন্ধ থাকার অপমান। এবং ফগের প্রতি সুগভীর আক্রোশ। 'হেনরিয়েটা' বিশ বছরের বুড়ো জাহাজ।

এ-জাহাজকে ষাট হাজারে বেচে দেওয়া মানে মোটা দাঁও পেটা। কাজেই সজীব বোমা আর বিস্ফোরিত হল না।

মৃদু কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন—"লোহার খোলটা আমার থাকবে তো?"

"খোল আর ইঞ্জিন—দুটোই। রাজী?"

"রাজী।"

খসখস করে নোটগুলো গুণে নিয়ে পকেটে চালান করল অ্যানড্রু স্পীডি।

কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল পাসপার্তুর লাল মুখ। আর ফিক্স? মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, হার্টফেলের বুঝি আর দেরী নেই। বিশ হাজার পাউণ্ডের টাকা মত চক্ষের পলকে খরচ করে ফেললেন ফিলিয়াস ফগ। অথচ খোল আর ইঞ্জিন দুটোই ক্যাপ্টেনকে দিয়ে দিলেন। জাহাজের যা কিছু দাম তো খোল আর ইঞ্জিনের জন্যেই! বলতে গেলে কাঠের অংশ বাদে পুরো জাহাজটাই রইল ক্যাপ্টেনের। ফাঁক তালে পকেটে চলে এল এক কাঁড়ি টাকা!

না., ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড হাত সাফাই যে করে, টাকা তার কাছে হাতের ময়লা ছাড়া কি আর হতে পারে?

মহানন্দে পকেটে নোট ঠাসছে স্পীডি, ফগ বললেন "আমার জাহাজ কেনা দেখে অবাক হবেন না। একুশে ডিসেম্বর রাত পৌনে নটার মধ্যে লণ্ডন না পৌঁছোলে আমি বিশ হাজার পাউণ্ডের বাজী হারব। নিউইয়র্কে জাহাজ ফস্কে যেতে আপনাকে অনুরোধ করলাম। আপনিও বেঁকে বসলেন—"

"বেশ করেছি!" সোল্লাসে বলল স্পীডি। "করেছিলাম বলেই তো কমসে কম চল্লিশ হাজার ডলার লাভ করলাম! আপনার ভেতর একটা জিনিস আছে, ক্যাপ্টেন—

"ফগ।"

"ক্যাপ্টেন ফগ, আপনার মধ্যে খানিকটা ইয়াঙ্কি-ইয়াঙ্কি ভাব আছে।"

ফগকে যেন মস্ত খেতাব দেওয়া হল, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে আনন্দে ডগমগ চিত্তে পা বাড়ালো স্পীডি, পেছন থেকে শুধোলেন ফগ—"জাহাজ এখন আমার?"

"একশবার একদম তলার কাঠ থেকে মাস্তুলের ডগা পর্যন্ত যেখানে যত কাঠ আছে, সব আপনার।"

"বেশ বেশ। বসবার চেয়ার বেঞ্চি, শোবার বাঙ্ক, ফ্রেম ভেঙে নিয়ে পুড়িয়ে ফ্যালো।"

বাষ্প চাপ সমান রাখার জন্যে শুকনো কাঠের আগুন একান্তই দরকার।

সুতরাং সেইদিনই অগ্নি দেবতার জঠরে আহুতি দেওয়া হল জাহাজের একদম পেছন দিক, কেবিন, বাঙ্ক এবং বাড়তি ডেক। পরের দিন উনিশে ডিসেম্বর। সেদিন আগুনের খোরাক হল মাস্তুল, ভেলা এবং অন্যান্য গোল কাঠ। আগুন অব্যাহত রাখার নেশায় যেন পাগল হয়ে গেল খালাসীরা। পাসপার্তু'ও করাত আর কুড়ুল সমানে চালিয়ে গেল। ধ্বংস করার বিকট উল্লাস যেন তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়ল তার শিরা উপশিরায়।

বিশ তারিখে অদৃশ্য হল রেলিং, ডেকের প্রায় সবটুকুই এবং জাহাজের দুপাশ। চ্যাটালো একটা খোল তীব্রবেগে ছুটে চলল জল তোলপাড় করে। সন্ধ্যে নাগাদ কুইন্সটাউন দেখা গেল জাহাজ থেকে। আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা হাতে রয়েছে ফগের। এর মধ্যেই লণ্ডন পৌঁছোতে হবে। বাষ্প সমান তেজী থাকলে লিভারপুল পৌঁছোনো যাবে নির্দিষ্ট সময়ে।

কিন্তু বাষ্পের তেজ যেন কমে আসছে না? কাঠ তো আর নেই!

ক্যাপ্টেন স্পীডিও যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল ফগের কাণ্ডকারখানা দেখে। গুটি গুটি কাছে এসে বলল—"আপনার জন্যে সত্যিই বুক ফেটে যাচ্ছে আমার। ভাগ্য আপনার প্রতি বিরূপ। এতক্ষণে মাত্র কুইন্সটাউন এলেন।"

"ঐ যে আলোর মালা, ওই তাহলে কুইন্সটাউন?"

"হ্যাঁ।"

"বন্দরে যাওয়া যাবে?"

"ঘণ্টা তিনেক সবুর করতে হবে। জোয়ার আসুক।"

"তাহলে অপেক্ষা করা যাক জোয়ারের জন্যে," অবিচলিত কণ্ঠে বললেন ফিলিয়াস ফগ। দুর্ভাগ্যকে পুরুষকারের জোরে আবার জয় করতে মনস্থ করেছেন ফগ।

কুইন্সটাউন আয়ার্ল্যাণ্ডের বন্দর। আটলান্টিকের ওপর থেকে জাহাজের ডাক নামত সেখানে। এই ডাক তৎক্ষণাৎ ডাবলিনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে থাকত অত্যন্ত দ্রুতগামী একটা এক্সপ্রেস ট্রেন। ডাবলিন থেকে লিভারপুলে ডাক পৌঁছোতো ঝড়ের মত বেগবান জলপোতে।

হিসেব করে দেখলেন ফগ, ডাক যে পথে যাচ্ছে, সেই পথ ধরলে উনি লিভারপুল পৌঁছোবেন নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘণ্টা আগে। 'হেনরিয়েটা'য় গেলে লিভারপুল পৌঁছোচ্ছেন পরদিন সন্ধ্যায়। কিন্তু এই পথে গেলে পৌঁছোচ্ছেন দুপুরে। সেখান থেকে লণ্ডন পৌঁছোবেন রাত পৌনে নটার আগেই।

রাত একটার সময়ে কুইন্সটাউন বন্দরে ঢুকল 'হেনরিয়েটা'। জাহাজের

খোলের ওপর দাঁড়িয়ে স্পীডির দুহাত জড়িয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চটপট তীরে নামলেন ফগ। ফিক্সের বড় ইচ্ছে হল তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করেন ফগকে। কিন্তু অতিকষ্টে সামলে নিলেন নিজেকে। কারণটা দুর্বোধ্য। তবে কি ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয়েছেন ফিক্স? অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হৃদয়ে সুবুদ্ধি জেগেছে?

যাই হোক, ট্রেনে উঠে বসতে না বসতেই ঠিক দেড়টার সময়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। ডাবলিন পৌঁছোলো ভোরবেলা। ট্রেন থেকে সোজা ষ্টীমারে উঠলেন ফগ। এ-ষ্টীমারের কাছে সময়ের দাম অত্যন্ত বেশী। তাই ঢেউয়ের ওপর উঠে সময় নষ্ট করতে চায় না সরাসরি ঢেউ কেটে ছোটে!

একুশে ডিসেম্বর লিভারপুল জেটিতে পা দিলেন ফগ। তখন বারোটা বাজতে বিশ মিনিট বাকী। লণ্ডন আর মাত্র ছঘণ্টার পথ!

ঠিক সেই সময়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন ফিক্স। ফগের কাঁধে এক হাত রেখে আরেক হাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে শুধোলেন—"সত্যিই কি আপনি ফিলিয়াস ফগ?"

"হ্যাঁ।"

"রাণীর নামে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি!"

৩২॥ অবশেষে লণ্ডন পৌঁছোলেন ফিলিয়াস ফগ

কারারুদ্ধ হলেন ফিলিয়াস ফগ। শুল্ক ভবনে রইলেন সেদিনের মত। লণ্ডনে চালান দেওয়া হবে পরের দিন।

মনিব গ্রেপ্তার হতে চলেছেন দেখে বাঘের মত ফিক্সের ওপর লাফিয়ে পড়তে গিয়েছিল পাসপার্তু। কয়েকজন চৌকিদার ধরে না ফেললে ফিক্স আর আস্ত থাকতেন না সেদিন।

রাণী আউদা বজ্রাহত হলেন যেন। পাসপার্তু বুঝিয়ে বলল কিভাবে চুরীর অপবাদে তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ছায়ার মত তাঁর পেছনে লেগে ছিলেন গোয়েন্দা ফিক্স। দুর্দান্ত সাহসী এবং ষোল আনা খাঁটি ফিলিয়াস ফগের নামে এ হেন কদর্য অভিযোগের বৃত্তান্ত শুনে যেন দপ করে জ্বলে উঠলেন আউদা। কিন্তু কিছুই করার নেই দেখে কেঁদে ফেললেন ঝরঝর করে।

ফিক্স শুধু তাঁর কর্তব্য করলেন। ফগ নিরপরাধ কিনা, সে বিচারের ভার তাঁর নয়।

পাসপার্তুর টনক নড়ল এবার। হাড়ে-হাড়ে বুঝল, মনিবের এই চরম সর্বনাশের জন্যে দায়ী সে নিজে। ফিক্সের অভিসন্ধি জেনেও মনিবকে সে

সচেতন করেনি। সময় থাকতে ফগ যদি জানতেন তাঁকে চোর সন্দেহে অনুসরণ করা হচ্ছে, তাহলে ফিক্সের সন্দেহ দূর করতে পারতেন নির্দোষিতার প্রমাণ দিয়ে; নিদেনপক্ষে ফগের খরচে ফিক্সের দেশভ্রমণটা তো বন্ধ হত; জাহাজে, স্লেজগাড়ীতে ঠাঁই না পেলেই ফিক্স পড়ে থাকতেন কোন চুলোয়, ফগ নির্বিঘ্নে পৌঁছে যেতেন লণ্ডনে। কিন্তু সব জেনেও মুখে কুলপ এঁটে থেকেছে পাসপার্তু এবং জেনেশুনে খাল কেটে কুমীর নিয়ে দেশে ফিরেছে। অনুতাপে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল পাসপার্তু। কাঁদতে কাঁদতে নোনা জলের ধারায় অন্ধ হবার উপক্রম হল। প্রবল ইচ্ছে কপাল ঠুকে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলার।

আউদা পাসপার্তুকে নিয়ে শুল্কভবনের গাড়ী বারান্দায় বসেছিলেন। কনকনে ঠাণ্ডায় কষ্ট হলেও নড়বার ইচ্ছে নেই কারু। মিস্টার ফগকে আবার না দেখা পর্যন্ত অশান্ত অন্তর দুজনেরই।

তীরে এসে তরী ডুবল যেন। এত কাঠখড় পুড়িয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন ফগ, আর মাত্র ছ'ঘণ্টার পথ পাড়ি দিলে রিফর্ম ক্লাবে পৌঁছে যেতেন পৌনে নটার সময়ে।

শুল্কভবনে সেই সময়ে ঢুকলে দেখা যেত কাঠের বেঞ্চিতে নিস্পন্দদেহে বসে আছেন ফিলিয়াস ফগ। চোখ মুখ অতিশয় প্রশান্ত। রাগ দ্বেষ ঘৃণার বাষ্পটুকুও নেই। তার মানে এই নয় যে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সর্বশেষ আঘাতেও অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবাবেগকে বাইরে বেরোতে দেননি। ভেতরে ক্রোধের আগুন জ্বলছিল কি? চরমমুহূর্তে বাধা আসায় অদম্য শক্তিতে ফেটে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন কি? বলা মুস্কিল। প্রশান্ত মুখে কিসের প্রতীক্ষা করছেন ফগ? আশার আলো কি এখনো নিভে যায় নি মনের মধ্যে? কারাকক্ষের দরজা রুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কি এখনো তিনি অভীষ্ট সিদ্ধির স্বপ্ন দেখছেন?

মুখ দেখে কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে, ঘড়ির আগুয়ান কাঁটার দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে আছেন তিনি। মুখে কোনো কথা নেই। তবে হাবভাব আশ্চর্য সংহত এবং কঠোর। পরিস্থিতি খুবই সিরিয়াস: ফগ যদি সাধু হন, তিনি পথে বসলেন। ফগ যদি অসাধু হন, তাঁর খেলা ফুরিয়েছে।

তবে কি উনি পালানোর কথা ভাবছিলেন? হতে পারে। কেননা, একবার দেখা গেল তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পায়ে পায়ে চক্কর দিয়ে এলেন সারা ঘরে। দেখলেন, জানলায় মোটামোটা গরাদ। দরজাতেও ভারী তালা। ফের এসে বসলেন বেঞ্চিতে। রোজনামচা মেলে ধরলেন। যেখানে

লেখা ছিল 'একুশে ডিসেম্বর, শনিবার, লিভারপুল', তার পাশে লিখলেন "আজ আশী দিন হল, এখন সকাল এগারোটা চল্লিশ।"

শুল্কভবনের ঘড়িতে একটা বাজল। ফগ দেখলেন তাঁর ঘড়ি দুঘণ্টা এগিয়ে চলছে।

দুঘণ্টা! হায়রে! এই মুহূর্তে যদি এক্সপ্রেস ট্রেনে ওঠা যেত, লণ্ডনের রিফর্ম ক্লাবে হাজির হওয়া যেত পৌনে নটায় মধ্যেই। ঈষৎ কুঞ্চিত হল তাঁর ভাবলেশহীন ললাট।

দুটো তেত্রিশ মিনিটে অদ্ভুত কতকগুলো আওয়াজ শোনা গেল বাইরে। দুমদাম ঝনঝন্ শব্দে তাড়াহুড়ো করে কে যেন তালা খুলছে। শোনা যাচ্ছে পাসপার্তুর কণ্ঠস্বর—সেই সঙ্গে ফিক্সের। মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হল ফিলিয়াস ফগের শীতল চক্ষু।

দুহাট হল কপাট জোড়া। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পাসপার্তু, আউদা এবং ফিক্স। গোয়েন্দা ফিক্স হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তাঁর সামনে।

কথা বলতে পারছিলেন না ফিক্স। তাঁর দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, চুল উস্কখুস্ক। উত্তেজনায় যেন দম আটকে আসছে। কোনোরকমে বললেন তোৎলাতে তোৎলাতে—"স্যার—আমাকে মাপ করুন স্যার অদ্ভুত মিল ছিল আপনার সঙ্গে আসল ব্যাঙ্ক চোরের—তিন দিন আগে সে ধরা পড়েছে—আপনি মুক্ত।'

ফিলিয়াস ফগ খালাস পেলেন। এক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ফিক্সের সামনে নির্নিমেষে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর জীবনে সেই একবারই দ্রুত প্রত্যঙ্গ চালনা করলেন। বিদ্যুৎগতিতে হাত উঠল এবং নামল। যেন নিখুঁত যান্ত্রিক মুষ্ট্যাঘাতে মেঝের ওপর ছিটকে পড়লেন ফিক্স।

"সাবাস!" সে কী উল্লাস পাসপার্তুর। "একেই বলে ইংরেজের ঘুসি!"

নিমেষ মধ্যে চিৎপটাং হয়ে শুধু চেয়ে রইলেন ফিক্স—কথা বলতে পারলেন না। এ তাঁর কর্মফল—খুব অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পাওয়া গেছে বলতে হবে।

আউদা এবং পাসপার্তুকে নিয়ে ঝটপট শুল্কভবনের বাইরে এলেন ফগ। ভাড়াটে গাড়ীতে চেপে পৌঁছোলেন স্টেশনে।

লণ্ডন যাওয়ার কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন কি আছে?—শুধোলেন ফগ। তখন দুটো চল্লিশ। এক্সপ্রেস ট্রেন ছেড়ে গেছে—পঁয়ত্রিশ মিনিট আগে।

স্পেশ্যাল ট্রেন হাজির করার হুকুম দিলেন ফিলিয়াস ফগ।

অনেকগুলো দ্রুতগামী ট্রেন তৈরী থাকা সত্ত্বেও রেল কর্তৃপক্ষের গড়িমসিতে ট্রেন ছাড়ল তিনটের সময়ে।

ড্রাইভারকে মোটা বখশিস দিলেন ফগ। উল্কাবেগে ট্রেন ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত পাকা করে আউদা আর পাসপার্তুকে নিয়ে বসলেন কামরার মধ্যে।

সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডন পৌঁছোতেই হবে। কিন্তু যাত্রাপথে কিছু-কিছু দেরী আটকানো গেল না কোনমতেই। লণ্ডন পৌঁছে ঘড়ি দেখলেন ফগ। নটা বাজতে তখন দশ মিনিট।

৮০ দিনে পৃথিবী পর্যটন করেও দেরী হল মাত্র পাঁচ মিনিট। বাজী হেরে গেলেন ফিলিয়াস ফগ।

৩৩॥ পাসপার্তুকে দুবার হুকুম করার দরকার হল না ফিলিয়াস ফগের

স্যাভিলরো'র বাসিন্দারা কিন্তু জানতেও পারল না বাড়ী ফিরেছেন ফিলিয়াস ফগ। জানলেও চোখ কপালে তুলত। কেননা, যেমন তেমনি বন্ধ ছিল দরজা জানলা। বাড়ীতে কেউ আছে বলে মনেও হচ্ছিল না।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে পাসপার্তুকে খাবারদাবার কেনবার হুকুম দিয়ে ধীরচিত্তে ফিরে এলেন স্যাভিলরো'র বাড়ীতে।

কপাল ভাঙল ফিলিয়াস ফগের, বাস্তার ফকির হলেন সামান্য একটা গোয়েন্দার ফিচলেমির জন্যে। অথচ চিত্তের স্থিরতা হারালেন না তিনি। কপর্দকশূন্য হয়েও সমস্ত ব্যাপারটাকে মেনে নিলেন সহজভাবে—স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্তি দিয়ে বরণ করলেন দুর্ভাগ্যকে। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করলেন চুলচেরা হিসেব মত। শত সহস্র বাধাকে অতিক্রম করলেন দুর্জয় সাহস নিয়ে। বহু বিপদকে পাশ কাটিয়ে এলেন ক্ষুরধার বুদ্ধির ভেলকি দেখিয়ে। কিন্তু বাড়ীর কাছে এসে হেরে গেলেন পূর্বপ্রস্তুতি না থাকার দরুন। পথের বিঘ্নর জন্যে তিনি তৈরী ছিলেন—তৈরী ছিলেন না চোর অপবাদে কারারুদ্ধ হওয়ার জন্যে।

ব্যাগ ভর্তি বিপুল টাকার সামান্যই আর অবশিষ্ট ছিল। কয়েকটা পাউণ্ড তখনো পড়েছিল। গদীতে জমা রয়েছে ওঁর বাদবাকী সম্পদ—বিশ হাজার পাউণ্ড। কিন্তু সে টাকা এখন রিফর্মক্লাবের সদস্যদের। রাহাখরচ এত বেশী হয়েছে যে বাজী জিতলেও লাভবান হতে পারতেন না ফগ। অবশ্য লাভ করার জন্যে উনি বাজীও ধরেন নি। তাঁর মত মানুষরা মান রাখতে বাজী ধরেন, ধন আনতে নয়। কিন্তু এই একটি বাজীতেই তিনি পুরোপুরি সর্বস্বান্ত হলেন।

মিস্টার ফগ অবশ্য মনস্থির করে ফেলেছিলেন এরপর কি করবেন। নিঃস্ব অবস্থায় করণীয় কি, তা তিনি জানতেন।

স্যাভিলরো'র একটা ঘর আউদাকে ছেড়ে দেওয়া হল। উদ্ধার কর্তার চরম দুর্ভাগ্যে তিনি তখন অভিভূত। মিস্টার ফগের মুখের দু'চারটে কথা শুনেই বুদ্ধিমতী আউদা বুঝেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে' তাঁর।

পাসপার্তু জানত ইংরেজরা বড় জেদী জাতি। চরম দুর্দশায় উপায়ান্তর-বিহীন হলে, নিদারুণ নৈরাশ্যে কোণঠাসা হলে, লজ্জায় অপমানে কাউকে মুখ দেখাতে চায় না—আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে। সুতরাং সে আড়ালে থেকে প্রতিটি মুহূর্ত চোখে চোখে রেখেছিল প্রিয় মনিবকে।

বাড়ী ফিরে আগে ঘরে গেল সে, আশী দিন ধরে এক নাগাড়ে জ্বলা গ্যাসবাতি নিভোলো। লেটার বক্স হাতড়ে পেল গ্যাস কোম্পানীর বিল। বলা বাহুল্য, বিলের টাকা মেটানো পাসপার্তু'র সাধ্যাতীত।

রাত হল। শুয়ে পড়লেন মিস্টার ফগ, কিন্তু ঘুমোতে পারলেন কী? নিমেষের জন্যেও চোখ মুদতে পারলেন না আউদা। আর প্রভুভক্ত কুকুরের মত সারারাত চৌকাঠের কাছে কান খাড়া করে বসে রইল পাসপার্তু।

সকাল হল। পাসপার্তুকে ডাক দিলেন ফগ। আউদার জন্যে প্রাতরাশ আর নিজের জন্যে এক কাপ চা-সহ একটি মাত্র চপ আনতে হুকুম দিলেন। রাণী আউদাকে খবর পাঠালেন, একসঙ্গে ব্রেকফাষ্ট এবং ডিনার খেতে পারছেন না বলে যেন মিস্টার ফগকে ক্ষমা করেন তিনি। সারাদিন উনি ব্যস্ত থাকবেন কয়েকটা সমস্যার সমাধান নিয়ে। সন্ধ্যে নাগাদ রাণী আউদাকে কয়েক মিনিট সময় দিতে হবে—মিস্টার ফগ তখন তাঁকে কয়েকটা কথা বলবেন।

নতমস্তকে হুকুম তামিল করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না পাসপার্তু'র। মনিবের মুখের দিকে চেয়ে তার অন্তঃকরণ অনুতাপে হু-হু করে জ্বলে উঠল আবার। তার জন্যে. শুধু তার অবিমৃষ্যকারিতার জন্যেই দেবতুল্য মনিবের আজ এই দুরবস্থা। সময় থাকতেই যদি ওঁকে সে হুঁশিয়ার করে দিত, ফিক্সের অভিসন্ধি জানাজানি হয়ে যেত, তাহলে লিভারপুলে গোয়েন্দা ফিক্সকে নিয়ে আসতেন না উনি—

পাসপার্তু আর পারল না নিজেকে ধরে রাখতে।

"হুজুর, আমাকে বকুন! আমাকে উচিত শাস্তি দিন! আমার বোকামির জন্যেই—"

"দোষ কারো নয়," প্রশান্ত স্বরে বললেন ফগ—"যাও!"

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল পাসপার্তু—আউদাকে গিয়ে জানাল মনিবের অভিপ্রায়।

সেই সঙ্গে বলল—আমার কিছু করার নেই। আমার কোনো কথাই উনি শুনবেন না। আপনি যদি পারেন—"

"কিন্তু আমিই বা কি করব?" বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন আউদা। "মিস্টার ফগ কারু কথা শোনেন না, কারো কথায় তিনি চলেন না। ওঁর প্রতি আমার সীমা-হীন কৃতজ্ঞতা কি আজও উনি আঁচ করতে পেরেছেন? আজও কি আমার মনের চেহারা দেখতে চেষ্টা করেছেন? এক দণ্ডও ওঁকে চোখের আড়াল করা চলবে না! উনি বললেন আজ সন্ধ্যায় কথা বলবেন আমার সঙ্গে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব সম্ভব ইংলণ্ডে আপনি যাতে নিশ্চিন্তভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন, সেই ব্যবস্থাই করবেন।"

"দেখা যাক" অকস্মাৎ বিষাদময় চিন্তায় বিমর্ষ হলেন আউদা।

সাড়ে এগারোটা বাজল। স্যাভিল রো'র বাড়ীতে ডেরা নেওয়ার পর থেকে এতদিন যে কার্যসূচীর অন্যথা ঘটেনি, সেইদিন তাই হল। ফিলিয়াস ফগ যান্ত্রিক নিয়মে মেপে মেপে পা ফেলে বিফর্ম ক্লাবে রওনা হলেন না।

সে দিন ছিল রবিবার। সারা বাড়ীটা নিশ্চুপ হয়ে রইল। যেন বাড়ীতে মানুষ বলে কেউ নেই।

বিফর্ম ক্লাবে যাওয়ার আর দরকারই বা কী? গতকাল গেছে একুশে ডিসেম্বর শনিবার। রাত পৌনে নটার সময়ে ক্লাবে উনি হাজির হতে পারেন নি বন্ধুদের সামনে। অতএব বাজী হেরেছেন। বারিং-য়ের গদীতে জমা বিশ হাজার পাউণ্ডের চেক বন্ধুদের কাছে গচ্ছিত রেখেই উনি পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। সুতরাং চেক পাঠিয়ে গদী থেকে পুরো টাকাটা এতক্ষণে নিশ্চয় তুলে নিয়েছেন ক্লাবের বন্ধুরা।

কাজেই বাড়ী থেকে বেরোনোর দরকার ফুরিয়েছে ফিলিয়াস ফগের। সারাদিন বসে রইলেন নিজের ঘরে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিজের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত রইলেন। কাজ মানে ভবিষ্যতের ভাবনা, দিন গুজরানের পন্থা নিরূপণ এবং সেই মত হাতের সামান্য টাকা নিয়ে পরিকল্পনা স্থির করা।

পাসপার্তু সারাটা দিন ওপর নীচ করেই গেল। দরজায় কান পেতে রইল। আতংক পেয়ে বসেছে তাকে এই বুঝি সাংঘাতিক কিছু ঘটে যায়! ফিক্সের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়লেও রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠছিল না আগের মত। ফিক্স ভুল বুঝেছিলেন বলেই তো পিছু নিয়ে হয়রান করেছেন ফগকে। কিন্তু পাসপার্তু যা করেছে তার চারা নেই—

একই কথা বার বার ঘুরে ফিরে আসছে মনের মধ্যে, নিরন্তর নিজেই নিজেকে 'নিপাত যাক নিপাত যাক' শাপ দিয়ে চলেছে বেচারী পাসপার্তু।

একলা থাকতে না পেরে শেষকালে আউদার ঘরে গিয়ে ধাক্কা দিল সে। রাণী আউদা নিজেই তখন বিষাদযুক্ত চিন্তায় আচ্ছন্ন। এক কোনে বোবার মত তাঁর পানে চেয়ে রইল অনুতাপ জর্জরিত পাসপার্তু।

সাড়ে সাতটার সময়ে ফগ জানতে চাইলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় হবে কিনা রাণী আউদার। তার ক্ষণকাল পরেই আউদার ঘরে হাজির হলেন উনি।

আগুনের চুল্লীর সামনে মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসলেন দুজনে। ফিলিয়াস ফগের মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। আবেগের ছিটে ফোঁটাও নেই। আশীদিন পরে সেই একই ফিলিয়াস ফগ ফিরে এসেছেন তার নিরালাভবনে। একই রকম প্রশান্ত, প্রসন্ন, অবিচল।

মিনিট কয়েক কোনো কথা বললেন না ফগ। তারপর আউদার পানে চোখ ফিরিয়ে বললেন- "ম্যাডাম, ইংলণ্ডে আপনাকে এনে ফেলার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন কি ?"

"মিস্টার ফগ, আমাকে বলছেন ?" উত্তাল হল আউদার বুক।

"আমাকে শেষ করতে দিন। স্বদেশ আপনার কাছে নিরাপদ ছিল না বলেই আপনাকে সরিয়ে আনা ঠিক করেছিলাম। তখন কিন্তু আমি বড়লোক ছিলাম। ভেবেছিলাম আমার বিপুল সম্পদের একাংশ আপনাকে দিয়ে দেব যাতে আপনি স্বাধীন ভাবে সুখে থাকতে পাবেন। কিন্তু এখন আমি নিঃস্ব।"

'জানি। আমাকেও আপনি ক্ষমা করবেন। আপনার ঘাড়ে চেপে না থাকলে, আপনাকে দেরী করিয়ে না দিলে আপনি আজ পথে বসতেন না।"

"ম্যাডাম, ভারতবর্ষ আপনার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। আপনাকে বিদেশে অনেক দূরে সরিয়ে না আনলে আপনার শত্রুরা ফের আপনাকে ধরে ফেলত।"

"মিস্টার ফগ, নিষ্ঠুর মৃত্যুর কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করেও আপনি সুখী নন তাহলে ? বিদেশে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দায়ীত্বও নিজের কাঁধে নিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, নিয়েছি। কিন্তু পরিস্থিতি আমার অনুকূলে নয়। তবুও টাকা-কড়ি যা কিছু পড়ে আছে, আপনার জন্যে খরচ করতে চাই।"

"আপনার কি হবে ?"

"আমার কিছুই দরকার নেই।"

"ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবেছেন ?"

"যে রকম চিরকাল ভেবেছি, এখনো সেইভাবে ভাবছি।"

"আপনার মত মানুষ টানাটানির মধ্যে দিন কাটাবেন, তা হতে পারে না। আপনার বন্ধুবান্ধব—"

"আমার কোনো বন্ধু নেই।"

"আত্মীয়—"

"আত্মীয়রাও আর নেই।"

"আপনার জন্যে মায়া হচ্ছে মিস্টার ফগ। নির্জনতা একটা অভিশাপ। কারও কাছে মন হাল্কা করতে না পারার মত কষ্ট আর নেই। শুনেছি, ভাগ্য বিপর্যয় যত শোচনীয়ই হোক না কেন, সহানুভূতি দিয়ে দুটি আত্মা তা সমান ভাগে বইতে পারে অক্লেশে।"

"আমিও শুনেছি," বললেন ফগ।

উঠে দাঁড়ালেন আউদা। ফগের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন—"মিস্টার ফগ, একজনের মধ্যেই বন্ধু আর স্বজন পেতে মন চায় না আপনার? আমাকে স্ত্রীরূপে মেনে নিতে পারেন না আপনি?"

এবার উঠে দাঁড়ানোর পালা ফিলিয়াস ফগের। অসাধারণ একটা দ্যুতি দেখা গেল তাঁর চোখে, কেঁপে উঠল ঠোঁট। আউদা চোখের পলক না ফেলে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখপানে। ফগ দেখলেন আশ্চয সুন্দর দুটি চোখে ভাসছে আন্তরিকতা, অকপটতা, দৃঢ়তা, মধুরতা। এ সেই মহীয়সীর চাহনি যিনি প্রাণ দিতে পারেন সেই পুরুষের জন্যে যে পুরুষের কাছে তিনি নিজের প্রাণের জন্যেই ঋণী। প্রথমে বিস্মিত হলেন ফিলিয়াস ফগ। তারপর তাঁর অন্তর স্পর্শ করল সেই আশ্চয চাহনি। যেন তাঁকে ফুঁড়ে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছোলো। মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে মর্মভেদী চাহনির সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইলেম ফিলিয়াস ফগ। পরক্ষণেই চোখ মেলে বললেন—"আমি আপনারই।"

ফগের দুহাত বুকের ওপর চেপে ধরলেন আউদা।

তৎক্ষণাৎ ডাক পড়ল পাসপার্তুর। ফগ তখনো আউদার হাত ধরেছিলেন। দেখেই বুঝল পাসপার্তু। গোলাকার মুখখানা তক্ষুনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল মধ্য গগনের সূর্যের মত।

সংক্ষিপ্ত হুকুম দিলেন ফগ। কালকেই বিয়ের নোটিস এখুনি গিয়ে দিয়ে আসতে হবে মেরিলিবোন গির্জের রেভারেণ্ড স্যামুয়েল উইলসনকে। খুব দেরী হয়নি, এখুনি গেলে নোটিস ধরানো যাবে।

কান পর্যন্ত এঁটো করা হাসি হেসে বললেন পাসপার্তু—"দেরী কিসের? কিচ্ছু দেরী হয় নি।"

তখন আটটা বেজে পাঁচ মিনিট।

"বিয়ে তাহলেই কাল সোমবারেই?"

"হ্যাঁ, কাল সোমবারেই," আউদার দিকে ফিরে বললেন ফগ।

"হ্যাঁ, কাল সোমবারেই," জবাব দিলেন আউদা।

পাঁই পাঁই করে ছুটল পাসপার্তু।

৩৪ ॥ ফিলিয়াস ফগের নামের জাদুতে ফের গরম হল শেয়ার মার্কেট

আসল ব্যাঙ্ক চোর ধরা পড়ার পর ইংরেজ জনগণ মানসে কি প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, তা বলার সময় হয়েছে এখন। লোকটার নাম জেমস স্ট্র্যাণ্ড। তাকে গ্রেপ্তার করা হল সতেরোই ডিসেম্বর এডিনবরায়।

ঠিক সেই সময়ে পৃথিবীর আরেক অংশে কুখ্যাত ব্যাঙ্ক চোর সন্দেহে ফিলিয়াস ফগের পেছনে শিকারী কুকুরের মত হন্যে হয়ে ঘুরছে ফিক্স। এই ফিলিয়াস ফগকে ইংরেজরাও কুখ্যাত বদমাস ধরে নিয়েছিল, ধিক্কার দিয়েছিল এই সেদিনও। কিন্তু জেমস স্ট্র্যাণ্ড ধরা পড়ায় পট পালটে গেল। আবার জনগণ মানসে ভেসে উঠল সাধু সজ্জন সম্মানীয় ফিলিয়াস ফগের চেহারা-চরিত্র —সচল গণিত-যন্ত্রের মত যিনি ভূ প্রদক্ষিণ করে চলেছেন—আশ্চর্য সেই পর্যটন-বৃত্তান্ত অনেকের কাছে বাতুলতার নামান্তর মাত্র।

কাগজে-কাগজে আবার ফলাও করে ছাপা হল বাজী ধরার পুরোনো গল্প। ম্যাজিকের মত বাজার পণ চড়তে লাগল। যারা নিরাশ হয়েছিল, তারা লাফিয়ে উঠল। শেয়ার মার্কেটে ফিলিয়াস ফগের নামে ফের পুরোদমে ফাটকাবাজি আরম্ভ হল।

এ ঘটনা ঘটল একুশে ডিসেম্বরের তিন দিন আগে। এই তিনটে দিন অস্থির হয়ে রইলেন রিফর্ম ক্লাবের বন্ধু পাঁচজনে। ফিলিয়াস ফগকে তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন, এখন তিনি কোথায়? সত্যিই কি ফিরে আসবেন তিনি? এখনো ভূ-প্রদক্ষিণ করে চলেছেন তিনি, না সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও বসে আছেন? জেমস স্ট্র্যাণ্ড যেদিন ধরা পড়ল, সেদিন ছিল তাঁর যাত্রাশুরুর ছিয়াত্তরতম দিন। এই ছিয়াত্তর দিন কোনো খবর পাওয়া যায় নি ফগের। তবে কি উনি মৃত? ছিনেজোঁকের মত এখনও পর্যটন করে চলেছেন কি? একুশে ডিসেম্বর শনিবার রাত পৌনে নটায় রিফর্ম ক্লাবের সেলুন ঘরে সত্যিই কি পুনরাবির্ভূত হচ্ছেন ফিলিয়াস ফগ?

লণ্ডন সমাজের এই তিনটে দিনের নিদারুণ উদ্বেগ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ফিলিয়াস ফগের খবর চেয়ে টেলিগ্রাম চলে গেল এশিয়ায়, আমেরিকায়। সকাল-সন্ধ্যে স্যাভিলরো'র বাড়ীতে লোক আসতে লাগল ওঁরা ফিরেছেন কিনা দেখবার জন্যে। কিন্তু কোনো দিক থেকেই খবর এল না। মিথ্যে সূত্র নিয়ে ফগকে নাজেহাল করে মারছিল যে গোয়েন্দা, তার সম্বন্ধেও পুলিশ আর কোনো সংবাদ পায়নি। তা সত্ত্বেও বাজীর অর্থ বেড়েই চলল ধাপে ধাপে—রেসের ঘোড়ার মত বিজয়-খুঁটির মত কাছে যতই এগিয়ে আসতে লাগলেন ফিলিয়াস ফগ—সংখ্যায় আর পরিমাণে বাজীও বেড়ে চলল হু-হু করে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বুড়ো লর্ড অ্যালবিমার্লেও ফের চাঙা হলেন।

শনিবার সন্ধ্যে থেকেই কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেল রিফর্ম ক্লাবের সামনে এবং আশপাশের রাস্তায়। ক্লাবের সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে অগুন্তি দালাল পাকাপোক্তভাবে অফিস খুলে কারবার শুরু করে দিল। তর্ক-বিতর্ক এবং টাকার লেনদেন আরম্ভ হয়ে গেল সারা শহর জুড়ে। ফগের পুনরাবির্ভাবের সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভীড় এত বাড়তে লাগল যে পুলিশ পযন্ত হিমসিম খেয়ে গেল জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে। উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল উত্তেজনা।

উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে ক্লাবের সুসজ্জিত সেলুন ঘরে বসেছিলেন ফগের প্রতিপক্ষ পাঁচ বন্ধু—ব্যাঙ্কার সুলিভান ও ফ্যালেন্টিন, ইঞ্জিনীয়ার ষ্টুয়ার্ট, ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ডিরেক্টর র‍্যালফ এবং মদের কারবারী ফ্ল্যানাগান।

আটটা বেজে পঁচিশ মিনিট হতেই উঠে দাড়ালেন অ্যানড্রু ষ্টুয়ার্ট। বললেন—"আর মাত্র বিশ মিনিট পরেই নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবে।"

ফ্ল্যানাগান শুধোলেন—"লিভারপুলের ট্রেন লণ্ডনে পৌছোয় কটায়?"

"সাতটা তেইশ মিনিটে," বললেন র‍্যালফ, "পরের ট্রেন বারোটা দশের আগে আর নেই।"

ষ্টুয়ার্ট বললেন—"সাতটা তেইশের ট্রেনে এলে ফিলিয়াস ফগ এতক্ষণে পৌছে যেতেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি আমরাই জিতলাম।"

"অত ধড়ফড় না করাই ভালো," বললেন ফ্যালেন্টিন। "জানেন তো মিস্টার ফগ কি রকম ছিটগ্রস্ত মানুষ। ওঁর সময়ানুবর্তীতার কথা কে না জানে। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে কোথাও পৌছোন না। কাঁটায়-কাঁটায় পৌনে নটায় হাজির হলেও আমি অবাক হব না।"

ঘাবড়ে গিয়ে বললেন ষ্টুয়ার্ট—"নিজের চোখে দেখেও কিন্তু বিশ্বাস করব না সত্যিই ফিলিয়াস ফগ এসেছেন!"

ফ্ল্যানাগান বললেন—"মোদ্দা কথাটা কি জানেন, যতই সময় জ্ঞান থাকুক না কেন মিস্টার ফগের, পথে বাধাবিঘ্নের অন্ত নেই। দু'তিন দিনের দেরী মানেই তো সব ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া।"

স্থলিভান বললেন-"আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন। ওঁর যাত্রাপথ বরাবর টেলিগ্রাফের তার পাতা রয়েছে, অথচ উনি আজও কোনো খবর পাঠান নি।"

"আরে মশাই, উনি হেরে গেছেন," বলে উঠলেন ষ্টুয়ার্ট "গো-হারান হেরেছেন। জানেন তো, নিউইয়র্ক থেকে 'চায়না' জাহাজেই তাঁর আসার কথা—যে জাহাজে চাপলে গতকাল তিনি লণ্ডন পৌঁছে যেতেন। 'চায়না' এসে গেছে। যাত্রীদের নামের তালিকা তন্নতন্ন করে দেখেছি। ফিলিয়াস ফগের নাম তার মধ্যে নেই। ভাগ্য সহায় হলেও আমেরিকা পর্যন্তও যথাসময়ে পৌঁছোতে পারেন নি মিস্টার ফগ। তার মানে পিছিয়ে আছেন কম করেও বিশ দিনের মত। ফলে, লর্ড অ্যালবিমার্লের পাঁচ হাজারও খসল।"

র‍্যালফ বললেন—"তাহলে আর কি। মিস্টার ফগের চেকটা কালকেই ব্যারিং-যের গদীতে জমা দেওয়া যাক।"

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল ক্লাব ঘড়ির কাঁটা এসে দাঁড়িয়েছে নটা বাজতে বিশ মিনিটের ঘরে।

"আর মাত্র পাঁচ মিনিট," বললেন ষ্টুয়ার্ট।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন পাঁচজনে। উদ্বেগ তীব্র আকার নিয়েছে, চোখ মুখ ভাবলেশহীন রাখার জন্যে ফ্যালেন্টিনের তাস খেলার প্রস্তাব লুফে নিলেন বাকী সকলে।

চেয়ারে বসতে বসতে বললেন ষ্টুয়ার্ট—"আমার ভাগের বাজীর টাকা কিন্তু আমি ছাড়ছি না। কড়কড়ে চারটি হাজার পাউণ্ড।"

ঘড়িতে দেখা গেল নটা বাজতে আরো মিনিট বাকী।

তাস তুলে নিলেন খেলোয়াড়রা। কিন্তু দেওয়াল ঘড়ি থেকে চোখ সরাতে পারলেন না। জিতেছেন জেনেও এত উৎকণ্ঠা। মিনিটগুলোকে কস্মিনকালেও এমন দীর্ঘ মনে হয় নি তো।

"নটা বাজতে সতেরো মিনিট," তাস বাঁটতে বাটতে বললেন ফ্ল্যানগান।

তারপরেই নিশ্ছিদ্র নীরবতা নেমে এল সেলুন ঘরে। ছুঁচ পড়লে শোনা যায়, এমনি স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল প্রকাণ্ড ঘরে। বাইরে থেকে কেবল ভেসে এল জনতার গুঞ্জন ধ্বনি, মাঝে মাঝে আতীক্ষ্ণ চীৎকার। সেকেণ্ডের ঘরগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা, পেণ্ডুলামের দোলনে সূচীত

হচ্ছে একটির পর একটি সেকেণ্ড। খেলোয়াড়রা অধীর আগ্রহে গুণছেন সেকেণ্ড-সংখ্যা—কান পেতে শুনছেন টিক-টিক ধ্বনি—সময় এগিয়ে চলেছে নির্বিকারভাবে গণিতযন্ত্রের হিসেবে।

"নটা বাজতে ষোল মিনিট!" আবেগে গলা কেঁপে গেল স্টুলিভানের।

আর মাত্র এক মিনিট! বাজী জেতা যাবে ঠিক ষাট সেকেণ্ড পরে। খেলা মুলতুবী রইল। হাতের তাস নামিয়ে রেখে সেকেণ্ড গুণতে লাগলেন সকলে।

চল্লিশ সেকেণ্ডে ফগ এলেন না। পঞ্চাশ সেকেণ্ডেও তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটল না।

পঞ্চান্ন সেকেণ্ড হতেই দারুণ সোরগোল শোনা গেল বাইরে। জনতা হাততালি দিচ্ছে, হর্ষধ্বনি করছে। কেউ কেউ নিষ্ফল রাগে গজরাচ্ছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন খেলোয়াড়রা।

সাতান্ন সেকেণ্ডে সেলুন ঘরের দরজা খুলে গেল। ষাট সেকেণ্ডে পেণ্ডুলাম ঘা দেওয়ার আগেই চৌকাঠে আবির্ভূত হলেন ফিলিয়াস ফগ, পেছনে উত্তেজিত উন্মত্ত জনতা।

বললেন প্রশান্ত কণ্ঠে—"আমি এসেছি!"

৩৫॥ সুখ ছাড়া ভূ-প্রদক্ষিণে লাভ হল না কিছুই

হ্যাঁ, ফিলিয়াস ফগ সশরীরে এসেছেন।

পাঠক-পাঠিকার মনে থাকতে পারে লণ্ডন পৌঁছোনোর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে রাত আটটা পাঁচ মিনিটে মিস্টার ফগ পাসপার্তুকে বিয়ের পুরুৎ ঠিক করতে পাঠিয়ে ছিলেন। বিয়ে হবে পরদিন।

আনন্দে নাচতে নাচতে বিয়ের ব্যবস্থা করতে ছুটেছিল পাসপার্তু। পুরুৎ মশায়ের বাড়ী গিয়ে দেখল তিনি বাড়ী নেই। কুড়ি মিনিট বসে থাকার পর বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে, তখন আটটা পঁয়ত্রিশ।

কিন্তু এ কী অবস্থা পাসপার্তুর? মাথায় টুপী নেই, চুল উস্কখুস্ক, রাস্তা দিয়ে এত জোরে কাউকে কখনো ছুটতে দেখা যায়নি। পথচারীদের ধাক্কা দিয়ে ফুটপাত দিয়ে জল স্তম্ভের মতে ধেয়ে চলেছিল বাড়ীর দিকে!

তিন মিনিট লাগল স্যাভিলরো পৌছোতে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল মিস্টার ফগের ঘরে।

কথা আটকে গেল পাসপার্তুর।

"কি ব্যাপার ?" শুধোলেন ফগ।

"হুজুর !" খাবি খেতে খেতে বলল পাসপার্তু—"বিয়ে—অসম্ভব !"

"অসম্ভব ?"

"কালকে—অসম্ভব !"

"কেন ?"

"কাল—রবিবার !"

"সোমবার," শুধরে দিলেন ফগ।

"না—আজ—শনিবার !"

"শনিবার ? অসম্ভব !"

"আজ শনিবার, শনিবার, শনিবার, শনিবার," গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পাসপার্তু। "আপনি একদিনের হিসেব গুলিয়ে ফেলেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের চব্বিশ ঘণ্টা আগে এসেছি আমরা, কিন্তু আর যে মাত্র দশ মিনিট বাকী।"

মনিবের কলার খামচে ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল পাসপার্তু।

ভাববার সময় ছিল না ফিলিয়াস ফগের। চাকরের হাতে গায়ের হয়ে উল্কাবেগে নেমে এলেন রাস্তায়, উঠে বসলেন একটা ভাড়াটে গাড়ীতে, গাড়োয়ানকে একশ পাউণ্ড বখশিষের লোভ দেখিয়ে ছুটো কুকুর চাপা দিয়ে এবং পাঁচটা গাড়ী উল্টে দিয়ে পৌঁছোলেন রিফর্ম ক্লাবে।

প্রকাণ্ড সেলুন ঘরে পৌঁছোলেন কাঁটায় কাঁটায় পৌনে নটায়।

আশীদিনে ভূ প্রদক্ষিণ সাঙ্গ করেছেন ফিলিয়াস ফগ।

বিশ হাজার পাউণ্ডের বাজী বাঁচিয়েছেন ফিলিয়াস ফগ।

কিন্তু সময় সম্বন্ধে যিনি এত খুঁতখুঁতে এবং সঠিক, পুরো একটা দিন তিনি গুলিয়ে ফেললেন কি করে ? আশী দিনের বদলে উনআশী দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ সাঙ্গ করেও কেন তিনি ভেবে বসলেন যে সেদিন শুক্রবার নয়, শনিবার ? বিশে ডিসেম্বর নয়—একুশে ডিসেম্বর ?

কারণটা জলের মত সহজ।

ফিলিয়াস ফগ কল্পনাও করতে পারেন নি যাত্রা পথেই তিনি পুরো একটা দিন বাঁচিয়ে বসে আছেন। কারণ আর কিছুই নয়—উনি বরাবর পুবদিকে এগিয়েছেন। যদি উল্টোদিকে যেতেন, অর্থাৎ পশ্চিমদিক দিয়ে ভূ প্রদক্ষিণ করলে উল্টোটা ঘটত, অর্থাৎ একদিন খোয়া যেত।

পুবমুখো যাত্রা করার ফলে উনি এগিয়েছেন সূর্যের দিকে, ফলে এক-এক ডিগ্রীতে চার মিনিট হিসেবে দিন রাত ছোট হয়েছে। ভূ-বলয় ঘিরে রয়েছে তিনশ ষাট ডিগ্রী। তিনশ ষাট ডিগ্রীকে চার মিনিট দিয়ে গুণ করলে

দাঁড়াচ্ছে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা। ফগ নিজের অজ্ঞাতসারে অল্প অল্প করে প্রতিদিনই কিছুটা সময় বাঁচিয়ে ফেলেছেন—যার মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পাকা চব্বিশটি ঘণ্টা!

অন্যভাবে বললে, পূবমুখো যাত্রা অব্যাহত রেখে ফিলিয়াস ফগ আশীবার সূর্যকে মধ্যগগনে দেখেছেন, কিন্তু লণ্ডনে বসে তাঁর বন্ধুরা সূর্যকে মধ্যগগনে দেখেছেন উনআশী বার। সেই জন্যেই তাঁরা শনিবার রিফর্ম ক্লাবে প্রতীক্ষা করেছেন যাঁর জন্যে সেই ফিলিয়াস ফগ তখন বাড়ীতে বসে ভাবছেন সেদিন বুঝি রবিবার।

পাসপার্তুর সুবিখ্যাত ঘড়িটিকে লণ্ডন সময়ের সঙ্গে না মিলিয়ে রেখে প্রতিদিন সূর্য মধ্যগগনে উঠলে কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে নিলেই ভুলটা ধরা পড়ত!

বিশ হাজার পাউণ্ডের বাজী জিতলেন বটে, কিন্তু উনিশ হাজার পাউণ্ডের মত পথ-খরচেই চলে যাওয়ায় আর্থিক লাভ হল অতি সামান্যই। ওঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বাজী জেতা, টাকা পেটা নয়। বাকী এক হাজার পাউণ্ড উনি সমান ভাগে বখরা করে দিলেন পাসপার্তু আর ফিক্সের মধ্যে।

বেচারা ফিক্সের প্রতি ওঁর কোনো রাগ ছিল না বলেই উদার মনের পরিচয় দিলেন। সেই সঙ্গে নিয়মানুবর্তীতার খাতিরে পাসপার্তুর বখরা থেকে কেটে নিলেন উনিশশো বিশ ঘণ্টা গ্যাসবাতি জ্বলার বাড়তি খরচটা।

সেইদিন রাতে আগের মত প্রশান্ত মন্থর কণ্ঠে আউদাকে শুধোলেন মিস্টার ফগ—"বিয়েতে এখনো সম্মতি আছে?"

আউদা বললেন—"মিস্টার ফগকে প্রশ্নটা আমার করা উচিত। তখন আপনি ফকির ছিলেন, আজ আবার বড়লোক হয়েছেন।"

"ম্যাডাম, ক্ষমা করবেন আমাকে। আমার যা কিছু, সব আপনার। বিয়ের প্রস্তাব যদি না তুলতেন, পাসপার্তু পুরুৎ খুঁজতে বেরোতো না, আমার ভুলটাও ধরা পড়ত না, আমিও—"

"মিস্টার ফগ!" আউদা আর কথা বলতে পারলেন না।

"আউদা!" বললেন ফগ।

বলাবাহুল্য, ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। আনন্দে ডগমগ হয়ে কন্যাসম্প্রদান করল পাসপার্তু। সে ছাড়া আর করবেই বা কে? সে-ই তো আউদাকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে!

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতেই দুমদাম করে মনিবের দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল পাসপার্তু। দরজা খুলে শুধোলে ফগ—"কি হল?"

"কি হল জিজ্ঞেস করছেন? এখুনি আমি কি বার করলাম জানেন?"

"কি ?"

"আমরা তো আটাত্তর দিনেও ভূ-প্রদক্ষিণ করতে পারতাম।"

"তা পারতাম—ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে না গেলেই তা সম্ভব ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ না পেরোলে আমি আউদাকে উদ্ধার করতে পারতাম না, আউদা প্রাণে না বাঁচলে সে আমার স্ত্রী হত না, আর—"

আলতো করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন মিস্টার ফগ।

বাজী জিতলেন ফিলিয়াস ফগ। আশী দিনে ভূলোক ঘুরেও এলেন। অসম্ভবকে সম্ভব করতে তিনি হেন যানবাহন নেই যাতে চাপেন নি—কলের জাহাজ, রেলগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, পালতোলা জাহাজ, সওদাগরী জাহাজ, স্লেজ গাড়ী, হাতী। সারা রাস্তায় তিনি প্রমাণ রেখে এসেছেন তাঁর অত্যাশ্চর্য কয়েকটা চারিত্রিক গুণাবলীর; যে কোনো অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখার অসাধারণ ক্ষমতা এবং যে কোনো পরিস্থিতিকে স্বচারু ভাবে শেষ করা। হয়ত তাঁর মাথায় একটু গোলমাল আছে বলেই এমন একটা এলাহি কাণ্ড করতে পারলেন তিনি। কিন্তু পেলেন কি ? এত পথশ্রম অর্থব্যয় অন্তে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঘরে আনলেন কি ?

কিচ্ছু না, হয়ত আপনি বলবেন। কিন্তু অদ্ভুত অথচ সুন্দরী এক মহিলার সংস্পর্শে এসে জীবনে সুখী হওয়াটা কি কম কথা ?

এর চাইতেও কম কিছুর প্রলোভনে কি পৃথিবীটাকে আপনি একবার টহল দিয়ে আসতেন না ?